গার্হস্থ্য অর্থনীতি

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড: HSC 2837

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গার্হস্থ্য অর্থনীতি

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড: HSC 2837

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

রচনা

অধ্যাপক রাশেদা খানম (অব:)
শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যাপক সুরাইয়া বেগম (অব:)
খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যাপক করিমা আখতার (অব:)
গৃহ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যাপক শাহীন আহমেদ (অব:)
খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

সাবিনা ইয়াসমিন
সহকারী অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

সেলিমা বেগম
প্রভাষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার, ঢাকা

মাহামুদা সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক, শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

সম্পাদনা

অধ্যাপক সিদ্দীকা কবীর(অব:)
খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

সাবিনা ইয়াসমিন
সহকারী অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

কোর্স সমন্বয়কারী

সাবিনা ইয়াসমিন
সহকারী অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

অনন্যা লাবনী
সহকারী অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গার্হস্থ্য অর্থনীতি

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড: HSC 2837

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল ঃ জানুয়ারি ২০০৫
পুন:মুদ্রণ : ২০১১

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ টিপু সুলতান

মুদ্রণ
মনময়ুরী অফসেট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৩৮/২/২ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 984-34-3055-7

HOME ECONOMICS 2nd Part book for the HSC Programme. **Written by** Rasheda Begum, Suraiya Begum, Karima Akhtar, Shaheen Ahmed, Sabina Yeasmin, Salima Begum, Mahamoda Sultana, **Edited By** Professor Siddiqua Kabir, Sabina Yeasmin, Published after being reviewed anonymously by two referees.

hC¢V ¢Li¡¬h fs¬he

cl¢nr¬Z HCQHp¢p -f¡N¡¬j i¢a qJu¡u Bfe¡¬L ü¡Na S¡e¡¢µRz H fÜ¢al fs¡öe¡u -nZ£L¬rl f¡Wc¡¬el f¢lj¡Z Ljz HM¡¬e f¡WÉfÙL HLp¡¬b f¡WÉfÙL J ¢nr¬Ll i¢jL¡ f¡me L¬lz H fÜ¢a¬a R¡œ ¢eS c¡¢u¬a ¢e¬Sl p¢hd¡ j¬a¡ pj¬u -nM¡l L¡¬S ¢e¬u¡¢Sa quz H E¬ŸnÉ¬L p¡j¬e -l¬M N¡qÙÉ Abe£¢a ¢àa£u fœ hC¢V kb¡p¡dÉ pqS J plm i¡o¡u -mM¡ q¬u¬Rz f¬l¡ hC¢V 13¢V CE¢e¬V i¡N Ll¡ q¬u¬R Hhw f¢a¢V CE¢eV L¬uL¢V f¡¬W ¢hiš²z

f¢a¢V CE¢e¬Vl öl¦¬a i¢jL¡ -cJu¡ B¬Rz i¢jL¡u pÇfZ CE¢e¬V ¢L ¢L ¢houhÙ B¬m¡Qe¡ Ll¡ q¬u¬R a¡ a¬m dl¡ q¬u¬Rz HR¡s¡ ¢houhÙl …l¦aJ pw¬r¬f E¬õM Ll¡ q¬u¬Rz f¢a¢V f¡¬Wl öl¦¬a f¡W¢V fs¡l E¬ŸnÉ -cJu¡ q¬u¬Rz E¬ŸnÉ Aek¡u£ ¢houhÙ p¡S¡¬e¡ q¬u¬Rz f¢a¢V f¡W -n¬o f¡¬W¡šl jmÉ¡u¬el SeÉ °ehÉ¢š²L fn -cJu¡ B¬Rz H fn…¬m¡ -b¬L B f¢e ¢e¬SC ¢e¬Sl f¡¬Wl ANN¢a jmÉ¡ue Ll¬a f¡l¬hez HR¡s¡ CE¢eV -n¬o pw¢rç J lQe¡jmL fn -cJu¡ B¬Rz f¢a¢V f¡¬Wl °ehÉ¢š²L f¡¬Wl Ešlj¡m¡ CE¢eV -n¬o -cJu¡ B¬Rz f¬u¡Se£u hÉhq¡¢lL f¡WJ CE¢e¬Vl A¿iš² Ll¡ q¬u¬Rz H f¡WÉhC¢V fs¡l pju ¢ejh¢Za ¢hou…¬m¡ kb¡kb AeplZ Ll¬m ¢houhÙ hT¬a -L¡e Ap¢hd¡ q¬h e¡z

- f¢a¢V f¡W j¬e¡¬k¡N pqL¡¬l fsez f¡¬W¡šl jmÉ¡ue fn…¬m¡l Ešl ¢e¬S ¢e¬S -hl Ll¦ez B fe¡l Ešl p¢WL q¬m¡ ¢L e¡ a¡ CE¢eV -n¬ol Ešlj¡m¡l p¡¬b ¢j¬m¬u -cMez f¬u¡S¬e f¡W¢V L¬uLh¡l fsez
- HL¢V f¡¬Wl ph…¬m¡ f¬nl Ešl S¡e¡ q¬u -N¬m fl hal£ f¡W¢V fsez CE¢e¬Vl ph…¬m¡ f¡W -n¬o Qs¡¿ jmÉ¡ue f¬nl Ešl °a¢l Ll¦ez
- hÉhq¡¢lL Awn…¬m¡ B fe¡l B¬nf¡¬nl f¢l¬h¬nl p¢hd¡pjq hÉhq¡l L¬l ¢e¬S ¢e¬S Aen£me Ll¦e Hhw ¢e¬Sl hÉhq¡¢lL S£h¬e L¡¬S m¡N¡ez -kph hÉhq¡¢lL ¢hou B fe¡l ¢eSü f¢l¬h¬n Aen£me pñh eu -p¬r¬œ B fe¡l ¢VEV¬ll fl¡jn ¢eez
- J¬fe úm -l¢XJ J ¢V¢i¬a f¢a pç¡¬q B fe¡l SeÉ f¡WÉ ¢ho¬ul A¬fr¡La S¢Vm Aw¬nl Efl L¡¬pl hÉhÙ¡ NqZ L¬l¬Rz B f¢e ¢ed¡¢la pj¬u O¬l h¬p Hph L¡¬p AwnNqZ Ll¬a f¡¬lez
- H f¡WÉfÙL¢V f¡¬W -k¬L¡e pjpÉ¡u B fe¡l ¢VEV¬ll pq¬k¡¢Na¡ ¢eez

সূচিপত্র

ইউনিট ১ ঃ বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ও পরিবার ১-১১
পাঠ ১.১ ঃ পরিবারের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ ও কার্যাবলী ২
পাঠ ১.২ ঃ যৌথ ও একক পরিবারের উপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব ৬
পাঠ ১.৩ ঃ পরিকল্পিত পরিবারের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও সন্তান পালনে সুবিধা ৮
পাঠ ১.৪ ঃ শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব ১০

ইউনিট ২ ঃ মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব ১২-৩০
পাঠ ২.১ ঃ জীবনের শুরু ১৩
পাঠ ২.২ ঃ মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধি ১৬
পাঠ ২.৩ ঃ গর্ভবর্তী মায়ের যত্ন ২১
পাঠ ২.৪ ঃ মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধিতে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ২৫

ইউনিট ৩ ঃ শিশু বর্ধন ও বিকাশ ৩১-৪৭
পাঠ ৩.১ ঃ বর্ধন ও বিকাশের সংজ্ঞা এবং পার্থক্য ৩২
পাঠ ৩.২ ঃ নবজাতক কাল ৩৫
পাঠ ৩.৩ ঃ শিশু বিকাশের ধাপ ৩৮
পাঠ ৩.৪ ঃ বিভিন্ন বয়সের শিশুর বৈশিষ্ট্য ঃ শিশুকাল ৪১
পাঠ ৩.৫ ঃ প্রাক্ বিদ্যালয়গামী শিশুর বৈশিষ্ট্য ৪৩
পাঠ ৩.৬ ঃ প্রাক্ বিদ্যালয়গামী শিশুর বিকাশমূলক কাজ ৪৫

ইউনিট ৪ ঃ শিশুর খেলাধুলা ও খেলার সরঞ্জাম ৪৮-৫৯
পাঠ ৪.১ ঃ খেলার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ৪৯
পাঠ ৪.২ ঃ সার্বিক বিকাশের খেলার প্রয়োজনীয়তা ৫৩
পাঠ ৪.৩ ঃ খেলার সরঞ্জাম নির্বাচনের নীতি ৫৬

ইউনিট ৫ ঃ শিশুর আচরণগত সমস্যা ও প্রতিকার ৬০-৭৩
পাঠ ৫.১ ঃ শিশুর আচরণগত সমস্যার সংজ্ঞা ও কারণ ৬১
পাঠ ৫.২ ঃ প্রতিবন্ধী শিশুকে জানা ও পরিচালনা করা ৬৩
পাঠ ৫.৩ ঃ শিশুর আচরণগত সমস্যার প্রতিকার ৬৭
পাঠ ৫.৪ ঃ একই বয়সের শিশুর আচরণের মিল ও অমিল ৭১

ইউনিট ৬ ঃ দেহে খাদ্যের পরিপাক ৭৪-৮৮
পাঠ ৬.১ ঃ দেহে খাদ্য পরিপাকের সংজ্ঞা ৭৫
পাঠ ৬.২ ঃ পরিপাক তন্ত্র ৭৭
পাঠ ৬.৩ ঃ কার্বহাইর্ড্রেট জাতীয় খাদ্য পরিপাক ৮০
পাঠ ৬.৪ ঃ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পরিপাক ৮২
পাঠ ৬.৫ ঃ স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাক ৮৪
পাঠ ৬.৬ ঃ পরিপাককৃত খাদ্যের শোষণ ৮৬

ইউনিট ৭ ঃ অপুষ্টিজনিত ব্যাধি ৮৯-১২২

পাঠ ৭.১ ঃ খাদ্যের অভাবজনিত রোগ ৯০
পাঠ ৭.২ ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অভাবজনিত রোগের কারণসমূহ ৯২
পাঠ ৭.৩ ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অভাবজনিত রোগ ৯৪
পাঠ ৭.৪ ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টি রোগের জটিলতা প্রতিকার ও প্রতিরোধ ৯৯
পাঠ ৭.৫ ঃ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ ১০৩
পাঠ ৭.৬ ঃ ভিটামিন সি-এর অভাবজনিত রোগ ১০৬
পাঠ ৭.৭ ঃ ভিটামিন বি -এর অভাবজনিত রোগ ১০৮
পাঠ ৭.৮ ঃ ভিটামিন এ -এর অভাবজনিত রোগ ১১৩
পাঠ ৭.৯ ঃ ভিটামিন ডি -এর অভাবজনিত রোগ ১১৯

ইউনিট ৮ ঃ খনিজলবণের অভাবজনিত রোগ, দেহের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের কুফল ও বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টি সমস্যা ১২৩-১৪৩
পাঠ ৮.১ ঃ ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগ ১২৪
পাঠ ৮.২ ঃ লৌহের অভাবজনিত রোগ ১২৭
পাঠ ৮.৩ ঃ আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ ১৩০
পাঠ ৮.৪ ঃ ফসফরাসের অভাবজনিত রোগ ১৩৪
পাঠ ৮.৫ ঃ দেহের অতিরিক্ত ওজনের কুফল (হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিক) ১৩৬
পাঠ ৮.৬ ঃ বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টি সমস্যা ও দূরীকরণের উপায়সমূহ ১৪০

ইউনিট ৯ ঃ খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা ১৪৪-১৬৪
পাঠ ৯.১ ঃ খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ১৪৫
পাঠ ৯.২ ঃ মেনু পরিকল্পনার নীতি ১৪৮
পাঠ ৯.৩ ঃ মেনু রচনার নিয়ম কানুন ১৫০
পাঠ ৯.৪ ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুযায়ী খাদ্যের মেনু ১৫৩
পাঠ ৯.৫ ঃ খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ১৫৭
পাঠ ৯.৬ ঃ খাদ্য প্রস্তুত-রেসিপি ১৫৯
পাঠ ৯.৭ ঃ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন ১৬২

ইউনিট ১০ ঃ খাদ্য সংরক্ষণ ১৬৫-১৮৭
পাঠ ১০.১ ঃ খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব ১৬৬
পাঠ ১০.২ ঃ খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ ১৬৮
পাঠ ১০.৩ ঃ খাদ্য সংরক্ষণের নীতি ১৭৩
পাঠ ১০.৪ ঃ খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি (তাপ প্রয়োগ) ১৭৫
পাঠ ১০.৫ ঃ গৃহে খাদ্য সংরক্ষণ ঃ বরফ জমিয়ে এবং রোদে শুকিয়ে ১৭৮
পাঠ ১০.৬ ঃ খাদ্য সংরক্ষণ ঃ লবণ, চিনি ও তেলে ১৮০
পাঠ ১০.৭ ঃ গৃহে খাদ্য সংরক্ষণ ১৮৩

ইউনিট ১১ ঃ খাদ্য সরবরাহ ১৮৮-১৯৭
পাঠ ১১.১ ঃ খাদ্যবাহিত রোগ ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা ১৮৯
পাঠ ১১.২ ঃ অণুজীব দিয়ে খাদ্য রোগ সংক্রামণ ১৯২
পাঠ ১১.৩ ঃ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহে নিরাপত্তা বিধি ১৯৫

ব্যবহারিক

ইউনিট ১২ ঃ	**শিশুবর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক**	**২০১-২০২**
পাঠ ১২.১ ঃ	দেশীয় উপকরণের সাহায্যে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর উপযোগী খেলনা সামগ্রী প্রস্তুত করা ...	২০১
ইউনিট ১৩ ঃ	**খাদ্য ও পুষ্টি**	**২০৩-২১৯**
পাঠ ১৩.১ ঃ	স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনা, খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন ও তৈরি খাবারের মূল্য নির্ণয়	২০৩
পাঠ ১৩.২ ঃ	শস্য (শ্বেতসার জাতীয়) এবং ডালমিশ্রিত খাদ্য তৈরি	২০৬
পাঠ ১৩.৩ ঃ	প্রোটিন, খনিজলবণ এবং ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি	২০৯
পাঠ ১৩.৪ ঃ	নববর্ষ উপলক্ষে অতিথি আপ্যায়ণ	২১২
পাঠ ১৩.৫ ঃ	আনুষ্ঠানিক ভোজ ৮ জন সম্মানিত অতিথি আপ্যায়ণ	২১৫
পাঠ ১৩.৬ ঃ	খাদ্য নির্বাচন, প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ ঃ (তেলের আচার, আনারসের জ্যাম, পেয়ারার জেলী) ...	২১৭

মানবন্টন ও নমুনা প্রশ্ন

মানবন্টন ও নমুনা প্রশ্ন	**২২১-২২৩**
মানবন্টন	২২১
নমুনা প্রশ্ন (তত্ত্বীয়)	২২২
নমুনা প্রশ্ন (ব্যবহারিক)	২২৩

ইউনিট ১

বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ও পরিবার

ভূমিকা

বিশ্বে মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজ বিদ্যমান এবং সমাজের প্রাথমিক সংগঠন রূপ পরিবার। প্রকৃতপক্ষে পরিবারেই সমাজের উৎপত্তি। সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার তাগিদে গড়ে উঠেছে পরিবার। কাজেই পরিবার হচ্ছে সর্বসময়ের মানব সমাজের কেন্দ্রস্থল। পরিবার একটি স্থায়ী সামাজিক সংগঠন। যে সংগঠন থেকে মানবজাতি বিকাশ লাভ করেছে এবং সে সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের কাঠামোতেও পরিবর্তন এসেছে।

এ ইউনিটে আপনারা বিভিন্ন পরিবারের বৈশিষ্ট্য বিভিন্নতা ও কার্যাবলী এবং পরিবারের উপর যে নানাবিধ সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যায় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। জীবনমুখী কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবেন। মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সংগতি রেখে পরিবার অব্যাহত গতিতে আবহমান কাল ধরে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। এই ইউনিটে যৌথ ও একক পরিবার, পরিকল্পিত পরিবার ও পরিবারে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে-

পাঠ-১.১ ঃ পরিবারের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ ও কার্যাবলী
পাঠ-১.২ ঃ যৌথ ও একক পরিবারের উপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব
পাঠ-১.৩ ঃ পরিকল্পিত পরিবারের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও সন্তান পালনে সুবিধা
পাঠ-১.৪ ঃ শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব

পাঠ- ১.১ ঃ পরিবারের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পরিবার ও পরিবারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- পরিবারের নানা ধরনের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন

পরিবারের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ ও কার্যাবলী

পরিবার হচ্ছে আদিম স্থায়ী ও চিরন্তন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানব সমাজে পরিবারকে বর্তমান যুগে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা হয়। পরিবারের মধ্যে শিশুর জন্ম হয়; সেখানে তার লালন পালন ও প্রাথমিক শিক্ষা হয়। ধীরে ধীরে এখানে সে বড় হয় এবং পূর্নাঙ্গ মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরী করে। কাজেই পরিবার হচ্ছে এমন একটি সংঘ বা প্রতিষ্ঠান যেখানে মোটামুটি স্থায়ীভাবে সন্তান বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বাস করে। পরিবারের সঠিক সংজ্ঞা দেয়া বেশ কঠিন। পরিবারের আকার ও প্রকার নানা ধরনের এ জন্য এর সংজ্ঞাও বিভিন্ন। অধ্যাপক ম্যাক আইভার পরিবার সম্পর্কে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার সংজ্ঞা অনুসারে পরিবারের কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ঃ

১। **পরিবার একটি ক্ষুদ্র বর্গ ঃ** পরিবারের আকৃতি ক্ষুদ্র। এর সদস্য সংখ্যার যদিও কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই তবে এর আকার বৃহাদাকার হয় না। কারণ পরিবারের যে মূল তাৎপর্য অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিনষ্ট হয় এবং সংগত কারণেই বড় পরিবার বিভক্ত হয়ে ছোট পরিবারে রূপ নেয়।

২। **বৈবাহিক সম্পর্ক ঃ** পরিবার বৈবাহিক বন্ধন দিয়ে আবদ্ধ। এখানে সন্তান-সন্ততির জন্ম এবং লালন পালন-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ দুটো বৈশিষ্ট্য ছাড়া আরও কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেমন ঃ

ক) **রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ঃ** রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তা পরিবারের কাঠামো তৈরি করে। রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ছাড়া পরিবারের কথা কল্পনা করা যায় না। কাজেই রক্তের সম্পর্ক পরিবারের মেরুদন্ড স্বরূপ।

খ) **সামাজিক সংগঠনের মূলকেন্দ্র ঃ** সমাজ জীবন প্রধানত পরিবারের সমষ্টি। সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র পরিবার।

গ) **নামকরণ ঃ** বংশের পরিচয় ধরে পরিবার তার সকল সদস্যের নামকরণ করে থাকে। পরিবারের সদস্যদের নাম ও পদবী পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে চলে।

ঘ) **সামাজিক নিয়ম কানুন ঃ** পরিবার সমাজের একক। সমাজ বহু পরিবারের সমষ্টি। পরিবারের বিস্তৃতি বহুবিধ সামাজিক সংগঠনের কাঠামো রচনা করে। সামাজিক বিধি ও আইন সম্পর্কীয় নিয়ম কানুন পরিবারকে সুরক্ষিত করে।

ঙ) **নৈতিক মূল্যবোধ ঃ** স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও নির্মল চরিত্র গঠন পরিবারের অন্যতম ভিত্তি।

চ) **সামাজিক একক ঃ** পরিবার হচ্ছে সমাজের একক। পরিবারের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি অনেক সামাজিক সংগঠনের কাঠামোকে রচনা করেছে।

ছ) **সন্তানদের দায়িত্ব ঃ** পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং আন্তরিক। পারিবারিক জীবনে নর ও নারীকে কেবলমাত্র নিজ প্রয়োজন ছাড়া অপরের জন্য কঠোর দায়িত্ব পালন করতে হয়।

জ) **উপার্জনকারীর প্রাধান্য ঃ** পরিবারের উপর ব্যক্তির প্রাধান্য নির্দিষ্ট কোন মানদন্ডে নির্ধারিত হয় না। তবে যে ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রধান উপার্জনকারী তিনিই পরিবারের কর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঝ) **শাশ্বত ঃ** পরিবার হচ্ছে একমাত্র স্থায়ী ও চিরন্তন প্রতিষ্ঠান। আবহমান কাল ধরে এ যাত্রা চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে।

ঞ) **গঠনমূলক প্রভাব ঃ** জন্ম থেকে শুরু করে মানুষ পারিবারিক পরিবেশে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং মানুষের জীবনের উপর পরিবারের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এর মাধ্যমে পরিবারের শিশুদের চরিত্র গঠন হয়।

ট) **আবেগময় ভিত্তি ঃ** পরিবারের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মানসিক আবেগ দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক প্রকৃতি, সন্তানদের প্রতি মায়া মমতা, ভালবাসা ইত্যাদির জন্ম হয়।

ঠ) **ধর্মমতের মিল ঃ** একটি আদর্শ পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একই ধর্মের লোক দিয়ে পরিবার সুগঠিত হয়। পারিবারিক কাঠামো ঠিক রাখার জন্য এটা আবশ্যক।

ড) নির্দিষ্ট বাসস্থান ঃ পরিবারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হল থাকার বা বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকতে হবে।

ঢ) পারিবারিক বিশ্বাস ঃ পরিবার গঠনের জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য। অভাব হলে পারিবারিক জীবন সুখকর হয় না।

ণ) কার্য বন্টন ঃ একটি আদর্শ পরিবারের বিশেষ কাজ প্রতিটি সদস্যদের মধ্যে কর্মক্ষমতা অনুযায়ী কাজ সুষ্ঠুভাবে ভাগ করে দেয়া এতে পরিবারের সংহতি বাড়ে এবং প্রত্যেকে দায়িত্ববান হয়।

সমাজে নানা ধরনের পরিবার আমরা দেখতে পাই। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে পরিবারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। **ক্ষমতার মাত্রা ঃ** ক্ষমতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে পরিবারকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক) মাতৃপ্রধান পরিবার এবং
খ) পিতৃপ্রধান পরিবার

মাতৃপ্রধান পরিবার ঃ যে পরিবারে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা পরিবারের বয়স্ক মেয়েদের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে মাতৃপ্রধান পরিবার বলে। বাংলাদেশে গারো উপজাতিদের মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

পিতৃপ্রধান পরিবার ঃ পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা যখন পরিবারের বয়স্ক পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয় তখন তাকে পিতৃপ্রধান পরিবার বলা হয়। আমাদের সমাজে পিতৃপ্রধান পরিবারই লক্ষ্য করা যায়।

২। **বিবাহোত্তর বসবাসের ঃ** বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পরিবারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

ক) মাতৃবাস পরিবার
খ) পিতৃবাস পরিবার এবং
গ) নয়াবাস পরিবার

মাতৃবাস পরিবার ঃ মাতৃবাস পরিবারে বিবাহিত নবদম্পত্তি স্ত্রীর পিতৃগৃহে বসবাস করে। বাংলাদেশে গারো উপজাতি সমাজে মাতৃবাস রীতি প্রচলিত।

পিতৃবাস পরিবার ঃ এই পরিবারে বিবাহিত নবদম্পত্তি প্রথা অনুয়ায়ী স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে। বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থায় পিতৃবাস রীতিই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

নয়াবাস পরিবার ঃ এই পরিবারে বিবাহিত নব দম্পত্তি তাদের কারও পিতৃগৃহে বাস না করে সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন বাড়িতে বসবাস করে। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে এই ধরনের পরিবার দেখা যায়।

৩। **বংশ মর্যাদা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঃ** বংশ মর্যাদা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক) মাতৃসূত্রীয় পরিবার
খ) পিতৃসূত্রীয় পরিবার

পিতৃসূত্রীয় পরিবারে সন্তান-সন্ততি পিতার ধারায় সম্পত্তি এবং বংশ, নাম বা মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে। অন্যদিকে মাতৃসূত্রীয় পরিবারে সন্তান-সন্ততি মাতৃধারায় সম্পত্তি এবং বংশ, নাম বা মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে।

৪। **পরিবারের আকার ঃ** আকারে ভিত্তিতে পরিবারের তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়-

ক) একক পরিবার
খ) বর্ধিত পরিবার
গ) যৌথ পরিবার

স্বামী-স্ত্রীর দু জনার পরিবার অথবা তাদের সঙ্গে অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে গঠিত পরিবারকে একক পরিবার বলে। তিন পুরুষের পরিবারই বর্ধিত পরিবার। এখানে স্বামী স্ত্রী; সন্তান সন্ততি, নাতি-নাতনী একসঙ্গে বসবাস করে। এটা মূলত একক পরিবারের বর্ধিত রূপ।

কোন পরিবারের সঙ্গে যদি স্বামী বা স্ত্রীর বাবা-মা, এক বা একাধিক ভাই ও তাদের সন্তান-সন্ততি বা নিকট আত্মীয়-স্বজন বসবাস করে তবে তাকে যৌথ পরিবার বলা হয়।

৫। স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা ঃ পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিবারকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়-
একপত্মীক পরিবার ঃ বাংলাদেশে অধিকাংশ একপত্মীক পরিবার। অর্থাৎ এদেশে অধিকাংশ পুরুষই একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। আমাদের দেশে বর্তমানে কাম্য পরিবার হল একপত্মীর একক পরিবার।

বহুপত্মীক পরিবার ঃ আগে বাংলাদেশে বহুপত্মীক পরিবার প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বহুপত্মী গ্রহণ করা সামাজিক দিক থেকে নিন্দনীয়। বহুপত্মীক পরিবারে প্রায় সর্বদাই অশান্তি লেগে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে একজন পুরুষকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হলে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে তা এদেশীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। এসব কারণে বহুপত্মীক পরিবার দিন দিনহ্রাস পাচ্ছে।

পরিবারের কার্যাবলী

পরিবার একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন। অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মত পরিবার সামাজিক চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন রকম কাজ করে। পরিবারের এমন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে যা অত্যন্ত মৌলিক এবং যা সব সমাজেই কম বেশি লক্ষ্য করা যায়। নিচে পরিবারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজের বিবরণ দেয়া হল—

ক) পরিবারের জৈবিক কাজ ঃ স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও সন্তান জন্মদান করা জৈবিক কাজের মধ্যে পড়ে। মূলত অদ্যবধি অধিকাংশ মানুষ পরিবারের গন্ডিতেই জৈবিক চাহিদা পূরণ করে।

খ) পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ ঃ সন্তানের লালন-পালন পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজের মধ্যে পড়ে। পিতামাতা সন্তান-সন্ততিকে অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে লালন পালন করে থাকে। ভবিষ্যত জীবনে এসব স্নেহ ভালবাসা সন্তানের মনোজগতের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটায়।

গ) পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ঃ পরিবার বিভিন্ন বিপদ-আপদ থেকে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। নানাধরনের ভীতিজনক পরিস্থিতি, পরিবেশ, অসুস্থতা থেকে পরিবার সদস্যদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

ঘ) পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ ঃ পরিবার আদি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অতীতের মত না হলেও বর্তমান কালেও উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা অনেকাংশ পরিবারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বর্তমানকালে কুটির শিল্প, মৃৎ শিল্প, পশুপালন, মৎস্যচাষ, কৃষিকাজ ইত্যাদি বহুলাংশে পরিবার দিয়ে পরিচালিত হয়।

ঙ) সাংস্কৃতিক কাজ ঃ পরিবারে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কাজ সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে সংগীত, আবৃত্তি, অংকন, অভিনয় প্রভৃতি প্রধান।

চ) পরিবারের শিক্ষাদান কাজ ঃ সন্তানদের শিক্ষাদান পরিবারের একটি কাজ। পরিবার অনানুষ্ঠানিক পন্থায় সন্তানদের নীতিবোধ শিক্ষা দেয়, বিদ্যালয়ে ভর্তি করে; বাড়িতে নিয়মিত পড়ার ওপর নজর রাখে, বাবা মা বা পরিবারের কোন সদস্য পড়িয়ে দেন অথবা প্রাইভেট শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা করেন। পরিবারে শিক্ষাগ্রহণের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে।

ছ) পরিবারের ধর্মীয় শিক্ষাদান কাজ ঃ সন্তান সন্ততিদের মধ্যে ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষাদান করা পরিবারের আর একটি কাজ। ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব অনেক। এটি ব্যক্তিগত লোভ লালসা নিয়ন্ত্রণে এবং চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

জ) পরিবারের রাজনৈতিক কাজ ঃ পরিবারের অন্যতম কাজ সন্তানদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। পরিবারের গন্ডিতেই সন্তান সন্ততি নেতৃত্ব, দায়িত্ব, কর্তব্য, নিয়ম শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। পিতামাতা ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থেকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। বস্তুত পরিবার সুনাগরিক গড়ার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান।

ঝ) সামাজিক কাজ ঃ পরিবার সমাজের মৌলিক সংগঠন। পরিবারের মাধ্যমে সামাজিক লেনদেন, চালচলন, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। পরিবার সামাজিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পরিবার ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্মে পরিকল্পনায় ব্যবস্থাপনায় ও অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।

সারাংশ

পরিবার ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল সংগঠন। কারণ যে দম্পতিকে কেন্দ্র করে কোন একটি পরিবারের সূচনা হয় তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তান সন্ততিকে কেন্দ্র করে আবার নতুন পরিবারের সৃষ্টি হয়। সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের পথ

পরিক্রমায় পরিবারের কাঠামোতে পরিবর্তন লক্ষণীয় এবং এ পরিবর্তনের ধারা চলমান। সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত পরিবারের কাজের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু কাজগুলো পরিবারকে পালন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানব সমাজে কোনটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা হয়?

ক. গৃহ
খ. রাষ্ট্র
গ. পরিবার
ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২। আমাদের সমাজে কোন ধরনের পরিবার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়?

ক. মাতৃপ্রধান
খ. পিতৃপ্রধান
গ. যৌথ পরিবার
ঘ. মাতৃবাস পরিবার

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। বিভিন্ন ধরনের পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩। পরিবারের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ১.২ ঃ যৌথ ও একক পরিবারের উপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- একক ও যৌথ পরিবারের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- একক ও যৌথ পরিবারের সুবিধা অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- পরিবারের উপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব উপলব্ধি করে বাস্তব ও জীবনধর্মী কাজ করতে আগ্রহী হবেন

পারিবারিক কাঠাম ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে পরিবারকে আমরা দুই ভাগে দেখতে পাই। একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার বলতে আমরা সেই পরিবার বুঝি যেখানে একজন স্বামী ও একজন স্ত্রী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল সন্তানেরা বসবাস করে। একক পরিবারে স্বামীই পরিবারের কর্তা থাকেন এবং তাঁর নির্দেশেই পরিবার পরিচালিত হয়। এখানে স্বামী কর্তা হিসেবে পরিবারের প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করেন এবং তাঁর মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে কর্তা সে তাঁর আয়ের সবটুকু নিজের ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন এবং ইচ্ছামত জীবন চালাতে পারেন। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরিজীবী হলে বাসার কাজের লোকের উপর নিজেদের ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ভর করতে হয়। ছেলেমেয়েরা নিঃসঙ্গতায় ভোগে। নিজের সমস্যা নিজেকেই মেটাতে হয়।

অন্যদিকে যৌথ পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি, ভাইদের স্ত্রী-সন্তান, স্ত্রীর ভাই-বোন পিতা-মাতা, ও তাদের সন্তান একত্রে বসবাস করে। যৌথ পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারের কর্তা হয় এবং তাঁর নির্দেশেই পরিবার পরিচালিত হয়। এখানে পরিবারের সকল উপার্জনক্ষম ব্যক্তির আয়কৃত টাকা একত্রে জমা হয় এবং কর্তা পরিবারের প্রয়োজন মোতাবেক তা খরচ করেন। সাধারণত এই পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তার মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। পরিবারের সব সদস্য তার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং কর্তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে চলতে হয় এবং যে কোন কাজে কর্তার মতামত নেয়া হয়। পরিবারের সব সুযোগ সুবিধা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। যৌথ পরিবারের কারো বিপদ আপদ বা অসুখ বিসুখ হলে সবাই এগিয়ে আসেন এবং সুখ দুঃখে অংশগ্রহণ করেন। এখানে বিশেষ করে শিশুরা ও বৃদ্ধরা নিঃসঙ্গতায় ভোগে না এবং তাদের খেলার ও কথা বলার লোকের অভাব হয় না। পারিবারিক সদস্যরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়। ঘরে যারা কাজ করে তাদের হঠাৎ কাজের লোকের উপর অতটা নির্ভরশীল হতে হয় না।

কাজেই আমরা দেখতে পাই একক পরিবারে যেমন কতগুলো সুবিধা আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। ঠিক একই ভাবে যৌথ পরিবারেও সুবিধা ও অসুবিধা দুইই দেখা যায়। বিশ্বের যে দেশগুলোতে শিল্প ও যান্ত্রিকতার প্রসার ঘটেছে সেসব দেশে স্বাভাবিকভাবেই একক পরিবার গড়ে উঠেছে কারণ শিল্প কারখানার কাজ করায় শ্রমিকগণ ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। কোন কোন শ্রমিক গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে কাজ করছে। এর ফলে যৌথ পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে আলাদা পরিবার গঠন করছে। আমাদের বাংলাদেশেও শিল্পায়ন, নতুন নতুন নগর, শহর, বন্দরের পত্তন এবং শিক্ষার প্রসারতার কারণে চাকরিজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে এবং যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। যৌথ পরিবারের গুরুত্ব কৃষিভিত্তিক সমাজে অনেক বেশি। কৃষিভিত্তিক পরিবারে পরিবারের জনশক্তি একটি প্রধান উপাদান। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক কাজের সুবিধা হয়।

এবার পরিবারের উপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। সামাজিক পরিবর্তন বলতে সেই ধরনের রূপান্তরকে বুঝে থাকি যে রূপান্তরের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোর ক্রিয়া পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী হতে পারে আবার আঞ্চলিকও হতে পারে। বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হতে পারে। বাংলাদেশেও একক ও যৌথ পরিবারের উপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর উভয় সমাজেই সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। শহরে এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নানাবিধ কুসংস্কার, অমূলক ধারণা, অদৃষ্টবাদিতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু কালের বিবর্তনে এবং আধুনিক যুগে ক্রমশ গ্রামাঞ্চলের এই কুসংস্কারাছন্ন মনোভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের দেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি। ফলশ্রুতিতে ধর্মের নামে নানা অপপ্রচার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব সহজেই তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। শহরের লোকেরা কমবেশি শিক্ষিত। সে কারণেই তাদের ভেতর বাস্তববাদীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রয়োজনের কারণে, অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান কালে শহরাঞ্চলে আদর্শ পরিবার বলতে একক

পরিবার বুঝায়। গ্রামে যৌথ পরিবারগুলো বর্তমান কালে ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং গ্রামেও একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা চাকরির প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শহরে একক পরিবার গঠন করছে। আগে সবাই আত্মীয়-স্বজন নিয়ে গ্রামে বাস করে আনন্দে দিন কাটাত। সেখানে একক পরিবারের স্বাধীন চলাফেরার সুবিধা থাকায় ক্রমশ এর প্রতি তারা আকৃষ্ট হচ্ছে। সামাজিক পরিবর্তনের কারণে এখন লোকদের আবেগ, অনুভূতি, ভালবাসা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণাবলী ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যম; যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, ইত্যাদির মাধ্যমে দেশ বিদেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির পরিবর্তনের কথা জানতে পারছে এবং পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করছে। যৌথ পরিবার অনুন্নত দেশ ও কৃষিভিত্তিক সমাজে বিশেষ ফলপ্রসূ হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক যুগ যান্ত্রিক ও শিল্পোন্নত হওয়ার ফলে পারিবারিক যৌথ ব্যবস্থা টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আর সে কারণেই উন্নয়নশীল ও উন্নয়নকামী দেশগুলোতে এর ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছে এবং একক পরিবারের প্রাধান্য বেড়ে যাচ্ছে।

সারাংশ

শিল্পায়ন, শহরায়ন ও বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে পরিবর্তন আধুনিক সমাজ জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন পরিবর্তনের ভাল ও মন্দ দিক দুটোই দেখা যায়। সমাজ সবসময়ই পরিবর্তনশীল। সমাজ যেহেতু গতিশীল তাই পরিবর্তন অপরিহার্য। পরিবর্তন যদি সুপরিকল্পিত হয় তবে সমস্যার সৃষ্টি হয় না সেজন্য সামাজিক পরিবর্তন যেন পরিকল্পিত হয় সেজন্য আমাদের সকলের সচেতন হওয়া উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি একক পরিবার?
- ক) স্বামী-স্ত্রী, নিজ সন্তানসহ পরিবার
- খ) স্বামী, স্ত্রী, নিজ সন্তান ও বাবা-মা, দেবর, ননদসহ পরিবার
- গ) স্বামী, স্ত্রী, ভাই-বোন, পিতা-মাতাসহ পরিবার
- ঘ) বাবা-মা, ছেলে মেয়ে, শ্বশুর শ্বাশুড়ীসহ পরিবার

২। যৌথ পরিবারের লোকসংখ্যা কিরূপ?
- ক) কম
- খ) স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, চাচা, ফুপু, দাদা, মামাসহ একাধিক
- গ) স্বামী-স্ত্রী-দুজন
- ঘ) স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ৩-৪ জন

৩। সামাজিক পরিবর্তন কেন হয়?
- ক) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নগর শিল্পায়নের ফলে
- খ) লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে
- গ) একক পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যে
- ঘ) যৌথ পরিবার ভাঙ্গনের উদ্দেশ্যে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একক ও যৌথ পরিবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।

২। একক ও যৌথ পরিবারের উপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করুন।

পাঠ- ১.৩ ঃ পরিকল্পিত পরিবারের সংজ্ঞা গুরুত্ব ও সন্তান পালনে সুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পরিকল্পিত পরিবারের সুবিধা জানতে পারবেন
- ছোট পরিবার গঠনে আগ্রহী হবেন
- পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন

পরিকল্পিত পরিবার বলতে বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রী, তাদের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা বিচার করে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সন্তান গ্রহণ করে একটি সুখী পরিবার গঠনের প্রচেষ্টাকে বুঝায়। অন্যভাবে জনসংখ্যা হ্রাস করাকে বুঝায়। পরিকল্পিত পরিবারে এমন একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যা দিয়ে একটি সুখী, স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠন করা যায়। অন্যদিকে অপরিকল্পিত পরিবার এর ঠিক বিপরীত। এ ধরনের পরিবারে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না। স্বামীর আর্থিক দিক বিচার করা হয় না, স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্য বিবেচনা না করে একের পর এক সন্তান জন্ম দিয়ে পরিবারটিকে অহেতুক বড় করতে থাকে, যার ফলে অতি সহজেই এ অপরিকল্পিত পারিবারটি পরিবারিক ও সামাজিকভাবে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি ছোট আদর্শ ও সুখী পরিবার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা ও তা নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবারের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা। বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামের শতকরা নব্বই ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও সামাজিক কুসংস্কারের জন্য জনসংখ্যা নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। আমাদের জাতীয় আয়ের তুলনায় বাংলাদেশে জনসংখ্যার হার অনেক বেশি। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে অনেক বেশি। মাথা পিছু আয় কমে যাচ্ছে এবং দেশবাসী ক্রমেই দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হচ্ছে। নিচের সুবিধাগুলো রক্ষার্থে বাংলাদেশে তাই পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ঃ** বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০০৫ সালের জনসংখ্যার দ্বিগুণ হবে। তাই পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা আবশ্যক।

২। **খাদ্য ঘাটতি দূর করা ঃ** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের খাদ্যোৎপাদন সঠিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। যার ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত পরিবার গঠন।

৩। **বেকার সমস্যা দূরীকরণ ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আমাদের কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বহু যুবক বেকারত্বের শিকার হচ্ছে। অবিলম্বে এ সমস্যা দূর না করতে পারলে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করবে। এ কারণে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ঃ** বাংলাদেশে অপরিকল্পিত পরিবার বৃদ্ধির কারণে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক কোন উন্নতি হচ্ছে না। দিন দিন অর্থনৈতিক অবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ছে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ করা সম্ভব। অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হচ্ছে তা অপরিকল্পিত পরিবারে জনসংখ্যার ভরণপোষণের চাপে ব্যয় হওয়ার কারণে মূলধন পরিমাণমত বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কাজেই পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

৫। **সামাজিক অনাচার রোধ ঃ** অপরিকল্পিত পরিবার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। যার ফলে অপরিকল্পিত পরিবারের সদস্যরা মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়াতে নানা রকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, পকেটমার ইত্যাদি অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে সমাজকে ও পরিবারকে কলুষিত করছে। এই অসামাজিক কার্যকলাপ রোধ করতে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬। **মা ও শিশুর স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ঃ** অপরিকল্পিত পরিবারে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয় যার ফলে সারাজীবন ধুকে ধুকে অপুষ্টিতে জীবন শেষ করে। অধিক সন্তানের কারণে পরিবারে সকল সদস্য তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে পরিবারের সুস্থতা বিনষ্ট হয়। পরিকল্পিত পরিববারের মাধ্যমে মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

কাজেই আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র অস্বচ্ছল পরিবারের জন্য নয়, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সব পরিবারের জন্য বর্তমানে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিকল্পিত পরিবারে সন্তান পালনের সুবিধা

পরিবারকে আদর্শ, সুখী ও স্বচ্ছল করার জন্য পরিকল্পিত পরিবারের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজন বিদিত। পরিবারে পছন্দ অনুযায়ী যদি সন্তান আসে তাহলে তার পরিচর্যায় সাধারণত কোন ক্রটি থাকে না।

সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তার পরিচর্যা আরম্ভ হয়। সুস্থ মা সুস্থ সন্তানের জননী। মার সুস্থতার কারণে সন্তান সুস্থ হিসেবে ভূমিষ্ট হয় ও মা নিজেও সন্তানকে সুন্দর এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে বড় করে তুলতে পারেন। তিনি সন্তানকে সময় দিতে পারেন ও সন্তানের যত্নের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে পারেন। শিশুর প্রয়োজনমত খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা সব মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবারের সদস্যরা শিশুর লালন পালনে অধিক সময় দিতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবারে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয়ে থাকে। শিশুদের এক্ষেত্রে সব ধরনের প্রয়োজন পরিবার মেটাতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবার আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হয় বলে শিশু জন্মাবার পর থেকে তার সব চাহিদা মা-বাবা পূরণ করতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবারে শিশুর মানসিক বিকাশ ও সুস্থতার জন্য নানা ধরনের চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। যার ফলে শিশু-মানসিক ভাবে সুস্থ ও ভাল থাকে, হাসিখুশী থাকে। শিশু এক অনাবিল স্নেহ মায়া, মমতা, ভালবাসার মধ্যে এক সুন্দর পরিবেশে বড় হয়। শিশু শৈশব কাল থেকে উপযুক্ত স্নেহ-মায়ামমতায় বড় হয় বলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ভাল হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি প্রয়োজন সামগ্রী তার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশকে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে শিশু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

সারাংশ

একটি আদর্শ ও সুখী পরিবার গঠনে পরিকল্পিত পরিবার-এর কোন বিকল্প নাই। পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমে দেশের বিশাল জনসংখ্যা রোধ করা সম্ভব। তা না হলে দেশের জন্য মারাত্মক পরিণতি সৃষ্টি হবে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব। ভবিষ্যত প্রজন্মের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মানসিক, দৈহিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পরিকল্পিত পরিবার কীভাবে গড়ে ওঠে?
- ক) স্বামীর ইচ্ছায়
- খ) স্ত্রীর ইচ্ছায়
- গ) স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে পরিবার গঠন হয়
- ঘ) স্বামী বা স্ত্রী কোন পরিকল্পনা না করেই পরিবার গঠন করে

২। চোর, ডাকাত, হাইজ্যাকার সাধারণত কোন ধরনের পরিবারের সন্তান হয়?
- ক) একক পরিবারের
- খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের
- গ) অপরিকল্পিত পরিবারের
- ঘ) পরিকল্পিত পরিবারের

৩। পরিকল্পিত পরিবারের শিশুর বিকাশ কিরূপ হয়?
- ক) দৈহিক বৃদ্ধি ভাল হয়
- খ) মানসিক বৃদ্ধি ভাল হয়
- গ) সামাজিক বৃদ্ধি ভাল হয়
- ঘ) দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সঠিক হয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিকল্পিত পরিবার বলতে কি বোঝায়? পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২। পরিকল্পিত পরিবারে সন্তান পালনের সুবিধা বর্ণনা করুন।

পাঠ- ১.৪ ঃ শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিশুর বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- শিশুর সার্বিক বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। অপরিমেয় প্রাণ-প্রাচুর্য, বুদ্ধির কলা-কৌশল, নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে নানা রকম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। ক্রমাগত অনুশীলন, পরীক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়াসে মানুষ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। প্রগতির এই অগ্রযাত্রার পেছনে রয়েছে তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের সুসমন্বয়। শৈশব, প্রাক-কৈশোর, কৈশোর, বয়:সন্ধিকাল মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কতগুলো গুণ ও শক্তি অর্জন করে নিতে হয়। সহজাত প্রবৃত্তি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ গুণের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে যদি পারে তবেই সে সমাজের আর দশ জন বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম হয়। কাজেই জন্ম থেকে শুরু করে মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরে শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিভিন্ন পর্যায়ের যে বিকাশ সধিত হয় যা তাকে সমাজে স্বাভাবিক আচরণে, সুস্থ জীবন যাপনে অন্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে এরূপ বিকাশই হচ্ছে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ।

শিশু যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, শিশুর জীবনে তাদের প্রভাব সুদূর প্রসারী। বাবা-মা আত্মীয় স্বজন পরিবৃত পারিবারিক পরিবেশ শিশুর ক্রমবর্ধমান মন-মানসের ওপর ধীরে ধীরে রেখাপাত করে এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে। একটি সুন্দর, সহানুভূতিশীল মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন সুস্থ পরিবেশ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য অন্যতম অনুকূল পরিবেশ। পরিণত জীবনে অপসংহতির মূলে থাকে শিশুকালের তিক্ত অবহেলা ও অভিজ্ঞতা। যে সব বাবা-মা সন্তানদের অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার ভেতর দিয়ে লালন করেন বা স্নেহ ভালবাসায় অন্ধ হয়ে অতি মাত্রায় প্রশ্রয় দেন তাদের সন্তানদের মধ্যে জেদী মনোভাব ও একগুয়েমী, অসামাজিক আচরণ দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানী ফ্লুগেল বলেছেন, যে সব বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের কঠোর শাসন ও অতিমাত্রায় সাবধানতার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্রোহী ও অসহনীয় হয়ে ওঠে। সাধারণত দেখা যায় যেসব শিশু পরিণত জীবনে সাফল্য অর্জন করে তাদের ছেলেবেলায় পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখময় ছিল এবং তাদের সাথে বাবা-মার সম্পর্ক মধুর ও সমঝোতাপূর্ণ ছিল।

নিয়মনীতির অনুশাসনে মায়ামমতাহীন পরিবারে বাড়ন্ত শিশুর মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, স্নেহ পরিচর্যা যেমন শিশুর সহজাত বৃত্তির বিকাশে সাহায্য করে, মেধাবী ও প্রাণবন্ত শিশু পারিবারিক স্বীকৃতি ও স্বাচ্ছন্দের অভাবে তেমনি হয় দুর্বিনীত ও মেরুদন্ডহীন পুরুষ। বাবা-মার পারিবারিক সম্পর্কে যেখানে স্বাচ্ছন্দ নেই সেখানে শিশু তার স্বাভাবিক গুণ বিকাশে প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হয় ফলে তার বিকাশসাধন ব্যহত হয় এবং সে বিপথে পা বাড়ায়। সন্তানের প্রতি বাবা-মার অবহেলা, অনাদর বা অতিরিক্ত দমননীতির প্রভাবে সন্তান বাবা-মার প্রতি আস্থাহীন ও অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। আধুনিক অনেক মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখেছেন সংসারে অবহেলিত শিশুরা কীভাবে বাইরের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যেহেতু শিশুর প্রথম পরিবেশই হচ্ছে তার গৃহ পরিবেশ কাজেই পরবর্তী জীবনে এই গৃহ পরিবেশের সুশৃঙ্খলিত পরিবেশ তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের অন্যতম হাতিয়ার। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গৃহপরিবেশের বাইরে শিক্ষাঙ্গণে আসে। তখন সে পরিবেশও তাকে প্রভাবিত করে। তথাপি তার জীবনের প্রথম পরিবেশের ছাপ তার চলাফেরায়, কথাবার্তায়, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ও মনোজগতে গভীর রেখাপাত করতে থাকে।

শিশু জন্মগ্রহণের পর পরই বাবা-মার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে নবজাত শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করার মধ্য দিয়ে মায়ের সঙ্গে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে যখন সে বড় হতে থাকে তখন অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়ে যেমন- খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টানো, আদর স্নেহ ভালবাসা, ঘুম পাড়ানির গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাবা-মার সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে শিশু বাবা-মার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তার কোন অসুবিধা হলে সামান্যতেই মাকে কাছে পেতে চায়। শিশু যখন ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকে তখন বাবা-মা ছাড়াও পরিবারের অন্য সদস্য যেমন ভাই-বোন দাদা-দাদী, নানা-নানীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সবার ভেতরে সে একটা স্থান করে নেয়। প্রতিটি পরিবারে বিশেষ করে বাবা-মাকে শিশুরা আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে মনে করে ও পেতে চায়। এক্ষেত্রে বাবা-মার পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল না হলে শিশু মানসিকভাবে হোঁচট খায় এবং ধীরে ধীরে সে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ বাবা-মার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। কাজেই পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক ঘনিষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয়।

যেসমস্ত পরিবারে পিতা-মাতা নিজেদের নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, শিশুদের সময় দেন না সেসমস্ত শিশুরা প্রায় সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বাবা মা উভয়েই কর্মস্থলে যান, একক পরিবারে ছোট্ট শিশুটি থাকে গৃহ ভৃত্যের কাছে। দীর্ঘ সময় তাদের অনুপস্থিতি শিশু-মনকে দলিত, মথিত করতে থাকে। শিশু-মনের উপর দারুন মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা পারিবারিক কাজে সমান অংশ গ্রহণ করে না। পারস্পরিক সমঝোতার অভাব দেখা যায়। গৃহকর্ত্রী ঘরবাইর একাই সবটা সামাল দেন, সেসব শিশুদের মানসিকভাবে ও স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়তে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও বিশেষত আমাদের বাংলাদেশে এ সমস্ত শিশুদের দীর্ঘ সময় সাহচার্য ও সান্নিধ্যের জন্য সেধরনের খুব কমই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা পরিবার এবং শিশুকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

শিশু যখন তার বাবা-মার সাথে নিজেকে এক করে ভাবে তখন তার মধ্যে অধিসত্তার জন্ম হয়। এবং এই সময় যদি বাবা-মার কাছ থেকে সে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্নেহ ভালবাসা পায় তার আত্মবোধ দৃঢ় হয়। ৭/৮ বছরের ছেলেরা বাবাকে অনুসরণ করে এতে তাদের ভেতর অবচেতন মনের অনেক দ্বন্দ্ব দূর হয়। বাবা ও ছেলের সম্পর্ক যদি সুন্দর না হয় তাহলে ছেলে বাবাকে অনুসরণ করতে চায় না। শিশুর সামাজিক বিকাশে সে পরিবারের বাইরে আকৃষ্ট হয় এবং বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না হলে বাইরের লোকের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে এবং প্রিয় বন্ধু বা বড় কাউকে সে অনুসরণ করে। বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে শিশু বাবা মাকে সমালোচনা করে এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেয়। বাবা-মা তার প্রতি কঠোর আচরণ, মনোভাব প্রকাশ করলে তার প্রতিফলন তার ছোট ভাইবোনের ওপর পড়ে। বিভিন্ন পরিবারে শিশুদের সঙ্গে বাবা মার পরিচালনা ও সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের হওয়াতে ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রেও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের আচরণে তা প্রকাশ ঘটে। কাজেই নির্মল, নিস্পাপ শিশুর কোমল কচি মনে শৈশব জীবনের মধুরতম স্মৃতি বা তিক্ত অভিজ্ঞতা তার পরবর্তী জীবনের আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। শিশুরা নিতান্ত অজান্তেই ভাল-মন্দের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে।

সারাংশ

শিশুর জন্ম মুহূর্তে বা তার পরপরই কোন শিশু তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে স্থানচ্যুত হলে পরবর্তী জীবনের নতুন পরিবেশে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন শিশুর জীবনে দেখা দেয় এবং শৈশবের পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুর তিক্ত বা মধুর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ও প্রতিফলন তার সমগ্র সত্তার বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ কাকে বলে?
- ক) শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে
- খ) শিশুর আবেগিক বিকাশকে
- গ) শিশুর সামাজিক ও মানসিক বিকাশকে
- ঘ) শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশকে

২। যে সব শিশু কঠোর শাসনে বড় হয়, সেসব শিশু কেমন হয়?
- ক) নমনীয়
- খ) এক গুয়েমী স্বভাবের
- গ) বিদ্রোহী
- ঘ) উদার প্রকৃতির

৩। যে সব শিশু সামাজিক ও পরিণত জীবনে সাফল্য অর্জন করে তাদের পারিবারিক জীবন কেমন ছিল?
- ক) অত্যন্ত কঠোর ছিল
- খ) পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল
- গ) পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখময় ছিল
- ঘ) বাবা-মার স্নেহ ভালবাসার অফুরন্ত প্রশ্রয় ছিল

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২। বাবা-মার সম্পর্ক ভাল না হলে শিশুর উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়?

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী-১

অনুশীলনী- ১.১ ঃ ১। গ ২। খ

অনুশীলনী- ১.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক

অনুশীলনী- ১.৩ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ

অনুশীলনী- ১.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ

ইউনিট ২

মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব

ভূমিকা

মানব বিকাশের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যায় হচ্ছে প্রাক্‌জন্ম পর্যায়। গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে এ পর্যায় শুরু হয় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাবার জনন কোষ এবং মায়ের জনন কোষের মিলনে মায়ের গর্ভে সূঁচের আগার মত একবিন্দু কোষ সৃষ্টি হয়। বিভাজনের মাধ্যমে কোষগুলো বিন্যস্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রূপ নেয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়।

মাতৃগর্ভে শিশু তিনটি ধাপে বেড়ে ওঠে। প্রতিটি ধাপেই বিপত্তি দেখা দিতে পারে। সেজন্য এ সময় মায়ের যত্নের প্রয়োজন। কারণ সুস্থ মা সুস্থ-সবল শিশুর জন্ম দেন।

মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধিতে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব পড়ে। শিশুর জন্মপূর্ব পরিবেশ হচ্ছে মা ও তাঁর দেহ। শিশুর খাদ্য শ্বাসক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, কোষ বৃদ্ধি ইত্যাদির উৎস হল মায়ের দেহ। অনুকূল জন্ম পরিবেশে বংশগতির সম্ভাবনাকে বিকশিত করে আবার প্রতিকূল পরিবেশ এসব সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে। ফলে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হয়।

পারিপার্শ্বিক প্রভাবগুলোর মধ্যে মায়ের পুষ্টি, বয়স, অসুস্থতা রক্তের গ্রুপ, বিকিরণের প্রভাব, হরমোন গ্রহণ, মায়ের ধুমপান, মাদক দ্রব্য সেবন এবং মানসিক প্রভাবকে বুঝিয়ে থাকে।

অতএব, গর্ভবতী ও অনাগত শিশুদের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে হলে গর্ভবতীর এসব ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে-

পাঠ-২.১ ঃ জীবনের শুরু
পাঠ-২.২ ঃ মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধি
পাঠ-২.৩ ঃ গর্ভবতী মায়ের যত্ন
পাঠ-২.৪ ঃ মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধিতে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

পাঠ- ২.১ ঃ জীবনের শুরু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- জননকোষ, ক্রোমোজম ও জিন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- নতুন প্রাণ সঞ্চারের আগে জননকোষ কি কি বিকাশমূলক পর্যায় অতিক্রম করে তা বলতে পারবেন
- স্ত্রী ও পুরুষ জননকোষের রহস্যময় ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- গর্ভধারণের গুরুত্ব ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক ধারণা দিতে পারবেন

মাতৃগর্ভে শিশুর জীবন শুরু হয় গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে এবং শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

পুরুষ জননকোষ এবং স্ত্রী জননকোষের মিলনে নতুন এককোষ প্রাণের সূচনা হয়। এটিকে বলা হয় জাইগোট বা জীবন কোষ। পুরুষ জননকোষ অর্থাৎ শুক্রাণু উৎপন্ন হয় শুক্রাশয়ে এবং স্ত্রী জননকোষ অর্থাৎ ডিম্বাণু তৈরি হয় ডিম্বাশয়ে।

জননকোষের তিনটি অংশ থাকে; যেমন- কোষ প্রাচীর, প্রাণপংক এবং প্রাণকেন্দ্র। কোষের বাইরের আবরণকে বলে কোষ প্রাচীর, কোষপ্রাচীরের ভিতরে থাকে তরল পদার্থ, এটি হল প্রাণপংক। প্রাণকেন্দ্র হল এক প্রকার অসচ্ছ ও গাঢ় উপাদানে সৃষ্ট গোলাকার বস্তু। মানুষের জীবনের মূল সত্ত্বা প্রাণপংক ও প্রাণকেন্দ্র এবং এর মাধ্যমেই সঞ্চারিত হয় বংশগতি।

প্রতিটি জননকোষের প্রাণকেন্দ্রে থাকে ২৩টি সূতার মত সূক্ষ্ম ক্রোমোজোম আর প্রতিটি ক্রোমোজোমে থাকে আনুমানিক ৩,০০০ জিন। এই জিনসমূহ হল বংশগত গুণাবলীর ধারক ও বাহক। রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত জিন সব সময় জোড়ায় জোড়ায় প্যাঁচানো ফিতার মত থাকে। এক জোড়া জিনের একটি বাবা ও একটি মায়ের কাছ থেকে আসে বলে উভয়ের কাছ থেকে পূর্ব পুরুষের গুণাবলী সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

নতুন প্রাণের সৃষ্টির আগে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু কতগুলো বিকাশমূলক পর্যায় অতিক্রম করে। পুরুষ জননকোষ দুটি পর্যায় অতিক্রম করে; যেমন- পরিনমন ও উর্বরতা সাধন অর্থাৎ নিষিক্তকরণ ক্ষমতা অর্জন। স্ত্রী জননকোষ গর্ভধারণ ক্ষমতা অর্জন করার পূর্বে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে; যেমন- পরিনমন, ডিম্বাণুস্ফুটন ও গর্ভধারণ অর্থাৎ ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর প্রবেশ পর্যায়।

পরিপক্ক ডিম্বাণুতে ২২টি সমরূপী ক্রোমোজোম ও একটি x ক্রোমোজোম থাকে। মানুষের শরীরের সবচেয়ে বড় কোষ হল ডিম্বাণু। শুক্রাণুতে সমান সংখ্যা বিশিষ্ট দুই জাতীয় পরিপক্ক শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। এক জাতীয় প্রতিটি শুক্রাণুতে ২২টি সমরূপী ও একটি বড় আকারের x ক্রোমোজোম থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত শুক্রাণুর অভ্যন্তরে ২২টি সমরূপী ক্রোমোজোম ও একটি ছোট আকারের y ক্রোমোজোম থাকে। সমরূপী ক্রোমোজোমকে অটোজোম বলা হয় যা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চুলের রং, গায়ের রং, চোখ, নাক ইত্যাদি নির্ধারণ করে। জননকোষ x ও y ক্রোমোজোম হল লিঙ্গ নির্ধারক।

ডিম্বাণুর মধ্যে একটি শুক্রাণু প্রবেশ করার সাথে সাথে ডিম্বাণু কোষের আকৃতি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যাতে আর কোন শুক্রাণু এর মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। অবশেষে দুটি জননকোষের বহিরাবরণ ভেঙ্গে গিয়ে একে অপরের সাথে একত্রীভূত হয়ে একটি প্রাণকোষে রূপান্তরিত হয়। এভাবে দুটি কোষ মিলিত হয়ে ছেচল্লিশটি ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হয় এবং একটি নতুন প্রাণের উদ্ভব হয়। গর্ভধারণের মুহূর্তটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে এ সময়ে বিকাশধারার উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমন-

১। বংশগত গুণাবলী

গর্ভধারণের সময় বাবা-মায়ের কাছ থেকে ২৩টি করে মোট ৪৬টি ক্রোমোজোম সন্তানের মধ্যে আসে এবং বংশগতি নির্ধারিত হয় এবং চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়; যেমন- শরীরের লক্ষণ, মানসিক গুণ, প্রকৃতিগত লক্ষণ। দৈহিক কর্মক্ষমতার ধরন ও প্রবণতা, বিভিন্ন অঙ্গে সবলতা ও দুর্বলতার প্রতি প্রবণতা, স্নায়বিক শক্তি সামর্থ, স্বাস্থ্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। এক্ষত্রে অটোজোম বা সমরূপী ক্রোমোজোমের ২১তম ক্রোমোজোম যদি কোন অজ্ঞাত কারণে ভেঙ্গে দুটো হয়ে যায় তা হলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দাড়ায় ৪৮টি। এতে শরীরে খুঁত দেখা দেয় যেটাকে বলা হয় ডাউন্স সিনড্রোম, জননকোষের বিশৃংখলা যেমন- ছেলে সন্তানের যদি xxy ক্রোমোজোম অর্থাৎ ডিম্বাণু যদি xy শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত হয় তা হলে সন্তানের মধ্যে ক্লাইন কেলটারস সিনড্রোম দেখা দিবে। এতে লিঙ্গের খুঁত এবং বুদ্ধিমত্তা সীমিত হয়। যদি xyy অর্থাৎ yy শুক্রাণু দিয়ে ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় বা হলে ছেলে সন্তানদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এরা লম্বা হয়, মুখে ব্রুনের দাগ থাকে এবং লিঙ্গের খুঁত থাকে। যদি বাবার শুক্রাণুতে কোন জননকোষ না থাকে এবং শুক্রাণু

যদি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তা হলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দাড়ায় ৪৫। এতে মেয়ে সন্তানের লিঙ্গের খুঁত হবে এবং এই অবস্থাকে বলা হয় টার্নাস সিনড্রোস। এরা বেঁটে হয় এবং এদের চওড়া কাঁধ থাকে।

২। লিঙ্গ নির্ধারণ

কোন ধরনের শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়েছে তার উপর র্নিভর করে ভ্রূণটি মেয়ে না ছেলেতে পরিণত হবে। x ক্রোমোজোম বহনকারী ডিম্বাণু y ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণুর সাথে মিলিত হলে ভ্রূণটি ছেলে হয় (xy) আর যদি x ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয় তবে ভ্রূণটি মেয়ে (xx) হবে।

৩। সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণ

একটি সন্তান জন্মলাভ করাই স্বাভাবিক তবে ব্যতিক্রমও হতে দেখা যায়। গর্ভধারণের মুহূর্তে ঠিক হয়ে যায় সন্তান এক বা একাধিক হবে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলনের ফলে সৃষ্ট জাইগোট যদি দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত না হয় তবে এক সন্তান, আর যদি জাইগোটটি অজ্ঞাত কারণে দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত হয়ে যায় তবে একজোড়া বা তার বেশি অভিন্ন (এক চেহারা ও এক লিঙ্গ) জমজ সন্তান হবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি দুটো বা ততোধিক ডিম্বাণু এক সাথে নির্গত হয় এবং আলাদা আলাদা শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত বা অংকুরিত হয় তবে ভিন্ন জমজ বা ভিন্ন চেহারার (বিপরীত লিঙ্গ হতে পারে) জমজ শিশুর জন্ম হয়।

সারাংশ

মানব জীবন শুরু হয় গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে। পুরুষ জননকোষ ও স্ত্রী জননকোষের মিলনে নতুন এক কোষ প্রাণের সৃষ্টি হয়। জননকোষে থাকে ক্রোমোজোম, ক্রোমোজোমে থাকে জিন। নতুন প্রাণ সঞ্চারের আগে স্ত্রী জননকোষ তিনটি পর্যায় এবং পুরুষ জননকোষের দুটো পর্যায় অতিক্রম করে। গর্ভধারণ মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ সময় লিঙ্গ, সন্তানের সংখ্যা, শারীরিক খুঁত ও বংশগতি নির্ধারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জননকোষে কয়টি অংশ থাকে?
ক) ১টি খ) ২টি
গ) ৩টি ঘ) ৪টি

২। ক্রোমোজোমের অভ্যন্তরে কি থাকে?
ক) শুক্রাণু খ) প্রাণকেন্দ্র
গ) ডিম্বাণু ঘ) ডিম্বাশয়

৩। বংশগতি সঞ্চারিত হয় কীসের মাধ্যমে?
ক) কোষের মাধ্যমে খ) জীবন কোষের মাধ্যমে
গ) জিনের মাধ্যমে ঘ) কোষ প্রাচীরের মাধ্যমে

৪। পরিপক্ব জননকোষে কয়টি ক্রোমোজোম থাকে?
ক) ২০টি খ) ২১টি
গ) ২২টি ঘ) ২৩টি

৫। প্রাণকোষ বা জাইগোটে কয়টি ক্রোমোজোম থাকে?
ক) ২৩টি খ) ৩৬টি
গ) ৪৬টি ঘ) ৫৬টি

৬। কততম ক্রোমোজোমের কারণে ডাউন্স সিনড্রোম দেখা দেয়?
ক) ২১তম খ) ২২তম
গ) ২৩তম ঘ) ২৪তম

৭। ক্লাইন কেল্টারস সিনড্রোমে ক্রোমোজোমের অবস্থান কেমন থাকে?

ক) xyy খ) xxy
গ) xxx ঘ) yxy

৮। টারনার্স সিনড্রোমে কয়টি ক্রোমোজোম থাকে?
ক) ৪২টি খ) ৪৩টি
গ) ৪৪টি ঘ) ৪৫টি

৯। বাবার জননকোষে কি ধরনের ক্রোমোজোম থাকে?
ক) xx খ) xy
গ) xo ঘ) yy

১০। অভিন্ন জমজ সন্তান প্রসবের কারণ কি?
ক) শুক্রাণুর বিশৃংখলার জন্য খ) ডিম্বাণুর বিশৃংখলার জন্য
গ) জাইগোট বিভক্তির জন্য ঘ) দুটো ডিম্বাণু পরিপক্বতার জন্য

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জননকোষ কি? জননকোষের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।

২। পরিপক্ব ডিম্বাণুতে কয়টি ক্রোমোজোম থাকে? ক্রোমোজোমের বিশৃংখলার কারণে শরীরে কি কি ধরনের খুঁত দেখা দেয় তার বর্ণনা দিন।

৩। গর্ভধারণ পর্যায় এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? লিঙ্গ ও সন্তানের সংখ্যা কি গর্ভসঞ্চারের সময়ে নির্ধারিত হয়? আলোচনা করুন।

পাঠ- ২.২ ঃ মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- গর্ভে সন্তান কতদিন থাকে তা জানতে পারবেন
- ভ্রূণকোষ কীভাবে জরায়ুতে গ্রোথিত হয় তার বর্ণনা দিতে পারবেন
- ভ্রূণের সূচনা পর্যায়ে ভিতরের স্তর থেকে কোন্ কোন্ অঙ্গ তৈরি হয় বর্ণনা করতে পারবেন
- ভ্রূণের বৃদ্ধি কত প্রক্রিয়ায় হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মাতৃগর্ভে ভ্রূণের নড়াচড়ার আবশ্যকতা সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারবেন
- মাতৃগর্ভে ভ্রূণ কীভাবে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায় তা বর্ণনা করতে পারবেন

২৮ দিন পর পর মেয়েদের মাসিক স্রাব হয়, এই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে জরায়ুর দুপাশে অবস্থিত দুটো ডিম্বাধারের যে কোন একটি থেকে একটি ডিম্বাণু বের হয়ে ফেলোপিয়ান নলের মধ্যে প্রবেশ করে শুক্রাণুর জন্যে অপেক্ষা করে। ডিম্বাণু নলে প্রবেশের ১২ থেকে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে উর্বরতা সাধন করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুক্রাণু নলে প্রবেশ করলে তা ডিম্বাণুর কোষপ্রাচীর ভেদ করে প্রাণ সৃষ্টি করে।

শিশু মায়ের গর্ভে ২৭০ থেকে ২৮০ দিন অর্থাৎ নয় মাস অবস্থান করে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন মুহূর্ত থেকে ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয় প্রাকজন্ম পর্যায় (Prenatal Stage)। মানবজীবনের দ্রুত বর্ধনের সময় হল এই সংক্ষিপ্ত পর্যায়। প্রত্যেকটি পর্যায়ের নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে এবং সে সময় বিশেষ পরিবর্তন সংগঠিত হয়। পর্যায়গুলো হল ঃ

(ক) ভ্রূণকোষে বা জীবণু কোষে বিকাশের পর্যায় (Period of the zygotes)
(খ) ভ্রূণের সূচনা পর্যায় (Period of the embryos)
(গ) পরিপূর্ণ ভ্রূণ পর্যায় (Period of the foctus)

(ক) ভ্রূণকোষ বা জীবনকোষ বিকাশের পর্যায় ঃ গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত। ফেলোপিয়ান নালীতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে সৃষ্ট এককোষ বিশিষ্ট জীবনকোষটির আকৃতি সূঁচের আগার মত। জীবনকোষটি পাতলা ঝিল্লি পদার্থ দিয়ে আবৃত থাকে। ফেলোপিয়ান টিউব অতিক্রম করে জরায়ুতে নেমে আসার সময় কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যাম জীবনকোষটির অভ্যন্তরে পরিবর্তন সংগঠিত হয়। ক্রমে একটি ভিতরের স্তর ও একটি বাইরের স্তর সৃষ্টি হয়। ভিতরের স্তরটিই মানবশিশু কোষ। বাইরের স্তর ভ্রূণকে সুরক্ষা ও ভ্রূণের জীবন রক্ষায় নিয়োজিত থাকে। বাইরের স্তর থেকে গর্ভফুল, গর্ভরজ্জু ও তরল এমনিউটিক (Amniotic) পিচ্ছিল তরল পদার্থ পূর্ণ একটি থলির উদ্ভব হয়। মানব ভ্রূণটি পানির থলির মধ্যে ভাসতে থাকে। এসময় কোষটি অনবরত বিভক্ত হতে থাকে এবং গোলাকার ডিম্বের আকার ধারণ করে। গর্ভধারণের ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত ভ্রূণ কোষটি ৩২টি কোষে বিভক্ত হয়। একদিন পর ৭০টি কোষ। এভাবে এক কোষ থেকে ৮০ কোটি বা বেশি কোষে পরিণত হয়। ৩-৪ দিনের মধ্যে এটি জরায়ুতে পৌঁছে। এ সময় সেখানে পানি ভর্তি গোলাকার চাকতির নমুনা পরিলক্ষিত হয়। চাকতিটি ৬ দিনের মত জরায়ুতে ভাসতে থাকে। ১০ দিনের মধ্যে জীবন কোষ জরায়ুর গায়ে লেগে যায়।

এ সময়ে প্রধান দুটো বৈশিষ্ট্য হল (১) দ্রুত কোষ বিভাজন এবং (২) জরায়ুর গায়ে প্রেক্ষিত হওয়া। কোন কারণে জরায়ুর গায়ে প্রেক্ষিত হতে না পারলে গর্ভপাত হয়ে যায়।

(খ) ভ্রূণের সূচনা পর্যায় ঃ দুই সপ্তাহ থেকে আট সপ্তাহ পর্যন্ত। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ থেকে বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মায়ের দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। ভিতরের স্তরটি তিনটি ভিন্নস্তরে বিভক্ত হয়। স্তর তিনটি হল-

১. **বহিস্তর-** এর কাজ হচ্ছে, মানবদেহের চামড়ার আস্তরণ গঠন করা। বহিস্তরের সাহায্যে স্নায়ুমন্ডলী, ইন্দ্রিয়ানুভূতির কোষসমূহ, চামড়া, চুল, নখ, দাঁতের অংশ ইত্যাদি তৈরি হয়।

২. **মধ্যস্তর-** এর কাজ হল, চামড়ার আস্তর গঠন, মাংসপেশী, শরীর কাঠামো, রক্তপ্রবাহ এবং মলমূত্র নিষ্কাষণমূলক কাজের অঙ্গগঠন করা।

৩. **অন্ত:স্তর-** এর কাজ হল, আন্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা। শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের নালী ট্রাকিয়া, ব্রংকিয়া, যকৃত, ফুসফুস, অগ্নাশয়, লালাগ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি এবং থাইমাস গ্রন্থি গঠন।

পানির থলি ভ্রূণকে সব রকম আঘাতপ্রাপ্তি থেকে রক্ষা করে। নাভীরজ্জুর সাহায্যে ভ্রূণ খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। গর্ভফুল (placenta) এর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে। গর্ভফুল মা ও সন্তানের রক্তধারার মধ্যে দ্বিমুখী ছাকনি হিসেবে কাজ করে।

ভ্রূণের হৃদপিন্ডের কাজ ও রক্ত সঞ্চালন শুরু হয় তৃতীয় সপ্তাহ থেকে। ১ মাস পর ভ্রূণের দৈর্ঘ্য হয় $\frac{১}{৫}''$, পরিপাক যন্ত্র চালু হয় সপ্তম সপ্তাহে। অষ্টম সপ্তাহে ভ্রূণ ১ ইঞ্চি লম্বা হয়। এ সময় তার চোখ, কান, আকার এবং লিঙ্গ চেনা যায়। আট সপ্তাহে পরিপাক যন্ত্র, যকৃত, পাচকগ্রন্থি, ফুসফুস ও মূত্রথলিও কিছু কিছু কাজ শুরু করে। যকৃত তার রক্তকনিকা তৈরি করা শুরু করে। স্নায়ুতন্ত্র বর্ধিত হতে থাকে।

(গ) পরিপূর্ণ ভ্রূণ পর্যায় ঃ আট সপ্তাহের শেষ থেকে চল্লিশ সপ্তাহ পর্যন্ত। এ পর্যায়ে বিভাজন ক্রিয়া প্রথমে দ্রুত এবং পরে আস্তে আস্তে সম্পন্ন হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ধনের কারণে শরীর কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়। দশম সপ্তাহের মধ্যেই ভ্রূণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রায় ৯৫ ভাগ আকার প্রাপ্ত হয়। শরীরের তুলনায় মাথা বড় এবং চোখ থাকে দূরে। ওজন হয় প্রায় ৩২ গ্রাম এবং লম্বায় হয় ৫ সেন্টিমিটার। দেহ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার ক্রমে বড় হতে থাকে। এসময় শিশুর বৃদ্ধি দুভাবে হয় ঃ

১. **মাথা হতে পা প্রক্রিয়া-** প্রথমে মাথা, মুখ, চোখ, কান, নাক এবং পরে কোমর পর্যন্ত দেহ এবং সর্বশেষে পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

২. **নিকট হতে দূর প্রক্রিয়া-** প্রথমে মেরুদন্ড এবং মেরুদন্ডের নিকটবর্তী অঙ্গসমূহ এবং সব শেষে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

প্রথম থেকে ভ্রূণ নড়াচড়া করলেও ১৭ সপ্তাহের আগে মা টের পান না। বৃদ্ধির জন্য নড়াচড়া আবশ্যক। জরায়ুর তরল পদার্থ এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। ভ্রূণ প্রথমে মাথা এবং পরে দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করে। ৮ মাসের সময় ভ্রূণ বিক্ষিপ্তভাবে হাত পা নড়াচড়া করে। ৬ মাসে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য হয় ১৪ ইঞ্চির মত এবং ওজন হয় প্রায় ১.৫ পউন্ড। ৮ ও ৯ মাসের সময় শিশুর বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। প্রতি সপ্তাহে বৃদ্ধি প্রায় ০.৫ পাউন্ড হয়।

৯ মাসের শেষের দিকে এমনিউটিক থলিতে ভ্রূণের স্থান সংকুলান হয় না বলে বের হয়ে আসার প্রস্তুতি নেয়। মাথা নিচের দিকে নিয়ে মায়ের পেলভিক অংশে অবস্থান করায় মাথার উপর চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে নড়াচড়া কমে আসে। এ সময় ঘূর্ণায়মান অবস্থায় হাত-পা ছোড়ে। জোর করে নড়াচড়া করে অথবা দ্রুত নড়াচড়া করে।

৭ মাসে জন্ম নিলে অনেক সময় শিশু বেঁচে যায় কারণ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা শিশুর থাকে। জন্মের সময় শিশু লম্বায় হয় ১৮-২০ ইঞ্চি এবং ওজন হয় প্রায় ৫.৫ পাউন্ড থেকে ৭.৫ পাউন্ড। শিশুর সমস্ত অঙ্গ কার্যক্ষম হয়ে ওঠে যেমন- হাত, পা, নাক, মুখ, শ্বাসনালী, পরিপাকযন্ত্র। শরীরের অন্য অঙ্গের তুলনায় মাথা বড় থাকেন প্রায় সম্পূর্ণ উচ্চতার এক চতুর্থাংশ।

এক নজরে মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধির নমুনা

১ম মাস

মানব জীবনের সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি এই প্রথম মাসে হয়। এক কোষ বিশিষ্ট ভ্রূণ কোষটি ১০,০০০ গুণ বেশি আকারে বাড়ে। উচ্চতা হয় $\frac{১}{৪}''$ থেকে $\frac{১}{২}''$ হয়।

ক্ষুদ্র শিরা এবং উপশিরার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হয়। ১ মিনিটে হৃদস্পন্দন হয় ৬০ বার। মস্তিষ্ক, কলিজা এবং পরিপাকতন্ত্রের কাজ শুরু হয়ে যায়। মায়ের সাথে যুক্ত নাভীরজ্জু কাজ করতে শুরু করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে কোনা মাথা দেখা যায় যা পরবর্তীতে চোখ, কান, মুখ এবং নাক হবে। লিঙ্গ এখন পর্যন্ত সনাক্ত করা যায় না।

২য় মাস

এখন ভ্রূণ দেখতে আনুপাতিক ছোট আকারের শিশু মনে হয়। এটি লম্বায় ১ ইঞ্চির কম, ওজন মাত্র $\frac{১}{১৩}''$ আউন্স। মাথা হল সম্পূর্ণ শরীরের অর্ধেক। মুখাবয়ব, জিহ্বা এবং দাঁতের মাড়িসহ সম্পূর্ণ বিকশিত। বাহুতে হাত, নখ এবং বৃদ্ধাঙ্গুল অন্যদিকে পায়ে-হাঁটু, গোড়ালি এবং পায়ের পাতা দেখা যায়। শরীরের চামড়া থাকে পাতলা, হাত এবং পায়ের ছাপ পাওয়া যায়।

৩য় মাস

ভ্রূণের ওজন ১ আউন্স এবং লম্বায় প্রায় ৩ ইঞ্চি। নখ, বন্ধ চোখের পাতা, কণ্ঠনালী, ঠোঁট এবং উন্নত নাক দেখা যায়। মাথা এখনও বড় প্রায় লম্বার $\frac{১}{৩}$ ভাগ এবং কপাল উচু। লিঙ্গ সহজেই সনাক্ত করা যায়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করা শুরু করেছে ফলে ভ্রূণ শ্বাস ফেলতে পারে এবং এমনিউটিক তরল পদার্থ গিলতে পারে এবং সময় সময় পেশাব করে। বুকের পাঁজরে এবং হাঁড়ে মজ্জা তৈরি হয় এবং অভ্যন্তরীণ জননঅঙ্গে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু থাকে। ভ্রূণ এখন বিভিন্ন রকমের এবং বিশেষ ধরনের সাড়া দেয়। পা, পায়ের পাতা, বৃদ্ধাঙ্গুল এবং মাথা নাড়তে পারে। মুখ খুলতে ও বন্ধ করতে পারে এবং তরল পদার্থ গিলতে পারে। চোখের পাতায় ছুলে বুঝতে পারে। হাতের তালু মুঠ করতে পারে এবং পায়ের তলায় হাত ছোয়ালে পা গুটিয়ে নেয়। এই ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মের সময় থাকে কিন্তু জন্মের ১ মাসের মধ্যে চলে যায়।

৪র্থ মাস

মাথা এখন লম্বায় সম্পূর্ণ শরীরের $\frac{১}{৪}$ ভাগ। জন্মের সময় এই অনুপাতেই থাকে। ভ্রূণের পরিমাপ হল উচ্চতায় ৮-১০ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় ৬ আউন্স। গর্ভরজ্জু প্রায় ভ্রূণের সমান। ভ্রূণের বিকাশ এখন সম্পূর্ণ।

মা এখন ভ্রূণের লাথি মারা, মোচড়ানো অনুভব করতে পারেন যা অনেক সমাজে এবং ধর্মে মানব জীবনের শুরু বলে বিবেচনা করে। পেশীর বিকাশ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিবর্তী এখন আরও দ্রুত হয়।

৫ম মাস

এখন ওজন প্রায় ১২ আউন্স থেকে ১ পাউন্ড এবং লম্বায় ১ ফুট বা ১২ ইঞ্চি। ভ্রূণ স্বাতন্ত্রতার লক্ষণ দেখাতে শুরু করে। এতে ঘুম এবং জেগে থাকার নমুনা থাকে। জরায়ুতে পছন্দনীয় অবস্থানে থাকে এবং অনেক সক্রিয় হয়; যেমন- লাথি মারে, হাত পা সম্প্রসারিত করে, মোচড়ায় এবং হাই তোলে। মায়ের পেটে কান রাখলে ভ্রূণের হৃদস্পন্দন শোনা সম্ভব। শ্বাস ও চর্ম গ্রন্থির কাজ শুরু হয়। মায়ের গর্ভের বাইরে টিকে থাকার মত শ্বাসতন্ত্রের কাজ তত পর্যাপ্ত নয়। এ সময় শিশু জন্ম নিলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম। চোখের ভ্রু এবং পাঁপড়িতে মোটা চুল গজায়, মাথায় হয় পাতলা চুল এবং পশম দিয়ে শরীর আবৃত থাকে যা জন্মের সময় অথবা পরবর্তীতে মিলিয়ে যায়।

৬ষ্ঠ মাস

ভ্রূণের বর্ধন সামান্য ধীরে হতে থাকে। ভ্রূণ এখন লম্বায় প্রায় ১৪ ইঞ্চি এবং ওজন হয় ১.৫ পাউন্ড। চামড়ার নিচে চর্বি হতে থাকে এবং চোখের বর্ধন সম্পূর্ণ হয়। চোখ খুলতে, বন্ধ করতে এবং সব দিকে তাকাতে পারে। সঠিকভাবে শ্বাস ফেলতে পারে, কান্না খুব ক্ষীণ হয়, মুঠি শক্ত করে।

এ সময় জন্ম নিলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ, কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত যন্ত্র তখনও অপরিপক্ব। তবে মায়ের গর্ভের বাইরে এ বয়সের ভ্রূণ বেঁচে থাকার ঘটনা আছে।

৭ম মাস

১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ওজন হয় ৩-৫ পাউন্ড। প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বর্ধন সম্পূর্ণ হয়। ভ্রূণ কাঁদে, শ্বাস ফেলে, গিলে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি চোষে। এ সময় গায়ের লোম মিলিয়ে যায় অথবা জন্মের সময় পর্যন্ত থাকতে পারে। মাথার চুল বাড়া অব্যাহত থাকে। ৫ পাউন্ড ওজন অর্জন করা পর্যন্ত ইনকিউবিটরে এরা বেচেঁ থাকতে পারে।

৮ম মাস

উচ্চতায় ১৮-২০ ইঞ্চি এবং ওজন হয় ৫-৭ পাউন্ড। নড়াচড়া কমে যায় কারণ জরায়ুতে জায়গার অভাব হয়। এই মাসে এবং পরের মাসে ভ্রূণের শরীরের চারপাশে পর্দায় চর্বি বাড়তে থাকে। এতে গর্ভের বাইরে বিভিন্ন আবহাওয়ায় খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে।

৯ম মাস

জন্মের এক সপ্তাহ আগে শিশুর বেড়ে ওঠা থেমে যায়। ওজন প্রায় ৭ পাউন্ড এবং লম্বায় হয় ২০ ইঞ্চি, ছেলে শিশু মেয়ে শিশুর তুলনায় ভারী হয়। চর্বির প্যাড গঠন হওয়া অব্যাহত থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরও দক্ষভাবে কাজ করে। হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং অনেক বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে আসে। চামড়ার লাল রং আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসে। শেষ দু'সপ্তাহে গর্ভফুলের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য নিচের দিকে নামতে থাকে। সাধারণত ৯ মাস ১০ দিন পর প্রসব বেদনা অনুভূত হয় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

সারাংশ

গর্ভধারনের মুহূর্ত হতে একটি জীবন শুরু হয়। সাধারণত স্ত্রী জননকোষ (পরিপক্ব ডিম্ব) ও পুরুষ জননকোষ (শুক্রাণু) এর মিলনের ফলে মায়ের ফেলোপিয়ান নালীতে একটি ভ্রূণ কোষ সৃষ্টি হয়। এই ভ্রূণ কোষ অনবরত বিভাজিত হয়ে ১০ দিনের মধ্যে জরায়ুতে গ্রোথিত হয়। কোষগুলো সুবিন্যস্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রূপ নেয় এবং মানবদেহের আকৃতির সূচনা হয়। এই সূচনা থেকে একটি ভ্রূণ ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায়; যেমন- জীবকোষের সূচনার পর শরীর কাঠামো তৈরি হয়, ঘাড় নড়াচড়া ও হাত নড়াচড়া করতে পারে। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে রক্ত চলাচল, হাত মুঠি ও খুলতে পারে। দেহ সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সবকিছু পরিপক্ব হয়। এভাবে মাতৃগর্ভে জীবনকোষ থেকে পরিপূর্ণ শিশু হিসেবে জন্ম নিতে মোট ২৭০ থেকে ২৮০ দিন লাগে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১। শিশু মায়ের গর্ভে কতদিন থাকে?
ক. ২৬০-২৬৫ দিন খ. ২৮৫-২৯০ দিন
গ. ২৬৫-২৬৮ দিন ঘ. ২৭০-২৮০ দিন

২। প্রাকজন্ম পর্যায় বলতে কি বোঝায়?
ক. অতি শৈশবকাল খ. শৈশবকাল
গ. বাল্যকাল ঘ. গর্ভকাল

৩। গর্ভধারণের ৭২ ঘন্টা পর ভ্রূণ কোষ কয়টি কোষে বিভক্ত হয়?
ক. ৪০ টি খ. ৩২ টি
গ. ৩৮ টি ঘ. ৭০ টি

৪। ভ্রূণ কোষের ভিতরের স্তরটি কত ভাগে বিভক্ত?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৫। হৃদপিন্ডের কাজ ও রক্ত সঞ্চালন শুরু হয় কোন সপ্তাহ থেকে?
ক. প্রথম সপ্তাহ খ. দ্বিতীয় সপ্তাহ
গ. তৃতীয় সপ্তাহ ঘ. চতুর্থ সপ্তাহ

৬। ভ্রূণ নড়াচড়া টের পাওয়া যায় কত মাস থেকে?
ক. ৩ মাস খ. ৪ মাস
গ. ৫ মাস ঘ. ৬ মাস

৭। কিসের সাহায্যে ভ্রূণ খাদ্য গ্রহণ করে?

ক. গর্ভফুল খ. নাড়ীরজ্জু
গ. জরায়ু ঘ. ফেলোপিয়াননালী

৮। সাত মাসে ভ্রূণের ওজন কত পাউন্ড হয়?
ক. ২-৩ পাউন্ড খ. ৩-৫ পাউন্ড
গ. ২.৫-৪ পাউন্ড ঘ. ৫-৬ পাউন্ড

৯। কোন মাসে শিশুর বেড়ে ওঠা থেমে যায়?
ক. ৫ মাসে খ. ৬ মাসে
গ. ৮ মাসে ঘ. ৯ মাসে

১০। কত মাসে ভ্রূণের আকৃতি মানুষের মত মনে হয়?
ক. ২ মাস খ. ৩ মাস
গ. ৪ মাস ঘ. ৫ মাস

১১। ওজনে ১ পাউন্ড হয় কোন মাসে?
ক. ৩ মাসে খ. ৪ মাসে
গ. ৫ মাসে ঘ. ৬ মাসে

১২। জন্মের সময় শিশুর উচ্চতা ও ওজন কত থাকে?
ক. ১২-১৪ ইঞ্চি ও ২.৫-৩.৫ পাউন্ড খ. ১৫-১৭ ইঞ্চি
গ. ১৮-২০ ইঞ্চি ও ৫.৫-৭.৫ পাউন্ড ঘ. ২১-২২ ইঞ্চি ও ৮-৯ পাউন্ড

১৩। মাতৃগর্ভে শিশু কয়টি ধাপে বৃদ্ধি পায়?
ক. ২ টি খ. ৩ টি
গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কীভাবে গর্ভসঞ্চার হয়? ভ্রূণ কোষ কীভাবে জরায়ুতে গ্রোথিত হয় আলোচনা করুন।
২। নাভীরজ্জু ও গর্ভফুলের কাজ কি? ভ্রূণ সূচনা পর্যায়ের তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা দিন।
৩। পরিপূর্ণ ভ্রূণ পর্যায়ের মেয়াদ কত দিন? এই পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ সম্পর্কে লিখুন।
৪। মাতৃগর্ভে শিশু বিকাশের নমুনার বর্ণনা দিন।

পাঠ- ২.৩ ঃ গর্ভবতী মায়ের যত্ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- গর্ভবতীর চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন
- মায়ের খাদ্য, পোশাক ও ব্যায়াম কেমন হওয়া উচিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন
- মায়ের মানসিক অবস্থার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- গর্ভবতী মায়ের যত্ন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। কোল জুড়ে অনাগত শিশুর আগমনে মা অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করেন। তাই সুস্থ ও সবল শিশু জন্ম দিতে হলে শিশুর জন্মের পূর্বেই মাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। একটি শিশুর জীবনে মায়ের প্রভাব বেশি, সেজন্য গর্ভকালীন পর্যায়ে মায়ের শারীরিক ও মানসিক যত্নের প্রয়োজন। শিশু মায়ের দেহের অংশ হিসেবে অবস্থান করে। এসময় শিশুর বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি হয়। মায়ের খাদ্য থেকে শিশু পুষ্টি পায়, মা যদি সুষম ও উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করেন তা হলে শিশুর শারীরিক গঠন সঠিক হবে।

মা নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে দূরে থাকবেন, সময়মত গোসল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন। হালকা ব্যায়াম করে শরীরকে সতেজ রাখবেন। সঠিক পোশাক পরিধান ও বিশ্রাম নেবেন।

এসময় মাকে চাল-চলনে, আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় সংযত মনোভাব পোষণ করতে হয়। কারণ মায়ের আচার আচরণ গর্ভস্থ শিশুর দেহে ও মনে প্রতিফলন ঘটায়। মায়ের অত্যধিক উত্তেজনা ও ক্রোধ গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল গর্ভবতী মায়ের অবশ্যই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের প্রতিটি বিকাশ পর্যায়ে বিপত্তি দেখা দিতে পারে। সেজন্য একজন গর্ভবতীর শারীরিক ও মানসিক যত্নের প্রয়োজন।

শারীরিক যত্ন

চিকিৎসা ব্যবস্থা

গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণ হল- প্রাতঃকালীন অসুস্থতা, মাসিক বন্ধ হওয়া, স্তনের পরিবর্তন, ঘন ঘন প্রসাব, বমি বমি ভাব, পেট, বুক, গলা ও হাত-পা জ্বালা করা, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরে রক্ত কমে যাওয়া ইত্যাদি।

এ সময়ে মাকে অবশ্যই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। আমাদের দেশে প্রতিটি থানায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের দেহের ওজন, রক্তচাপ, প্রস্রাব নিয়মিত পরীক্ষা করানো উচিত। অনেক সময় জটিল অবস্থার উদ্ভব হতে পারে, একমাত্র চিকিৎসকই তা নির্ণয় করতে পারেন। ডাক্তার বুঝতে পারেন মায়ের কি ধরনের উপদেশ প্রয়োজন, তিনি নিয়মিত এ সব পরীক্ষা করেন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন, লৌহ ও অন্যান্য ওষুধ গ্রহণ করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে নবজাতকের অকাল মৃত্যু বেশি ঘটে। গর্ভবতী হওয়ার আগে মায়ের যদি ধনুষ্টংকার প্রতিশেধক দেয়া থাকে তবে গর্ভবতী হওয়ার পর বুষ্টার ডোজ নিলেই চলবে নতুবা সম্পূর্ণ কোর্সটি গ্রহণ করতে হবে। এটি মা ও শিশুর নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন।

গর্ভধারণের প্রথম তিন মাস অন্যান্য ওষুধ যতদূর সম্ভব ব্যবহার না করার জন্য অবশ্যই চিকিৎসক পরামর্শ দেবেন। ছোঁয়াচে রোগ থেকেও মাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

মা যদি কোন কলকারখানায়, রূপচর্চা কেন্দ্রে, হাসপাতালে বা গবেষণাগারে চাকরি করেন যেখানে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে হয় তাহলে তা পরিহার করতে হবে। বমি বন্ধ করার ওষুধ সেবনে শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।

প্রস্রবের সময় কোন জটিলতা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকলে, গর্ভাশয়ে শিশুর অবস্থান উল্টোভাবে থাকলে, জমজ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা, গর্ভপাতের সম্ভাবনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিকিৎসক আগে থেকেই ব্যবস্থা দিতে পারেন।

গর্ভবতী মায়ের খাদ্য

মানব জীবনের দ্রুত বৃদ্ধি হয় গর্ভকালীন পর্যায়ে। একটি ক্ষুদ্র জীবনকোষ থেকে নয় মাসে ৭-৮ পাউন্ড ওজনের শিশুতে পরিণত হয়। মায়ের খাদ্য থেকেই ভ্রূণ পুষ্টি পায়। এই খাদ্যের চাহিদার পূরণে মায়ের অতিরিক্ত ৩০০ ক্যালরি প্রয়োজন।

গর্ভকালীন উপসর্গের কারণে মা প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন না। বমি বমি ভাব হয়, মুখে রুচি থাকে না, টকের প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। পরিমাণমত টকে কোন অসুবিধা হয় না। গর্ভাবস্থার শেষ তিনমাসে গর্ভস্থ শিশুর ওজন দ্রুত হয় বলে খাদ্যের চাহিদা বেশি হয়। একমাত্র উপযোগী সুষম খাদ্যই শরীরের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

অরুচির কারণে মা খুঁতখুঁতে হয় এবং খেতে চায় না। পুষ্টিহীন মায়ের সন্তানের ওজন কম হয়, বুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এবং পরবর্তী কালে স্বাস্থ্যহীন জীবন যাপন করে। অনেক সময় রুগ্ন, অপরিণত, বিকলাঙ্গ এমনকি বিকৃত সন্তান জন্ম নিতে পারে। গর্ভবতী মায়ের সমগ্র গর্ভাবস্থায় ২০ পাউন্ডের বেশি ওজন বাড়ানো উচিত নয়।

মায়ের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের মধ্যে থাকবে প্রোটিন, ভিটামিন এ,ডি,সি, আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ফলিক এসিড। লৌহযুক্ত খাবার কম হলে রক্তশূন্যতা দেখা দিবে। শিশুর দাঁত ও হাঁড় গঠনের জন্য ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। মোটামুটি স্বাস্থ্যবতী মায়ের জন্য প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে এক পোয়া দুধ, আধাকাপ ঘন ডাল, কিছু টাট্‌কা শাক-সবজি, মৌসুমি ফল, কাঁচা সব্জির সালাদ, ডিম, কিছু মাছ, মাংস প্রয়োজন।

কোষ্ঠকাঠিন্য

গর্ভবতী মাকে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে অব্যাহতি পেতে হলে প্রচুর আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। হাঁটাচলা ও সামান্য পরিশ্রম এবং ঘুম পরিমিত হতে হবে। অনেক সময় সঠিক সময় মলত্যাগ না করার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। লৌহজাতীয় ওষুধ সেবনেও কোষ্ঠকাঠিন্য হয় ফলে খাবারে অরুচি হয়। দীর্ঘদিনের কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে গর্ভপাত হতে পারে।

ব্যায়াম

শরীর সতেজ ও প্রস্রবের ঝুঁকি কমানোর জন্য হালকা ব্যায়াম প্রয়োজন। প্রথম তিনমাস ভারী জিনিস তোলা, বেশি পরিশ্রম করা, জোরে হাঁটা ও দৌঁড়ানো নিষেধ। ব্যায়ামের ফলে ভাল ঘুম হয়। রক্ত সঞ্চালন বাড়ে ও ক্ষুধা বাড়ে। সকাল বিকাল আধাঘন্টা ধরে হাঁটাচলাও ব্যায়ামের পর্যায়ে পরে। সংসারের সব কাজই মা করতে পারেন তবে ভারী কাজ যেমন কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা, ভারী জিনিস তোলা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।

মা ও সন্তানের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের উন্নতিকল্পে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ২৪ বার হাত উপরে তুলে গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করবেন। পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে সিলিং এর দিকে মুখ করে পিছন দিকে ঝুকবেন। পায়ের গোড়ালীতে ভর দিয়ে মেঝের দিকে মুখ করে ঘাড় ও মেরুদন্ড ঘুরাবেন। হাঁটু-ভাঁজ করে আসন করে বসে উপরের দিকে মুখ তুলে পিছনে ঝুকবেন। মাথা নিচু করে পিছনের দিকে ঘুরাবেন। ফলে মেরুদন্ড, কটিসন্ধি, বস্তিগহবর ও গোড়ালীদ্বয়ের নমনীয়তা বৃদ্ধি পাবে।

ঘুম ও বিশ্রাম

অনেক সময় মায়ের গর্ভকালীন কোন অসুবিধা দেখা দিলে চিকিৎসক সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলেন। অনেক সময় বিছানা থেকে উঠে টয়লেটে যেতেও নিষেধ করেন। গর্ভকালীন শেষ পর্যায়ে বিশ্রামের প্রয়োজন বেশি। সাধারণত একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের কম পক্ষে ৬ ঘন্টা ঘুমানো উচিত। এক্ষেত্রে গর্ভবতী মাকে কম পক্ষে ৮-৯ ঘন্টা ঘুমাতে হবে। শুধু রাতে নয় দিনের বেলায়ও গর্ভবতী মাকে সামান্য বিশ্রাম নিতে হবে। তবে শ্রমজীবী মায়েদের সন্তান আকারে ছোট হতে দেখা যায়। স্বাভাবিক কাজকর্মে মায়ের সন্তান প্রসবে কষ্ট কম হয়।

গোসল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

দেহের সুস্থতার জন্য খাদ্যের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার। মায়ের শরীর থেকে সন্তানের শরীরে রোগ জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। গোসলের পানি হবে ইষদুষ্ণ এতে মাংসপেশীর নমনীয়তা বাড়ে। মায়ের বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড়, ঘরদুয়ার, প্লেট, গ্লাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে মাকে দূরে থাকতে হবে। গর্ভবতী মায়ের বিছানা নরম না হওয়াই ভাল।

গর্ভাবস্থার শেষ দিকে উরু, তলপেট ও স্তনের চামড়া ফেটে যায়। প্রত্যেক দিন গোসলের সময় উরুতে, তলপেটে ও স্তনে তেল মালিশ করলে চামড়া ফাটা বন্ধ হতে পারে। স্তনের বোঁটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন এতে প্রসবের পর দুধ নির্গমন সহজ হয়।

পোশাক পরিচ্ছদ

উঁচু হিল জুতা গর্ভাবস্থায় পরা সম্পূর্ণ নিষেধ। এতে চলাফেরার অসুবিধা হয়, পা মচকে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং পায়ের নার্ভে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। পোশাক হবে ঢিলেঢালা। আমাদের দেশের চিরাচরিত পোশাক হল শাড়ি, এতে অভ্যস্থ মায়েরা স্বাচ্ছন্দ অনুভব করতে পারেন। তবে শাড়ি পরার চেয়ে লম্বা জামা পরা ভাল। কারণ কোমড়ে পেটিকোট বাধার মত বেল্ট বাধতে হয় না ফলে পেটে চাপ পরে না।

পোশাকের তন্তু হবে সূতি। গর্ভাবস্থায় অনেক মায়ের চুলকানি দেখা দেয়। সিনথেটিক পোশাকে চুলকানি বেড়ে যেতে পারে। ঢিলেঢালা ব্রা পরা উচিত কারণ অনেক সময় গর্ভাবস্থায় শেষ দিকে মায়ের বুকে দুধ আসতে দেখা যায়।

কুসংস্কার

গ্রামেগঞ্জে কিছু কুসংস্কার আছে যেমন, গর্ভকালে শোলমাছ খেলে শিশু মাছের মত মোচড়ায়। নারকেল খেলে গা খসখসে, খিরা খেলে পায়ের চামড়া খিরার খোসার মত হবে, মৃগেল মাছ খেলে মৃগী রোগ হবে। এসব কথা কেবলই কুসংস্কার, কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অনেক সময় গর্ভবতী মাকে ইটের টুকরা, মুড়কি, পোড়া মাটি খেতে দেখা যায়। আসলে শরীরে ধাতবলবণের ঘাটতির কারণে তারা এসব খেয়ে থাকে।

মানসিক যত্ন

সন্তান গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মা বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় তা মায়ের অন্ত:ক্ষরা গ্রন্থির কর্মকান্ড ব্যহত করে। এই বিরূপ মনোভাব শিশুতে সঞ্চারিত হয়। অন্যদিকে গর্ভে সন্তানের আবির্ভাবে মা খুশী হলে মায়ের দৈহিক কর্মকান্ডের ভারসাম্য সুন্দরভাবে বজায় থাকে ফলে গর্ভস্থ সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশধারা চলতে থাকে।

গর্ভের কারণে মা ভয় পেলে, মায়ের দেহে পুষ্টির অভাব হলে, গ্রন্থির কাজ বিঘ্নিত হলে, দেহে ভিটামিনের অভাব হলে, নিউমোনিয়া ও বহুমূত্র হলে ভ্রূণ জরায়ুর দেয়ালে গ্রোথিত হতে পারে না বলে গর্ভপাত হয়।

মায়ের মন সব সময় প্রফুল্ল রাখতে হবে। ভাল গল্পের বই, ভাল ছবি দেখা, গল্পগুজব করা, সুন্দর শিশুর ছবি ঘরে টানিয়ে রাখা, পরিবারের সদস্যদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা, প্রতিবেশির সাথে সুন্দর ও মার্জিত আচরণ করা এবং সকলের সাথে মিলে মিশে থাকলে মন ভাল থাকে। সন্তানের জন্য এটি মঙ্গলজনক।

মায়ের মানসিক অশান্তির ফলে সন্তানের শিখন ক্ষমতা, স্মরণশক্তি এবং চিন্তা করার শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এদের বুদ্ধিমান মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা যথার্থ বুদ্ধিমান নয়।

সারাংশ

সুস্থ ও সবল শিশু জন্ম দিতে হলে শিশুর জন্মের পূর্বেই মাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। সেজন্য গর্ভবতী মাকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। মা নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম ও বিশ্রাম, উপযোগী পোশাক পরা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মন প্রফুল্ল রাখতে হবে। কারণ সুস্থ মা সুস্থ শিশুর জন্ম দেন। মায়ের অত্যধিক উত্তেজনা বা মানসিক চাপ গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১। গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণ কি?

ক. মোটা হওয়া খ. মাসিক বন্ধ হওয়া

গ. ক্ষুধা বেশি লাগা ঘ. মন প্রফুল্ল থাকা

২। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকার প্রয়োজনীয়তা কি?

ক. জটিল অবস্থায় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য খ. অসুস্থ হলে ওষুধ দেয়ার জন্য

গ. মানসিক শক্তি যোগানোর জন্য ঘ. ছোঁয়াচে রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য

৩। প্রাথমিক অবস্থায় পুষ্টির অভাবে ভ্রূণের কি হয়?
ক. ওজন কম হয়
খ. স্নায়ুকোষের বুদ্ধি ব্যহত হয়
গ. দাঁত ও হাঁড়ের গঠন ঠিকমত হয় না
ঘ. খুঁতখুঁতে স্বভাবের হয়

৪। গর্ভবতী মায়ের অতিরিক্ত কত পাউন্ড ওজন হওয়া দরকার?
ক. ১০ পাউন্ড
খ. ২০ পাউন্ড
গ. ৩০ পাউন্ড
ঘ. ৪০ পাউন্ড

৫। মায়ের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার উপায় হল-
ক. তেলজাতীয় খাবার খাওয়া
খ. ব্যায়াম করা
গ. আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া
ঘ. বেশি পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা

৬। গর্ভবতী মায়ের ব্যামায়ের প্রয়োজন কেন?
ক. প্রসবে ঝুঁকি কম হয়
খ. শরীরের ওজন কমে
গ. মা ও সন্তানের মধ্যে রক্তসঞ্চালনের উন্নতি হয়
ঘ. স্বাস্থ্য ভাল থাকে

৭। কখন মায়ের বেশি বিশ্রামের প্রয়োজন হয়?
ক. গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
খ. শরীর অসুস্থ থাকলে
গ. বেশি ক্লান্ত মনে হলে
ঘ. কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে থাকলে

৮। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা কি?
ক. সংক্রামক রোগ থেকে ভ্রূণকে রক্ষা করার জন্য
খ. মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকার জন্য
গ. মন প্রফুল্ল থাকার জন্য
ঘ. সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য

৯। মায়ের পোশাক কেমন হওয়া উচিত?
ক. ডিজাইনবহুল
খ. ঢিলে ঢালা
গ. লম্বা
ঘ. উজ্জ্বল রংয়ের

১০। গর্ভবতী মায়ের মানসিক চাপের ফলে কি হয়?
ক. ভ্রূণ জরায়ুতে গ্রোথিত হতে পারে না
খ. গর্ভপাত হয়ে যায়
গ. অন্তক্ষরা গ্রন্থির কর্মকান্ড ব্যাহত হয়
ঘ. জরায়ুর সংকোচন বিঘ্নিত হয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণগুলো কি? মায়ের খাদ্য, পোশাক ও ব্যায়াম কেমন হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা করুন।
২। গর্ভবতী মায়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা কি? ভ্রূণের উপর মায়ের মানসিক প্রভাব বর্ণনা করুন।
৩। গর্ভবতী মায়ের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় কেন? আলোচনা করুন।

পাঠ- ২.৪ ঃ মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধিতে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- গর্ভবতী মায়ের শারীরিক অবস্থা ও পুষ্টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিশু গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় বিপত্তিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মায়ের মানসিক অবস্থা কীভাবে ভ্রূণের বিকাশে প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ভ্রূণের স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবেন
- ভ্রূণের বিকাশে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে নয় মাসব্যাপী সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে বিকাশ যত বিঘ্নিত হয় আর কোন সময় তত হয় না। এ সময় শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের বিপত্তি হয় এবং মানসিক বিপত্তি প্রায়ই শারীরিক বিপত্তিকে জটিল করে তোলে। গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে ২৭০ বা ২৮০ দিন মায়ের গর্ভে শিশুর বৃদ্ধি কেবল মায়ের উপর নির্ভর করে। শিশুর খাদ্য, শ্বাসক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, কোষ বৃদ্ধি ইত্যাদির উৎস হল মায়ের দেহ। মাতৃগর্ভে তার নিজের কিছু করণীয় থাকে না, মায়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে থাকে। মাকে ছাড়া তার কোন অস্তিত্ব থাকে না, তার জীবন মরন সব কিছুই মায়ের উপর নির্ভরশীল।

গর্ভাবস্থায় মা যে খাদ্য গ্রহণ করে, ওষুধ সেবন করে, অসুস্থতায় ভোগে এবং তেজস্ক্রিয়া থেকে শুরু করে রাসায়নিক দ্রব্য, হরমোন, রক্তের Rh, বয়স, এমনকি যে ধরনের আবেগ অনুভব করে, এসবই গর্ভস্থ শিশুর উপর প্রভাব ফেলে এবং অনেক সময় স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়ার পরিবেশকে বিঘ্নিত করে।

প্রতি বছর জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ কোন না কোন খুঁত নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। প্রত্যেক বছর শুধু বাংলাদেশেই পাঁচ লক্ষ মায়ের গর্ভপাত হয় অথবা মৃত সন্তান প্রসব করে। এ ধরনের খুঁতগুলোর মধ্যে কতগুলো বংশগত এবং অন্যান্যগুলো পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব অথবা বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আন্তক্রিয়ার ফলস্বরূপ।

গর্ভ পরিবেশের বিশৃংখলার কারণে ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হয়। এক সময় বিশ্বাস করা হতো যে, মায়ের শরীরের ক্ষতিকর পদার্থ থেকে শিশুকে গর্ভফুল রক্ষা করে কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে, মা যা গ্রহণ করেন তার কিছু অংশ হলেও জরায়ুতে শিশুর দেহে সঞ্চারিত হয়।

গর্ভকালীন পর্যায়ের প্রথম কয়েক মাস ভ্রূণের বর্ধন দ্রুত হয় এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ ও পেশীর বর্ধন হয়। সে জন্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শিশুর কাঠামো, গঠনপ্রণালী ও স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত হানে। শারীরিক বর্ধন ব্যহত হয় এবং অপূরণীয় বিকলাঙ্গতা সৃষ্টি করে।

শিশুর উপর দুই ধরনের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব পড়ে; যেমন- শরীরিক ও মানসিক।

মাতৃগর্ভে শিশুর উপর শারীরিক প্রভাব

১। মায়ের খাদ্য

ভ্রূণের পুষ্টি মায়ের পুষ্টির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে পুষ্টির সম্পর্ক আছে। মায়ের অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বিশেষভাবে মস্তিষ্কের বিকাশ বিঘ্নিত হয়, কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায় হয়। মস্তিষ্কের কোষ প্রথম তিনমাস দ্রুত বাড়ে। স্বাভাবিকের চেয়ে মস্তিষ্কের কোষ কম হলে বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা যায়।

অপর্যাপ্ত পুষ্টির কারণে গর্ভপাত, অপরিণত শিশু ও কম ওজনের শিশু অথবা মৃত শিশু প্রসব হয় অথবা প্রসবের পর পর মারা যায়। ভিটামিন বি, সি, ডি এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। উপযুক্ত আমিষের অভাবে শিশু হয় ক্ষীণকায়, অপরিণত ও রুগ্ন, এমন কি গর্ভপাত ঘটে। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এবং অনেক সময় অকাল মৃত্যু হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে একদল মাকে ক্যালরিযুক্ত পুষ্টিকর খাবার দেয়া হয়েছিল তাদের শিশুদের জন্মকালীন ওজন বেড়ে গিয়েছিল, মায়েরা স্বাস্থ্যবান শিশু জন্ম দিয়েছেন এবং তাদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল ছিল। পুষ্টির কারণে উঁচুমানের আমিষবহুল দুধ তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন এবং সন্তানদের বেশিদিন বুকের দুধ খাওয়াতে পেরেছেন। অন্যদলের অপুষ্টির কারণে গর্ভপাত হয়ে যায় এবং প্রথম বছরেই সন্তান মারা যায় এবং অনেকে মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগেছে।

বুদ্ধিমত্তার সাথে পুষ্টির সম্পর্কে দেখা গেছে- পরিপূরক খাদ্য গ্রহণ করা মায়েদের সন্তানদের ৩ ও ৪ বছর বয়সে বুদ্ধির (IQ) মান পুষ্টিহীন মায়ের শিশুদের চেয়ে বেশি ছিল।

২। মায়ের বয়স

মায়ের বয়সের কারণে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটতে পারে। ৪০ বছর পর মহিলাদের ঋতুবন্ধের সময় যত কাছাকাছি হয় ততই অন্ত:ক্ষরা গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যাবলী কমে যায়। ফলে ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশ মন্থর হয়। এসব শিশুদের মধ্যে Cretinism (ক্রেটিনিজম), Downs Syndrome (ডাউন্স সিনড্রোম), হৃদপিন্ডের ত্রুটিপূর্ণ আকৃতি, হাইড্রোসেকালাস ইত্যাদি বৈকল্য দেখা দেয়। সে জন্য মা হওয়ার উপযোগী বয়স হল ২০ বছর থেকে ৩৫ বছর।

৩। মায়ের অসুস্থতা

গর্ভবতী মা প্রথম তিনমাসের মধ্যে জার্মান হাম অর্থাৎ রুবেলায় আক্রান্ত হলে ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়। কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্য, হৃদরোগ মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, ক্ষীনদৃষ্টি সম্পন্ন, ক্ষীণ শ্রবণ শক্তি, বোবা ইত্যাদি হতে পারে। মায়ের শরীরের মৃদু আক্রমণেও শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।

মায়ের যক্ষ্মা রোগ, সিফিলিস, গনোরিয়া, মূত্রনালীর সংক্রমণ ইত্যাদি গর্ভফুলের মাধ্যমে ভ্রূণকে আক্রান্ত করে। এতে গর্ভপাত হয় এবং অনেক সময় সন্তান অন্ধ হয়ে যায়। জলবসন্ত, মামস, গুটিবসন্ত, জ্বর এর জীবাণু ভ্রূণের মধ্যে সংক্রামিত হয়। ভাইরাস জ্বরের সংক্রামণে ক্রোমোজম ভেঙ্গে ডাউন্স সিনড্রোম এবং অন্যান্য অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

এক ধরনের সংক্রমণ যেটাকে বলা হয় টক্সোপ্লাসমোসিস। এর লক্ষণ সর্দির মত। এরোগে মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন, অন্ধত্ব এমনকি শিশুর মৃত্যু হতে পারে। সাধারণত কাঁচা খাবার অথবা কম সময়ে রান্না করা মাংস অথবা রোগাক্রান্ত বিড়ালের সংস্পর্শে এলে ভ্রূণে সংক্রমিত হয়।

৪। মায়ের ওষুধ সেবন

গর্বাবস্থার প্রথম দিকে বমি বন্ধ করার জন্য থ্যালিডোমাইড জাতীয় ওষুধ সেবনে ভ্রূণের মারাত্মক শারীরিক ত্রুটি সংঘটিত হয়; যেমন- অর্ধসমাপ্ত বাহু ও পা, চোখ ও কানবিহীন, অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ, বধিরতা, অন্ধত্ব, হৃদপিন্ডের ত্রুটিপূর্ণ আকৃতি, হাঁড়ের জোড়ায় ত্রুটি, মানসিক প্রতিবন্ধকতা এবং অন্যান্য অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। সদ্যজাত শিশুকে দৈত্য বা দানব বলে অভিহিত করা হয়।

মা যা গ্রহণ করেন তার কিছু অংশ হলেও গর্ভফুল অতিক্রম করে ভ্রূণে চলে যায়; যেমন- অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পানি এবং ইউরিয়া।

ওষুধ বিভিন্নভাবে ভ্রূণকে আক্রান্ত করতে পারে; যেমন-

(১) ওষুধ অপরিবর্তিত অবস্থায় গর্ভফুল অতিক্রম করে এবং যেভাবে মায়ের উপর কাজ করে তেমনি ভ্রূণের উপরও করে।

(২) যৌন হরমোন গর্ভফুলের মাধ্যমে খেয়ে ভ্রূণকে পুরুষালী করে অথবা মায়ের শরীর বৃত্তিয় পরিবর্তন সাধন করে এবং গর্ভের পরিবেশ পরিবর্তন করে।

(৩) মাকে যদি Spinal anesthetic (শিরদাড়া অবশ) দেয়া হয় তা হলে মায়ের রক্তচাপ এত কমে যায় যে শিশুর শরীরে Oxygen (অক্সিজেন) বিতরণ মারাত্মকভাবে কমে যায়।

তবে ক্ষতিকারক ওষুধ হল- ষ্ট্রেপটোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, এনড্রোজেন, সিনথেটিক ইসট্রোজেন, এ্যাসপিরিন, কেনো বারবিটাল, ট্রেনকুইলাইজার এবং বমি উপশমের ওষুধ। এতে ভ্রূণের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। টেট্রাসাইক্লিনের কারণে ভ্রূণের হাড়ের বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে গ্রহণ করলে জন্মপরবর্তী শিশুর দাঁতে দাগ দেখা যায়। খিঁচুনির ওষুধ সেবনে সন্তানের হৃদযন্ত্রজনিত ত্রুটি হয়। যে সব ঔষধ ক্ষতি করে না সেগুলো হল- পেনিসিলিন ও এমপিসিলিন।

৫। হরমোন গ্রহণ

গর্ভে সন্তান আসার ব্যাপার অজানা থাকলে মা যদি জন্ম নিয়ন্ত্রক বড়ি সেবন করেন তাহলে বাড়ন্ত ভ্রূণের ক্ষতি হয়। এর ফলে গর্ভপাত, ক্রোমোজোমের বিশৃংখলা, হৃদরোগ হতে পারে। বয়:সন্ধিক্ষণ বয়সের সন্তানের cervical canecr (সারভিক্যাল ক্যানসার) এবং ছেলে সন্তানের উর্বরতা কমে যায়। গর্ভপাত না হওয়ার জন্য যদি হরমোন নেয়া হয় তাতে

ভ্রূণের লিঙ্গান্তর হতে পারে। প্রজেসটারোন নিলে সন্তান মেয়ে সুলভ হয়। স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ বেশি হয়। এনড্রোজেন নিলে মেয়ে সন্তান দ্রুত ছেলে সুলভ হয়।

৬। রক্তের উপাদান

ভ্রূণের রক্ত যদি Rh positive হয় তার অর্থ হল শতকরা ৮৫ ভাগ আমিষ আছে। (অন্যদিকে Rh Negative হলে শতকরা ১৫ ভাগ আমিষ থাকে) এক্ষেত্রে মায়ের রক্ত যদি Negative হয় তাহলে মায়ের শরীরের antibody (এ্যানটিবডি) ভ্রূণকে আক্রান্ত করতে পারে, এতে ভ্রূণের রক্তকোষ ধ্বংস হয়ে রক্তে নি:শেষ ধরনের কোষ দেখা যায় এবং এক ধরনের রোগ হয় তা হল Erythro blastosis (এরিথ্রোব্লাসটোসিস)। এ্যানিমিয়া দেখা দেয়, প্লীহা বড় হয়ে যায়। অনেক সময় স্বতস্ফূর্ত গর্ভপাত, মৃত সন্তান, জন্ডিস, হৃদপিন্ডের ক্রুটি ও মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।

প্রথম সন্তানের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৮০ ভাগ, দ্বিতীয় সন্তানের বেলায় ৫ জনে ১ জন বাঁচে।

৭। ধুমপান

ধুমপানে আসক্ত মায়ের স্নায়ুবিক দুর্বলতা, অনিদ্রা ও অনিয়মিত হৃদস্পন্দন হয়। হৃদপিন্ড ও রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ শারীরিক কর্মকান্ড বিঘ্নিত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যে মারা যায় এবং দৈহিক গড় ওজন কম হওয়ার কারণে অতিরিক্ত চঞ্চল এবং তাদের মধ্যে অস্থিরতার লক্ষণ দেখা যায়।

ধুমপানের ৮-১০ মিনিটের মধ্যে ভ্রূণের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। ধুমপান ভ্রূণের মধ্যে অক্সিজেন ও পুষ্টি বিতরণ কমিয়ে দেয় এতে জরায়ু এবং গর্ভফুলের রক্তসঞ্চালনে সংকোচন হয়। সন্তান ৭ বছর বয়সে সেই বয়সের উপযোগী সাধারণ উচ্চতা ও বিকাশের গড় মান থেকে নিচে অবস্থান করে। সমীক্ষায় ৪-৬ বছরের শিশুরা যাদের জন্মকালীন ওজন কম ছিল তাদের বুদ্ধিমত্তা অধুমপায়ী মায়ের সন্তানদের চেয়ে কম ছিল।

৮। গ্রন্থির বিশৃংখলা

গ্রন্থির কর্মকান্ডের ভারসাম্যহীনতার কারণে নির্দিষ্ট সময় জরায়ু জাইগোটকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়। থাইরয়েড গ্রন্থি কম সক্রিয় হলে থাইরোক্সিন হরমোনের অভাবে Cretinism (ক্রিটিনিজম) নামক রোগে ভ্রূণ আক্রান্ত হলে সন্তান খর্বাকায় ও নির্বোধ হয়। তাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি তীব্রভাবে ব্যহত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে সব এলাকার মাটিতে আয়োডিন কম সে এলাকার গর্ভবতী মায়েদের আয়োডিনযুক্ত খাবার দেয়া হয়েছিল, এতে ম্যাজিকের মত কাজ হয়েছিল।

প্যানক্রিয়াস গ্রন্থির কাজ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে ডায়েবেটিক হলে সন্তানেরও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিশু ওজন বেশি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। অনেক সময় গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব ও জন্মের পরপর মারা যেতে দেখা যায়।

৯। মদপান

এ্যালকোহল গর্ভফুল অতিক্রম করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভ্রূণের শরীরে ঘন অবস্থায় থাকে। এটাকে বলে Fetal alcohalic syndrome। এতে বর্ধনে ঘাটতি হয়, শিশু আকারে ছোট হয় এবং পরবর্তীতে সঠিকভাবে বাড়ে না। বুদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয় এবং সঞ্চালন বিকাশ মন্থর হয়। শিশুর মাথা ছোট, হৃদপিন্ডের ক্রুটি, অস্বাভাবিকতা, হাড়ের জোড়ায় ক্রুটি দেখা যায়। নবজাতকের মধ্যে কাঁপুনি, অসহিষ্ণুতা, হজমের গন্ডগোল দেখা দেয়। ইথাইল এ্যালকোহল ভ্রূণকে বিষাক্ত করে তোলে।

১০। নেশাগ্রস্ত ওষুধ সেবন

যে গাঁজা, হেরোইন, মারিজুয়ানা, মরফিন, কোডিন গ্রহণ করে তাদের অপরিণত শিশু প্রসব করার সম্ভাবনা থাকে। গর্ভে থাকা অবস্থায় সন্তান নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। ফলে জন্মের পর তাদের মধ্যে অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, অনিদ্রা, সর্দি, খিঁচুনি, জ্বর ও বমি করতে দেখা যায়। অনেক সময় মৃত্যুও হয়। দুই বছর পর্যন্ত এসব শিশু অস্বাভাবিক আচরণ করে। এরা কম সতর্ক থাকে, উদ্দীপনায় সাড়া কম দেয় এবং প্রায়ই কাঁদে।

১১। বিকিরণের প্রভাব

গর্ভবতী মায়ের অসুস্থতার কারণে যদি মাত্রাতিরিক্ত X-Ray প্রয়োজন পড়ে তাহলে এটি ভ্রূণের জন্য ক্ষতিকারক এবং অনেকসময় গর্ভপাত ঘটে। সাধারন X-Ray ভ্রূণের ক্ষতি করে না।

বিকিরণের কারণে জিন-এর সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়ে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। ক্রোমোজোম ভেঙ্গে যায়। এতে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। ২ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে বিকিরণের কারণে মাইক্রোসেফালি মানসিক প্রতিবন্ধীতা, সঞ্চালনে অসমতা, ডাউন্স সিনড্রোম, মাথার খুলির বিকৃতি, অসিফিকেশন (ossification), মাথার ত্রুটি, ঠোঁট কাটা, তালুকাটা, অন্ধত্ব, শ্রবণের অস্বাভাবিকতা, কুশপা, বিকৃত জননঅঙ্গ এবং শারীরিক ও মানসিক কিছু অস্বাভাবিকতা হতে পারে।

১৯২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে ৭৪ জন গর্ভবতী মাকে Ray therapy প্রয়োগ করার পর ৩৬ জন স্বাভাবিক শিশু জন্ম নিয়েছিল, এর মধ্যে ২০ জন মারাত্মক প্রতিবন্ধী, ১৫ জন আকারে ছোট এবং বাকিরা অন্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমায় বোমা বিস্ফোরণের কারণে ০.৫ মাইলের মধ্যে কোন স্বাভাবিক সন্তান জন্ম নেয়নি। ১ মাইলের মধ্যে মায়েদের সন্তানের মধ্যে চোখের বিকৃত গঠন, স্থানান্তরিত পশ্চাদভাগ, হৃদরোগ, মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও লিউকোসিয়ার প্রভাব দেখা গেছে।

১২। রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

রাসায়নিক দ্রব্যের সার্বক্ষণিক ব্যবহার (gene) জিন বিনষ্ট করে। ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য হল সালফার কমপাউন্ড যা বাতাস দূষিত করে এবং চুল রং করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর ব্যবহৃত হয় শস্যের বীজের ছত্রাক নিবারণে সাহায্যকারী হিসেবে। গর্ভবতীর শরীরে পারদ প্রবেশ করলে শিশু মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হবে। ত্রুটিপূর্ণ এবং মৃত সন্তান জন্ম দিতে পারেন। শরীরে সীসার অনুপ্রবেশ ঘটলে শিশুর মধ্যে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। মাইক্রোসেফালী মানসিক প্রতিবন্ধী হয়। গবেষণায় মৃত সন্তানের গর্ভফুলে সীসার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল।

বিশেষ চাকরির বেলায়; যেমন- হাসপাতাল, রূপচর্চা কেন্দ্র ও কলকারখানায় কর্মরত মায়েরা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসার ফলে গর্ভপাতের শিকার হচ্ছে কিংবা তাদের সন্তানদের মধ্যে জন্মগত ত্রুটি দেখা গেছে।

১৩। জমজ শিশুর

দুটো শিশুর উৎপত্তিতে গর্ভ পরিবেশে স্থান সংকুলানের অসুবিধার জন্য গর্ভকালে শিশুর বিকাশকে ব্যহত করে; যেমন- প্রথমে ভূমিষ্ঠ শিশু আকারে বড় ও শক্তিশালী হয়। পরবর্তীগুলো ক্ষুদ্রকায় ও দুর্বল প্রকৃতির হয়। যারা পূর্ব সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ হয় তারা দৈহিক ও মানসিকভাবে অপরিপক্ব থাকে। তারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিযোজনে ভালভাবে সঙ্গতি বিধান করতে পারে না। নীচুমানের বুদ্ধির অধিকারী হয় বলে পড়াশুনায় এগুতে পারে না।

মাতৃগর্ভে শিশুর উপর মানসিক প্রভাব

মায়ের মানসিক অবস্থা শিশুর বিকাশকে সব সময় প্রভাবিত করে। দীর্ঘকাল ধরে মানসিক পীড়ন সন্তানের জন্য ক্ষতিকর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণভাবে আবেগ প্রবণ হলেও শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ভয়, রাগ, দুঃখ, ঈর্ষা ইত্যাদি আবেগের লক্ষণ।

বিভিন্ন কারণে গর্ভবতী মা মানসিক চাপের শিকার হতে পারেন; যেমন- অসুখী বিবাহিত জীবন, আর্থিক অস্বচ্ছলতা। শিল্প ও পেশাগত জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে এই আশংকায় সন্তান না চাওয়া। গর্ভধারণের ফলে গুরুতর শারীরিক অস্বস্তিজনিত তিরিক্ষি মেজাজ, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও আবেগের ভারসাম্য বিনষ্ট। যথার্থভাবে মায়ের ভূমিকা পালন করতে পারবে না এরকম উদ্বেগের উদ্ভব, দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সন্তান প্রতিবন্ধী হবে এরকম ভীতি অথবা প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ শিশুর সংখ্যা, রুবেলার মত রোগ ও থালিডোমাইড ওষুধের ফলে সৃষ্ট বিকৃতির বিবরণ মায়ের মনে ভীতি আরও বাড়িয়ে দেয়। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে এ ধরনের অমূলক কল্পনা তাদের ভয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এতে গর্ভস্থ শিশুর বিকাশ ব্যহত হতে পারে।

মানসিক চাপের কারণে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এতে প্রসব প্রক্রিয়ায় জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং অপরিণত শিশুর জন্ম হতে পারে। কারণ মায়ের উদ্বেগ জরায়ুর সংকোচনে বাঁধার সৃষ্টি করে। এতে প্রসব প্রক্রিয়া বিলম্ব হলে যন্ত্রের সাহায্যে প্রসব করানো যায় এবং জটিলতা বাড়ে। অনেক সময় মানসিক চাপের কারণে খাওয়ার প্রবণতা অতিরিক্ত বেড়ে যায় এতে ওজন বেড়ে গেলে প্রসব কষ্টকর হয়।

গর্ভবতী মা অনেক সময় সামান্য উদ্বিগ্ন হলে ভ্রূণের নড়াচড়া বৃদ্ধি পায়। এতে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পেশী সঞ্চালন ক্ষমতা অর্জনের জন্য শিশুর ব্যায়ামের কাজ হয়। তবে অতিরিক্ত নড়াচড়ার কারণে সন্তানের ওজন কমে যায় এবং স্নায়ু এতো দুর্বল হয় যে, জন্মের পর কয়েকদিন নবজাতকের পক্ষে পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বেশ কষ্টকর হয়। তবে ক্রমাগত গ্রন্থির কর্মকান্ডের জন্য মায়ের উদ্বেগ নবজাতকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এতে জন্মপরবর্তী পরিবেশের সাথে শিশুর সঙ্গতি বিধান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। শিশু চঞ্চল প্রকৃতির হয়। খাওয়া ও ঘুমানোর সময়সূচি রক্ষা করে না, অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে।

গর্ভকালীন বেশি নড়াচড়ায় শিশু তাড়াতাড়ি পেশী নৈপুণ্য অর্জন করে। অন্যদিকে শিশুর অতিরিক্ত অস্থিরতা স্নায়ুবিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে এবং ওজন বৃদ্ধি প্রতিহত করে। দেরীতে পেশী নৈপুণ্য অর্জন করে। মায়ের মানসিক পীড়ন ছেলেসন্তানের পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য অর্জনের অন্তরায়। শিক্ষণ ক্ষমতা, স্মরণশক্তি ও চিন্তা করার শক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিযোজন নিম্নমানের হয়।

সুতরাং গর্ভবতী মাকে দুশ্চিন্তামুক্ত ও উদ্বিগ্নতা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতে হবে এবং বিনোদনমূলক কাজে মনের প্রফুল্লতা বজায় রাখতে হবে কারণ মায়ের মানসিক অবস্থা, সন্তানের প্রতি মনোভাব পরবর্তীতে মা ও শিশুর সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

সারাংশ

শিশুর জন্মপূর্ব পরিবেশ হচ্ছে মা ও তার দেহ। জন্মপূর্ব অবস্থায় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ পর্ব হচ্ছে শিশুর জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। অনুকূল জন্ম পরিবেশ বংশগতির সম্ভবনাকে বিকশিত করে আবার প্রতিকূল পরিবেশ এসব সম্ভাবনাকে ব্যহত করে। কারণ পরিবেশের প্রভাব মায়ের স্বাস্থ্য ও ভ্রূণকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করে। যদি মায়ের দেহ সুস্থ ও নীরোগ থাকে, পুষ্টিগত উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং মানসিক অবস্থা ভাল ও মন প্রফুল্ল থাকে তা হলে ভ্রূণ (শিশুর) এর সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন

১। ভ্রূণের সুস্থ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি কীভাবে হয়?
ক. তার নিজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে
খ. মায়ের পুষ্টির মান উন্নয়ন করে
গ. মায়ের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
ঘ. মায়ের ওষুধ গ্রহণের মাধ্যমে

২। গর্ভাবস্থার প্রথম পর্যায়ে হরমোন গ্রহণে ভ্রূণের কি ক্ষতি হয়?
ক. মস্তিস্ক বৃদ্ধি সীমিত করে
খ. কোষ বৃদ্ধিতে বাধা দেয়
গ. স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত করে
ঘ. ক্রোমোজোমের বিশৃংখলা হয়

৩। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন ভ্রূণের করণীয় কি?
ক. খাদ্য গ্রহণ না করা
খ. নিজের খাদ্য নিজে গ্রহণ করা
গ. নড়াচড়া করে খাদ্য গ্রহণ করা
ঘ. নিজের করণীয় কিছু থাকে না

৪। অপর্যাপ্ত পুষ্টির কারণে ভ্রূণের কি হয়?
ক. বেরিবেরি রোগ হয়
খ. নড়াচড়ায় বাধাগ্রস্ত হয়
গ. রক্ত কমে যায়
ঘ. মস্তিষ্কের বিকাশ বিঘ্নিত হয়

৫। বেশি বয়সে গর্ভসঞ্চার হলে কি হয়?
ক. স্বাস্থ্যবান শিশু জন্ম নেয়
খ. প্রসবকালে কষ্ট কম পায়
গ. স্বাভাবিক বিকাশ দ্রুত হয়
ঘ. ক্রোমোজোমের বিশৃংখলা হয়

৬। মায়ের অসুস্থতায় ভ্রূণে কি ধরনের ক্ষতি হয়?
ক. ভ্রূণ অসুস্থ হয়ে যায়
খ. ভ্রূণের নড়াচড়া কমে যায়

গ. গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায় ঘ. স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়

৭। গর্ভাবস্থায় কোন কোন ওষুধ ক্ষতিকারক?
ক. পেনিসিলিন খ. এমপিসিলিন
গ. টেট্রাসাইক্লিন ঘ. আয়রণ টেবলেট

৮। ধুমপানে আসক্ত মায়ের সন্তানের কি অবস্থার সৃষ্টি হয়?
ক. এ্যানিমিয়া ও প্লীহা বড় হয়ে যায় খ. স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও অনিয়মিত হৃদস্পন্দন হয়
গ. সারভিকাল ক্যান্সার হয় ঘ. এরিথ্রোব্লাম টোসিস ও জন্ডিস হয়

৯। গর্ভাবস্থায় বিকিরণের প্রভাবে ভ্রূণের কি ধরনের ক্ষতি হয়?
ক. অর্ধসমাপ্ত বাহু ও পা খ. হৃদপিন্ডের ত্রুটিপূর্ণ আকৃতি
গ. হাড়ের জোড়ায় ত্রুটি ঘ. জিনের সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়

১০। মায়ের মানসিক চাপের ফলে ভ্রূণের কি হয়?
ক. গ্রন্থির ক্রিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হয় খ. সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়
গ. সন্তানের মানসিক চাপ হয় ঘ. পেশী সঞ্চালন ক্ষমতা কমে যায়

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভ্রূণের সুষ্ঠু বিকাশে মায়ের শারীরিক অবস্থা ও পুষ্টির অবদান বুঝিয়ে দিন।
২। গর্ভকালীন পর্যায়ে ওষুধ, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও ধুমপানের প্রভাবে কি ধরনের বিপত্তি দেখা যায়? আলোচনা করুন।
৩। ভ্রূণের স্বাস্থ্য রক্ষায় আপনার করণীয় কি? গ্রন্থির বিশৃংখলা ও বিকিরণের প্রভাবে ভ্রূণের কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।
৪। মায়ের মানসিক অবস্থা কীভাবে ভ্রূণের বিকাশে প্রভাব ফেলে ?
৫। মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধিতে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব বর্ণনা করুন।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ২

অনুশীলনী- ২.১ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। গ ৬। ক ৭। খ ৮। ঘ ৯। খ ১০। গ

অনুশীলনী- ২.২ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ ৫। গ ৬। খ ৭। খ ৮। খ ৯। ঘ ১০। ক ১১। গ ১২। গ ১৩। খ

অনুশীলনী- ২.৩ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। গ ৬। গ ৭। ক ৮। ক ৯। খ ১০। খ

অনুশীলনী- ২.৪ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ঘ ৫। ঘ ৭। গ ৮। খ ৯। ঘ ১০। ক

ইউনিট ৩

শিশুর বর্ধন ও বিকাশ

ভূমিকা

শিশুকে যথার্থরূপে বুঝতে হলে তার বিকাশ ও বর্ধন সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। কোন বয়সে একটি শিশু কি করতে পারবে আর পারবে না, তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা কি তার সামর্থ্যের বাইরে, বা সামর্থ্যের চেয়েও কম এ বিষয়ে সকলের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ জ্ঞান আমাদের শিশুদেরকে যথার্থভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটকে ছয়টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ-৩.১ ঃ বর্ধন ও বিকাশের সংজ্ঞা এবং পার্থক্য
পাঠ-৩.২ ঃ নবজাতক কাল
পাঠ-৩.৩ ঃ শিশু বিকাশের ধাপ
পাঠ-৩.৪ ঃ বিভিন্ন বয়সে শিশুর বৈশিষ্ট্য - শিশুকাল
পাঠ-৩.৫ ঃ প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুর বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৩.৬ ঃ প্রাকবিদ্যালয়গামী শিশুর বিকাশমূলক কাজ

পাঠ- ৩.১ ঃ বর্ধন ও বিকাশের সংজ্ঞা এবং পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিকাশের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- বর্ধনের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবেন
- বিকাশ ও বর্ধনের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন

অনেকেই বর্ধন (Growth) এবং বিকাশ (Development)কে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আসলে তা এক নয়। এদেরকে যদিও আলাদাভাবে দেখা যায় না তবুও এদের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বর্ধনকে আমরা পরিমাণগত (Quantitative) পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। বিপরীতভাবে বিকাশকে গুণগত পরিবর্তন (Qualitative Change) বলে আখ্যায়িত করতে পারি। এখানে উল্লেখ্য একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সেই নবজাতকের ওজন ৫-৮ পাউন্ড এবং দৈর্ঘ্য ১৭-২০ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এই নবজাতকের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। ওজনেও বাড়তে থাকে। এই যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ও ওজনে বৃদ্ধি যা পরিমাণগত বৃদ্ধি তাই হল বর্ধন (Growth)। আবার নবজাতক দীর্ঘদিন যাবৎ ক্রমান্বয়ে শুধু দৈর্ঘ্যে এবং ওজনে বাড়ে না সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছু ক্ষমতাও অর্জন করেছে। যে ছোট হাতটি নিয়ে সে একাকী দোলনায় খেলত ৫ বছর বয়সে ঐ হাত দিয়েই সে লিখতে পারছে, ১৫ বছর বয়সে ক্রিকেট খেলছে ঐ হাত দিয়েই। তা হলে দেখা যাচ্ছে হাতটি শুধু দৈর্ঘ্যেই বাড়েনি তার গুণগত মানেও পরিবর্তন হয়েছে। ৩ মাস বয়সে ঐ হাত দিয়ে সে যা করতে পারতো না এখন তা করতে পারছে। যেমন লিখতে পারছে অথবা ক্রিকেট খেলতে পারছে। এটিই গুণগত পরিবর্তন যাকে আমরা বলতে পারি বিকাশ।

পরিনমন ও অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের ধারাকে বিকাশ বলে। (Development means a Progressive series of changes that occur as a result of maturation and experience) গুণগত পরিবর্তনকে তাই বিকাশ বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ বিকাশ বলতে শুধুমাত্র উচ্চতার বৃদ্ধি বা দক্ষতার উন্নতি বোঝায় না বরং বিকাশ হচ্ছে একটি জটিল প্রক্রিয়া যেখানে বর্ধন এবং ক্ষয় দুটোই ক্রিয়াশীল। সারা জীবনব্যাপী দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত ধর্মী প্রক্রিয়া বিকাশে কাজ করে চলেছে। গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে শুরু করে আমৃত্যু এই দুই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। তবে জীবনের শুরুতে ক্ষয়ের চেয়ে বর্ধন আর জীবনের শেষের দিকে বর্ধনের চেয়ে ক্ষয় প্রাধান্য বিস্তার করে যেমন বৃদ্ধকালে শারীরিক ও মানসিক দক্ষতার ক্ষয় ঘটলেও চুল ও নখের বৃদ্ধি হতেই থাকে। প্রকৃত পক্ষে গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক দক্ষতার সর্বদা পরিবর্তন হচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা ‘বর্ধন’ ও ‘বিকাশের’ সংজ্ঞা সম্পর্কে জানলাম। এখন যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করবো। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আমৃত্য ব্যক্তি বিকাশের পরিবর্তন চলছে। বিশেষ কোনও বয়সে হয়তবা একটি পরিবর্তনের শুরু হয়, আর একটি পরিবর্তন শীর্ষে পৌঁছে যায় আবার কোন একটি পরিবর্তন হয়ত সমাপ্ত হয়। এই পরিবর্তনগুলোকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যেমন-

- আকারগত পরিবর্তন (Change in Size)
- আনুপাতিক পরিবর্তন (Changes in Proportions)
- পুরাতন বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি (Disappearance of Old Features)
- নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন (Acquisition of New Features)

এবার উপরোক্ত পরিবর্তনসমূহ আলোচনা করা যাক-

আকারগত পরিবর্তন

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার উচ্চতা, ওজন ও দেহের আয়তন বাড়ে। যে নবজাতক ছিল ৫/৭ পাউন্ডের সে হয়ত বড় হয়ে ১২০ পাউন্ড ওজনের হয়। তেমনি যে ছিল ২০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের শিশু হয়ে যায় ৫৬ ইঞ্চি। একই সাথে শিশুর অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আকারে বড় হয়। ছোট বেলায় তার হৃৎপিন্ড, ফুসফুস পাকস্থলী যে আকারে থাকে পরে তার চেয়ে অনেক বড় হয়। এ ছাড়া স্মৃতিশক্তি, যুক্তি প্রদান, প্রত্যক্ষণ এবং সৃজনশীল কল্পনা শক্তির ও পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে। যে ছোট শিশুটি সংখ্যার ধারণা সহজে বুঝতে পারত না সেই বড় হয়ে বিরাট অংক কষতে সমর্থ হয়। কল্পনার মানুষে যে একদিন নিজে

আকাশে উড়বার বাসনা পোষণ করত সেই হয়ত একদিন আকাশযান আবিষ্কার করে তার সাধ মেটাতে পারে। এটা তার মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তনের উদাহরণ।

আনুপাতিক পরিবর্তন

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে; যেমন- জন্মের সময় শিশুর মাথা থাকে তার দেহের প্রায় চারভাগের ১ ভাগ। পরবর্তীতে হাত, পা, ধড় ইত্যাদি মাথার সঙ্গে সংগতি রেখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মাথার পরিমাপ হয় সমগ্র দেহের শতকরা ১২ ভাগ। শিশুর হাত পা, দেহ যে অনুপাতে বাড়ে চোখ কিংবা মাথা সে অনুপাতে বাড়ে না। জন্মের পর শিশুর ঘাড় আর মাথা প্রায় লেগে থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঘাড়টি বড় হয়। তেমনিভাবে চিবুক, কপাল কাঁধ প্রশস্ত হয়। স্থূল পেটটি স্বাভাবিক আকার ধারণ করতে থাকে। হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো লম্বা হয়। দুধেল দাঁত গজাতে থাকে।

চিত্র ঃ জন্ম থেকে পূর্ণ বয়স পর্যন্ত দেহের অনুপাত

পুরাতন বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি

সদ্যজাত শিশুর শরীরে যে লোম থাকে সেগুলো ঝরে পড়ে যায়। দুধেল দাঁত পড়ে যায়। পিউবার্টি বা প্রথম যৌনাবস্থার পরে থাইমাসগ্রন্থি বিলুপ্ত হয়। শরীর থেকে শিশুসুলভ কমনীয়তা হারিয়ে যায়। শিশুসুলভ চলাফেরার পরিবর্তন হয়। শিশুসুলভ কণ্ঠ ও কথাবার্তা পরিবর্তিত হয়। রূপকথার কল্প কাহিনীগুলো এক সময় আর মনোযোগ কাড়ে না। সে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে শেখে। নতুন কিছু সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ হয়। মোট কথা, শিশুর শারীরিক ও মানসিক তথা আচরণগত অনেক বৈশিষ্ট্য বড় হওয়ার সাথে সাথে হারিয়ে যায়।

নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন

ক্রমান্বয়ে শিশু কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। যেমন দুধেল দাঁত, গলার স্বরের পরিবর্তন, পরোক্ষ যৌন বৈশিষ্ট্য, নতুন ধরনের আগ্রহ, উদ্বেগ, দুঃশ্চিন্তা প্রভৃতি। অভিজ্ঞতা ও শিখনের ফলে কথা বলার কৌশল, বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনমূলক নৈপুণ্য, বিভিন্ন প্রকার খেলার দক্ষতা, আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতা প্রভৃতির কুশলতা সে অর্জন করে।

শিশুর বর্ধন ঘটে থাকে ধীরে ধীরে। এর রয়েছে যেমন গতিময়তা তেমনি বিশেষ ধারা। বর্ধন ও বিকাশ সব সময় সামনের দিকে এগিয়ে চলে। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার উচ্চতা ও ওজন যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন তার অঙ্গ সঞ্চালন ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সবই হচ্ছে বিকাশ।

সারাংশ
বর্ধন ও বিকাশে পার্থক্য বিদ্যমান। বর্ধন হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তন আর বিকাশ হচ্ছে গুণগত পরিবর্তন। দেহ শুধু দৈর্ঘ্য প্রস্থ, ওজনে বাড়লে তা বর্ধন কিন্তু এর সাথে প্রতিটি অঙ্গের যে কার্যাবলী তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারা হল বিকাশের লক্ষণ। বর্ধন ও বিকাশের সাথে কতগুলো পরিবর্তন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এগুলো হচ্ছে- আকারগত পরিবর্তন, আনুপাতিক পরিবর্তন, পুরাতন বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ও নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি বর্ধন?
ক. ভালভাবে কথা বলা
খ. কল্পনা করা
গ. কোন কিছু মনে রাখা
ঘ. উচ্চতায় বাড়া

২। কোনটি বিকাশ?
ক. লিখতে পারা
খ. উচ্চতায় বাড়া
গ. আয়তনে বাড়া
ঘ. ওজনে বাড়া

৩। প্রাপ্ত বয়স্কদের মাথা দেহের কত অংশ?
ক. ১০ শতাংশ
খ. ১২ শতাংশ
গ. ২৫ শতাংশ
ঘ. ১৫ শতাংশ

৪। দুধেল দাঁত পড়ে যাওয়া কেমন পরিবর্তন?
ক. আকারগত
খ. পুরাতন বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি
গ. নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন
ঘ. আনুপাতিক পরিবর্তন

৫। কোনটি নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জনের উদাহরণ?
ক. দুধেল দাঁত পড়ে যাওয়া
খ. ছোট ঘাড়টি বড় হওয়া
গ. অভিনয় দক্ষতা
ঘ. পাকস্থলী বড় হওয়া

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বর্ধন ও বিকাশের পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
২। আকারগত পরিবর্তন ও আনুপাতিক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩। বর্ধন ও বিকাশে পুরানো বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্ত কীভাবে ঘটে? বিকাশের ক্ষেত্রে শিশু কি কি নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে?

পাঠ- ৩.২ ঃ নবজাতক কাল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- নবজাতক শিশুর প্রতিক্রিয়া জানতে পারবেন
- নবজাত শিশুকে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোজন করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- নবজাতকের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন

শিশু ভূমিষ্ঠ হয় নিতান্ত অসহায় একটি জীবন হিসেবে। বেঁচে থাকার জন্য সে তখন সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল। নবজাত শিশুর বয়সসীমা হল ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে ২ সপ্তাহ মাত্র।

কোন কোন শিশু নয়মাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে। আবার কোন কোন শিশু নয়মাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পরে ভূমিষ্ঠ হয় ফলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের মাত্রা এক রকম না হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা নবজাত শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব।

নবজাতকের বৈশিষ্ট্য তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়; যেমন-

(১) দৈহিক বিকাশ
(২) অসহায়ত্ব
(৩) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা

১। দৈহিক বিকাশ

(ক) আকৃতি

আমাদের দেশের সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর গড় ওজন ৫ থেকে ৭/৮ পাউন্ড, লম্বায় হয় ১৯-২১ ইঞ্চি। ছেলে শিশুরা মেয়ে শিশুর তুলনায় সামান্য বেশি লম্বা ও ভারী হয়ে থাকে।

(খ) শিশু সুলভ চেহারা

নবজাতকের মাংসপেশী নরম এবং ক্ষুদ্রাকৃতি হয়, পেশী সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। হাত এবং বাহুর চেয়ে পায়ের পেশী কম মজবুত। মাংস পেশীর মত অস্থি নরম এবং নমনীয় হয়। ত্বক কোমল থাকে এবং প্রায়ই তাতে ফুসকুড়ি দেখা দেয়। অনেক সময় দেখা যায় শিশুর পিঠে নরম আগের মত চুল রয়েছে।

(গ) দেহ সৌষ্ঠব

নবজাতকের মাথার আকৃতি দৈর্ঘ্যের প্রায় $\frac{১}{৪}$ অংশ। যেখানে পরিণত ব্যক্তির মাথার আকৃতি হয় $\frac{১}{৭}$ ভাগ। চোখের উপরিভাগ আনুপাতিকভাবে মাথার অবশিষ্ট অংশের চেয়ে বেশি বিস্তৃত। চোখ প্রায় পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির মত। নাক খুব ছোট, গলার আকৃতি খাট এবং গলার ত্বকে অনেক ঘন ভাঁজ থাকে। কাঁধ সরু হয়, কিন্তু তলপেট বড় এবং উঁচু হয়ে ফুলে থাকে।

২। অসহায়ত্ব

গর্ভকালীন সময়ে মায়ের নালীর মাধ্যমে শিশুর রক্ত সঞ্চালন হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ হয় এবং পুষ্টি গ্রহণ করে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শরীর ও স্নায়ু প্রক্রিয়া অপরিপক্ব থাকার কারণে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিকাশের অভাবে নবজাতকের মধ্যে অসহায়ত্ব দেখা যায়। যেমন-

(ক) শারীরিক প্রক্রিয়া

শারীরিক প্রক্রিয়াসমূহের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। কারণ জন্মের পরপর প্রধান প্রধান অভিযোজন; যেমন- অপরিহার্য শ্বাস-প্রশ্বাস, তাপ নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য গ্রহণ ও বর্জ্য পদার্থ অপসারণ। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে কান্নার মাধ্যমে ফুসফুস প্রসারিত হওয়ায় শ্বাসকার্য শুরু হয়।

নাড়ীর গতি (Pulse)

শুরুতে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে ৪০-৩৫ বার। যেখানে পূর্ণ বয়স্কদের ১৮ বার।

হৃৎস্পন্দন (Heart Beat)

রক্তবাহী নালীকার চেয়ে হৃৎপিন্ড আকৃতিতে ছোট হওয়ায় স্পন্দন ১৩০-১৫০ বার হয়। যেখানে পূর্ণ বয়স্কের হয় ৭০ বার। গর্ভে থাকাকালীন সময়ে ১০০°F তাপমাত্রায় থাকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে ৬৮-৭০° F তাপমাত্রায় খাপ খাওয়াতে হয়। মল-মূত্র ত্যাগ ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পর শিশু মল-মূত্র ত্যাগ করতে পারে।

প্রতিক্রিয়া

শিশু ক্ষুধার্থ হলে অথবা কেউ তার ঠোট স্পর্শ করলে আপনা আপনি চুষতে পারে।

খ) দৃষ্টি

সদ্য ভূমিষ্ট শিশু বস্তুর উজ্জলতা, তারতম্য বুঝতে সক্ষম। চোখ ঘুরিয়ে তাকানো অথবা দোলায়মান কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে আবার চোখকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে এবং সমান্তরাল ও লম্বভাবে দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম সপ্তাহে অর্জন করে।

(খ) শ্রবন

শ্রবণের বেলায় কানের মধ্যবর্তী অংশে তরল পদার্থ পূর্ণ থাকার কারণে কানের অভ্যন্তরে শব্দ তরঙ্গ পৌঁছাতে পারে না। অন্যান্য শব্দের চেয়ে মানুষের স্বর শুনে তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

(গ) ঘ্রাণ

ঘ্রাণ কোষগুলো জন্মের সময় পরিপক্ব থাকে। সেজন্য নবজাতক বিভিন্ন ধরনের গন্ধ বুঝতে সক্ষম। ফলে কান্না, মাথা ঘুরানো, কটুগন্ধ পরিহারের প্রচেষ্টার চুষে খাওয়ার মত প্রতিক্রিয়া, দেহ শিথিল করা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) স্বাদ

স্বাদ গ্রহণ কারী কোষগুলো জন্মের সময় সুগঠিত থাকায় নবজাতকের স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতা তীক্ষ্ম। মিষ্টি দিলে চুষতে থাকে।

(ঙ) অঙ্গ-প্রতঙ্গের সংবেদনশীলতা

জন্মের পর ক্ষুধার উদ্রেক হয়। জন্মের প্রথম দিনই পাকস্থলীতে ক্ষুধাজনিত সংকোচন শুরু হয় এবং তৃষ্ঞার উদ্রেক হয়।

(চ) ত্বক সংবেদন

স্পর্শ, চাপ ও তাপ সংবেদন জন্মের সময় বেশ শক্তিশালী থাকে। দেহের বাইরের চেয়ে অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনার অনুভূতি খুব তাড়াতাড়ি সূচিত হয়।

৩। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবজাত শিশুদের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। ক্ষেত্রগুলো হল- সব শিশুরা দেখতে এক রকম নয়, কারো খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা কম, সংবেদনশীল অপরিপক্ব থাকে, কান্নাকাটি বেশি করে। কারণ হল গর্ভকালীন পরিবেশ ও বংশগতি।

সারাংশ

জন্মের পর থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত কালকে নবজাত কাল বলে। নবজাতকের মধ্যে আমরা তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই; যেমন- দৈহিক বিকাশ, অসহায়ত্ব ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা। জন্মের পরবর্তী পরিবেশে খাপ খাওয়াতে হয় বলে জন্মকালীন ওজন কিছুটা কমে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন সময়কে নবজাত কাল বলে?
ক. এক সপ্তাহ
খ. দুই সপ্তাহ
গ. তিন সপ্তাহ
ঘ. চার সপ্তাহ

২। নবজাতকের কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোজন করতে হয়?
ক. বাবা-মার সাথে খাপ খাওয়ানো
খ. ভাই-বোনদের সাথে
গ. খাদ্য গ্রহণ ও তাপমাত্রার সাথে
ঘ. আলো ও শব্দের সাথে

৩। কোন কোন সংবেদন ক্ষমতা অপরিপক্ব থাকে?
ক. ঘ্রান ও স্বাদ
খ. ত্বক
গ. শ্রবণ ও দৃষ্টি
ঘ. অঙ্গ-প্রতঙ্গের সংবেদনশীলতা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নবজাতকের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
২। নবজাতকের বৈশিষ্ট্য কোন কোন পর্যায়ে ভাগ করা যায় আলোচনা করুন।
৩। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতিক্রিয়া ও সংবেদনশীললতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ- ৩.৩ ঃ শিশু বিকাশের ধাপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ বিকাশের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ♦ শিশুর বিকাশের ধাপগুলোর সময় সীমা বর্ণনা দিতে পারবেন

শিশু জন্মের পর তার জীবন পরিক্রমায় বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয় এবং প্রতিটি ধাপে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও শিশুদের আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিশুদের বিকাশমূলক ধারা যখন স্বাভাবিক ও সাবলীল গতিতে চলে, তখন শিশুরা একের পর এক ধাপ অতিক্রম করে পরবর্তী ধাপে সফলভাবে পৌঁছায়। তাছাড়া সমাজও শিশুদের প্রতিটি ধাপের কার্যক্রমের পারদর্শিতা অর্জন প্রত্যাশা করে। এভাবে যতই দিন যেতে থাকে, ততই বিকাশমূলক শক্তির প্রভাবে শিশুরা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছায়। মানবসত্ত্বার জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়কে মনোবিজ্ঞানী, শিশুবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত করেছেন। নিচে শিশু বিকাশের ধাপগুলো আলোচনা করা হল-

(১) জন্মপূর্ব বিকাশ (Prenatal Development)
সময় ঃ গর্ভধারণের পর থেকে জন্ম লাভ পর্যন্ত।

(২) নবজাত কাল (Newnatal)
সময় ঃ শিশু জন্মের পর হতে ২ সপ্তাহ বা ১৪ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) শিশুকাল (Childhood)
সময় ঃ ২ সপ্তাহ হতে ২ বছর।

(৪) প্রাথমিক শৈশবকাল (Early Childhood)
সময় ঃ ২ বছর থেকে ৫/৬ বছর।

(৫) বিলম্বিত শৈশবকাল বা শৈশবের শেষ পর্যায় (Late Childhood)
সময় ঃ ৬ বছর থেকে ১২ বছর।

(৬) বয়ঃসন্ধিকাল (Adolescent)
সময় ঃ ১৩ বছর থেকে ১৮/১৯ বছর।

জন্মপূর্ব কাল

জন্ম পূর্ব ধাপ হল শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগের ধাপ। অর্থৎ মায়ের পেটে থাকাকালীন সময়ে একটি কোষ কিভাবে বৃদ্ধি পেয়ে মানব শিশুতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়, যে মুহূর্তে বাবার (Sperm) শুক্রাণু মায়ের ডিম্বাণু (Ovum) দিয়ে সংযোজন (Fertilization) হয়। অতএব যখন থেকে বাবার Sperm মায়ের Ovum এর সাথে মিলিত হয়ে, মানব সন্তানের জন্ম হয় তখন থেকে ৯ মাস বা ২৮০ দিন পর্যন্ত এই ধাপ বিস্তৃত। মায়ের জরায়ুর ভিতর এই নিষিক্ত ডিম্বাণুটি ধীরে ধীরে নানাবিধ পরিবর্তনের মাধ্যমে মানব শিশুতে পরিণত হয় এবং মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়। এই সময়কাল বেশ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সময়ের বর্ধন খুব দ্রুত। কারণ এই সময়ের মধ্যে স্পষ্ট হয় মানব কাঠামো এবং তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

নবজাত কাল

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে নবজাত কাল শুরু হয় এবং শেষ হয় ২ সপ্তাহ বা ১৪ দিন পর। কাজেই অন্যান্য বিকাশমূলক ধাপের চেয়ে নবজাত কাল বেশ সংক্ষিপ্ত। শিশুর জীবনের অন্যান্য ধাপের মত এই ধাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ধাপে শিশু নতুন পরিবেশের সাথে পরিচিত হয় এবং খাপ-খাইয়ে চলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। একটি ভিন্নতর পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধান করার সময় নবজাত শিশুর অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই শিশুর নতুন পরিবেশ এবং মা ও সন্তানের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় হলে শিশুর মনোভাব আরো সুদৃঢ় হয়।

শিশুকাল

শিশু জন্মের পর ২ সপ্তাহ হতে ২ বছর পর্যন্ত সময়কে শিশুকাল বলা হয়। শিশুকাল হল বিকাশমূলক ধাপের তৃতীয় ধাপ। শিশু জন্মের ২ সপ্তাহ পর থেকে পরবর্তী ২ বছরে শিশুর আচরণের পরিবর্তন ও পরনির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে অথচ

উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে থাকে। এই ধাপে শিশুরা দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে থাকে। ফলে শিশুর চেহারার পরিবর্তনই শুধু হয় না। সাথে সাথে তার কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। শিশুর অস্থি, পেশী স্নায়ুর গঠন ও পরিপক্বতা এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হওয়ায় শিশু সমন্বিতভাবে হাত-পা ব্যবহার করতে পারে। শিশু টুপি, মোজা টেনে খুলতে পারে। খেলনা গাড়ি নাড়াচাড়া করা এবং পেন্সিল দিয়ে আঁকিঝুকি করতে পারে। এই বয়সের শিশুদের আধো-আধো কথা বলা পরিবারের সবাইকে আকৃষ্ট করে।

প্রাথমিক শৈশবকাল

শিশু কালের পরের ধাপ হল প্রাথমিক শৈশব কাল। এই ধাপ শুরু হয় ২ বছর বয়স হতে এবং তা করা পর্যন্ত সময়কে মনোবিজ্ঞানীরা শৈশবের শেষ পর্যায় বা বিলম্বিত শৈশব বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ধাপে শিশুরা আবশ্যিকভাবে বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে বলে এই ধাপকে অনেকে ("School age") বলে থাকেন। এই সময় শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। শিশুর বর্হিজগতের সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। এই বয়স হল দল গঠন করার বয়স। সমবয়সীদের স্বীকৃতি অর্জন এবং দলের সদস্য পদ লাভ করা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক পিতামাতার কাছে এই বয়স সমস্যাময় বয়স। কারণ এই বয়সে শিশুরা পিতামাতার চেয়ে বন্ধুদের মতামত বেশি প্রাধান্য দেয় এবং স্বাধীনচেতা মনোভাবের হয়। ফলে পিতামাতার সাথে তাদের বিরোধ শুরু হয়। আবার এই বয়সের শিশুরা সৃজনশীল কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকতে আনন্দ বোধ করে। এবং ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে।

বয়:সন্ধিক্ষণ

বিকাশমূলক যে পর্যায়ে ছেলে-মেয়েরা যৌন ক্ষমতা অর্জন করে। সেই পর্যায়কে বয়:সন্ধিক্ষণ বা কৈশোর বলে। বিকাশমূলক কিছু বৈশিষ্টের জন্য বয়:সন্ধিক্ষণ বয়স জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এটা এমন এক পর্যায়, যেখানে ছেলে-মেয়েদের শৈশবের শেষ এবং যৌবনের শুরুতে তাদের দেহের আকস্মিক পরিবর্তন। যৌন পরিণতি, মানসিক পরিবর্তন, বাইরের জগতের উপর এগুলোর প্রতিক্রিয়া, এসব মিলে বয়:সন্ধিক্ষণ বয়সের কিশোর-কিশোরীদের মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের স্বাভাবিক কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন জ্ঞান লাভের প্রতি তাদের আকাঙ্খা দেখা দেয়। তাছাড়া এ বয়সে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে এবং এ সর্ম্পকে সুচিন্তিত এবং সুর্নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করে এবং পাশাপাশি তাদের স্বাধীনতার চাহিদা দেখা দেয়। কিশোর কিশোরীরা নিজ থেকে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে, পরিবারের সমস্যা সর্ম্পকে মতামত দিতে চায় এবং কোন কাজের দায়িত্ব পেলে তারা আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করে। মানসিক পূর্ণতা থেকেই তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা আসে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু অনেক সময় পিতামাতা ছেলে-মেয়েদের এই স্বাধীনচেতা মনোভাব ভাল চোখে দেখেন না। ফলে কোন কোন সময় পিতামাতার সাথে তাদের সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং ছেলে-মেয়েদের আচরণে বৈষম্য দেখা দেয়।

শিশুর জীবন পরিক্রমায় বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার আগে অথবা জন্মের পর মারা যেতে পারে। তবে এ কথা সত্যি যে শিশু তার বিকাশের প্রতিটি ধাপে কিছু সমস্যা বা বাঁধার সম্মুখীন হয়। শিশুদের এই সমস্যা পরবর্তী ধাপে পৌঁছানোর আগে দূর করা উচিত। কারণ বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে শিশুদের যে মনোভাব, আগ্রহ, অভ্যাস আচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়, তার উপর শিশুদের পরবর্তী জীবনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অসহায়। এই সময় শিশু চায় ভালবাসা, আদর, যত্ন ইত্যাদি। শিশু যদি শান্তিতে ঘুমায়, সময়মত খাবার পায়, কাঁদলে মা আদর করে বুকে তুলে নেয়, তাহলে পরিপূর্ণ আদর যত্নের মাধ্যমে তার পরিবেশ সম্পর্কে, তার পরিবেশের মানুষ সম্পর্কে আস্তা ও মৌলিক বিশ্বাস গড়ে ওঠে। যা পরবর্তী জীবনের ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে।

সারাংশ

শিশুর জীবন পরিক্রমায় বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এই ধাপগুলো হল- জন্মপূর্ব ধাপ, নবজাতকাল, শিশুকাল, প্রাথমিক শৈশবকাল, বিলম্বিত শৈশবকাল ও বয়ঃসন্ধিকাল। শিশু বিকাশের প্রতিটি ধাপই শিশুর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিশুর বিকাশ যখন স্বাভাবিক গতিতে চলে, তখন পরবর্তী ধাপে শিশুরা সফলভাবে পৌঁছাতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিশুকাল শুরু হয় কখন?
ক. শিশু জন্মের পর পরই
খ. শিশু জন্মের ২ সপ্তাহ পর
গ. জন্মের ৪ সপ্তাহ পর
ঘ. জন্মের ২ বছর পর

২। প্রাথমিক শৈশব কালের সময়সীমা কম?
ক. শিশুর ২ বছর - ৫/৬ বছর
খ. শিশুর ১ বছর - ২ বছর
গ. শিশুর ৬-১২ বছর
ঘ. শিশুর ১২-১৫ বছর

৩। বিলম্বিত শৈশব শুরু হয় কখন?
ক. ৩ বছর বয়সে
খ. ৬ বছর বয়সে
গ. ১০ বছর বয়সে
ঘ. ১৪ বছর বয়সে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিশু বিকাশের ধাপগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। শিশুর বিকাশমূলক ধাপসমূহকে কতভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ধাপের বর্ণনা দিন।

পাঠ- ৩.৪ ঃ বিভিন্ন বয়সে শিশুর বৈশিষ্ট্য-শিশুকাল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিশুকালের সময়সীমা বর্ণনা করতে পারবেন
- শিশুকালের আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিশুকালের আচরণের পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারবেন

শিশু জন্মের দু-সপ্তাহ বয়স হতে ২ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে শিশুকাল বলা হয়। অনেক শিশু মনোবিজ্ঞানী এ বয়সটি বোঝাতে ("Infancy") শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শিশু জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর হতে পরবর্তী দু'বছরে শিশুর আচরণের পরিবর্তন এবং পরনির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। জীবনের অন্যান্য ধাপের মত এ ধাপটিতে বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তবে শিশুকালের আচার আচরণ নবজাত কাল থেকে অনেক পরিপক্ব। নিচে এই সময়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল-

শিশুকালের এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময়কে জীবনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপনের সময় বলা যেতে পারে। কারণ এই সময় শিশুর অনেক আচরণ, আত্মবিশ্বাস মনোভাব এবং আবেগ প্রকাশের ধারা সূচিত হয়। যা শিশুর পরবর্তী জীবনের উপর প্রভাব ফেলে।

এই সময় শিশুরা দৈহিক দিক দিয়ে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে থাকে। শিশুর পেশী ও অঙ্গ সঞ্চালন অনিয়ন্ত্রিত হতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শিশু ক্রমান্বয়ে হামাগুড়ি দিতে, বসতে, দাঁড়াতে এবং স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারে। ৬/৭ মাস বয়সে শিশুর দুধ দাঁত উঠতে আরম্ভ করে এবং ২ বছর পর্যন্ত ১৬টি দাঁত উঠে এবং শিশুর খাদ্যাভাসের পরিবর্তন আসে। জন্মের সময় শিশুর যে রকম মাথা বড় থাকে। এই বয়সে তার প্রাধান্য কমতে থাকে। শিশুর নাদুসনুদুস গড়ন এ বয়সে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয় এবং বিশালাকৃতি মাথার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উচ্চতা এবং ওজন বৃদ্ধির সাথে সমানুপাতিক ভাবে দৈহিক পরিবর্তনও ঘটে। শিশুর হাত, বাহু এবং পায়ের বর্ধনে বেশ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সাথে তার চেহারার পরিবর্তন হয় এবং শিশুর কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থায় বড়দের সাহায্যের প্রয়োজন কমতে থাকে এবং অনেক সময় শিশুরা বড়দের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে থাকে। শিশুরা যখন নিজেদের চাহিদা কিংবা অভাব অন্যকে বোঝাতে পারে তখন স্বনির্ভরতা আরও বৃদ্ধি পায়। এ বয়সে যে সব কাজ নিজেরা করতে সক্ষম হয় অথবা করতে পারবে বলে মনে করে, সে সব কাজ অন্যকে করতে দিতে চায় না। হঠাৎ পাওয়া স্বাধীনতায় তারা বাবা-মা অথবা পরিবারের বড়দের নিকট হতে বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে শিশুরা ভয়ংকর চিৎকার করে এবং কান্নার মাধ্যমে প্রতিবাদ করে। ১টি শব্দ যোগে বাক্য গঠন করতে পারে; যেমন- আমি গোসল করব, খেলনা নেব, আমি বাইরে যাব ইত্যাদি।

সামাজিকতার ক্ষেত্রে তারা অসামাজিক ও আত্মকেন্দ্রিক হলেও ধীরে ধীরে তাদের অসামাজিকতার ঘোর দূর হতে থাকে। এবং তাদের সামাজিক দলে অংশ গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে তারা একা খেলতে এবং অন্যের খেলনা ছিনিয়ে নিলেও পরবর্তীতে তারা অন্যদের সাথে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করা এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নানা রকম ভাবভঙ্গি প্রদর্শন করে থাকে। তবে এ সময় শিশুদের আবেগ খুব সাময়িক। শিশুদের স্বত:স্ফূর্ত নাড়াচাড়ায় বাধা দিলে এবং তাদের ইচ্ছা পূর্ণ না হলে তারা রেগে যায়, চিৎকার করে। আবার নতুন কোন জিনিস দেখলে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এবং জিনিসটি ধরে নাড়াচাড়া করে, ঝাঁকায়, খুলে দেখতে চায়, মাটিতে আছাড় দেয়। এবং তাদের আবেগ অত্যন্ত সহজ এবং সরল।

পরিপক্বতার দিক দিয়ে তারা আগের ধাপের তুলনায় পরিপক্ব হলেও শিশুকালের এই সময়ে তাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম থাকে বলে অনেক শিশু মৃত্যু মুখে পতিত হয়। শিশুর বয়স ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং শিশুদের সঞ্চালন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। পক্ষান্তরে তাদের জ্ঞান সীমিত থাকে বলে, তারা অনেক দুর্ঘটনার শিকার হয়। শিশুকালের এই সময়টি নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে শিশু বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কারণ শিশুদের আচরণের ধারা আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস এবং মনোভাবের ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাব অনুকূল না হলে শিশুদের মানসিক বিপর্যয়, ক্ষুধামন্দা, হজমের ব্যাঘাত ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। তাই এই বয়সের শিশুদের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

সারাংশ

শিশুকালের সময়সীমা হল ২ সপ্তাহ হতে ২ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ধাপের প্রথম দিকে শিশুরা অসহায় ও পরনির্ভরশীল হলেও শেষের দিকে তাদের পরনির্ভরশীলতা কিছুটা কমতে থাকে। তাই শিশুদের স্বর্নিভর হওয়ার এ সময়টিতে শিশুদের আগ্রহ, শিশুর চাওয়া পাওয়াগুলোকে সঠিকভাবে যাতে কাজে লাগানো যায় সে দিকে পিতামাতার মনোযোগী হওয়া উচিত। সেই সাথে পিতামাতার স্মরণ রাখা উচিত সব শিশুদের বিকাশের ধারা এক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিশু কালের সময়সীমা কত?
ক. ২ সপ্তাহ থেকে ২ বছর
খ. ১ সপ্তাহ থেকে ৬ মাস
গ. ১ সপ্তাহ থেকে ১ বছর
ঘ. ১ মাস থেকে ১ বৎসর

২। শিশুদের দুধ দাঁত উঠতে আরম্ভ করে কখন?
ক. ৪-৫ মাসে
খ. ১ বৎসর
গ. ৬-৭ মাস বয়সে
ঘ. ২ বৎসর বয়সে

৩। শিশুদের সামাজিকতার লক্ষণ কোনটি?
ক. অন্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা করা
খ. একা একা খেলা করা
গ. দরজা বন্ধ করে একা বসে খেলা
ঘ. অন্যের খেলনা নিয়ে খেলা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিশুকালের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

২। শিশুকাল বলতে কোন সময়কে বোঝায়? এই সময় শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

পাঠ- ৩.৫ ঃ প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুর বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষ আপনি—

- প্রাকবিদ্যালয় সময়সীমা বর্ণনা করতে পারবেন
- শিশুর বিকাশ ঠিকমত হচ্ছে কি না, তা দেখতে পারবেন
- শিশুর আচরণের ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো বুঝতে পারবেন ও শিশুকে সাহায্য করতে পারবেন

শিশু কালের পরে আসে প্রাক্‌বিদ্যালয় সময়। প্রাক্‌বিদ্যালয় সীমা হল ২-৫/৬ বছর। কোন কোন শিশু বিজ্ঞানী এই সময়কে প্রারম্ভিক শৈশবকাল বলে উল্লেখ করেছেন। এই সময় শিশুদের আনুষ্ঠানিকভাবে পড়ালেখা শুরু হয় বলে এই সময়কে মনোবিজ্ঞানীরা "Pre-school" সময় বলে উল্লেখ করেছেন। এই বয়সে শিশুদের মাঝে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হল-

শিশুকালের তুলনায় এই বয়সে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ধীর গতিতে চলে। শিশুদের বার্ষিক উচ্চতা বৃদ্ধির গড় হার ৩" এবং ওজন গড়ে ৪-৫ পাউন্ড বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে শিশুদের কিছু শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন থুতনী এবং ঘাড়ের বৃদ্ধি হয়, শিশুদের বাহু, পা লম্বা হয়, পায়ের পাতা প্রশস্ত হয়। মাথার গড়ন আংশিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে এবং এই বয়সের শেষের দিকে অর্থাৎ ৫/৬ বছর বয়সে শিশুদের প্রথম দুধ দাঁত পড়তে শুরু করে। ফলে শিশুদের মুখাকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

শিশুদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। শিশু মনোবিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন নৈপুণ্য অর্জন করার জন্য প্রাক্‌বিদ্যালয় সময় হচ্ছে উপযুক্ত সময়। দৌড়, লাফ, ঝাপ, তিন চাকার সাইকেল চালানো, সিঁড়ি বেয়ে উঠা নামা করা ইত্যাদি শারীরিক নৈপুণ্যমূলক কাজ তারা স্বেচ্ছায় এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে করে থাকে। পাঁচ বছরের শিশুরা সুন্দরভাবে বল ছুঁড়তে পারে, কাঁচি দিয়ে কোন জিনিস কাটতে পারে, দড়ি ধরে ঝোলা, দাঁত মাজা, জামার বোতাম লাগানো ইত্যাদি কাজ শিশুরা সফলভাবে করতে সক্ষম হয়। এবং শিশুরা আগের তুলনায় স্বাবলম্বী হয়।

তারা অতি মাত্রায় চঞ্চল প্রকৃতির হয়। ধীর স্থির ভাবে কোন কাজ করা তাদের স্বভাবে নেই। কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে তারা বিরক্ত বোধ করে। সর্বত্র তাদের পদচারণা লক্ষ্য করা যায়। মোট কথা চঞ্চলতার শেষ সীমায় তারা অবস্থান করে। সব কাজ এই বয়সের শিশুরা স্বাধীনভাবে করতে চায়। এই বয়স হল না ধর্মী বয়স অর্থাৎ অস্বীকার করার বয়স এবং প্রত্যেক কাজে ও কথায় "না" বলা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়। ফলে এই বয়সের শিশুদের মাঝে "না" এর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, শিশুদের এই চঞ্চলতা অনেক পিতামাতা সহ্য করতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠে এবং শিশুদের নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। শিশুদের এই আচরণ পিতামাতার জন্য কষ্টদায়ক বলে অনেকে এই সময়কে সংকটময় সময় বলে উল্লেখ করেছেন।

শিশুদের শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। ভাষা ব্যবহার ধীরে ধীরে তারা রপ্ত করে। দু-বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা অর্থহীন শব্দ এং অঙ্গ-ভঙ্গি অথবা ইশারার সাহায্যে মনের ভাব ও সুবিধা অসুবিধা প্রকাশ করলেও পরবর্তীতে তাদের উচ্চারণে শুদ্ধতা ও স্পষ্টতা এসে যায়। বাক্য গড়নের ক্ষেত্রে তারা প্রতিনিয়ত নতুন শব্দ ব্যবহার করে। তিন বছরের শিশুরা ৪-৫টি শব্দ যোগে বাক্য গঠন করে এবং পরবর্তী সময়ে সাত/আটটি শব্দের সাহায্যে বাক্য গঠন করতে পারে। ৫ বছরের শেষের দিকে শব্দের সংখ্যা ২০০০-২২০০ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাশক্তি স্মৃতিশক্তি, বস্তু নিরীক্ষণ ক্ষমতা, কল্পনা প্রবণতা ইত্যাদি বাড়তে থাকে। এই বয়সে শিশুদের আর ১টি বৈশিষ্ট্য হল অনর্গল কথা বলা ও প্রশ্ন করা। নতুন কোন জিনিস ও খেলনার প্রতি শিশুরা আগ্রহী ও কৌতূহলী হয় এবং ভালভাবে নেড়ে চেড়ে দেখে। তবে শিশুদের মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শিশু নিজের জিনিসপত্র ও খেলনার প্রতি আগ্রহী হয়। রঙিন চক, পেন্সিল, রং ও তুলির সাহায্যে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারে। তবে গঠনমূলক কোন কাজ করতে তখনও তারা অক্ষম থাকে। প্রায় লক্ষ্যহীনভাবে তারা কাজে অগ্রসর হয়।

আত্মকেন্দ্রিকতার ঘোর কাটিয়ে সামাজিক জীবনে প্রবেশ করতে শুরু করে। সেই জন্য সামাজিক জীবনের এই পর্যায়কে "দলপূর্ব" (Pre-gang) সময় বলা হয়। শিশুদের খেলার সাথীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্লক দিয়ে খেলা, বল দিয়ে, খেলা, সমান্তরাল খেলা, পুতুল দিয়ে খেলা ইত্যাদি খেলা তারা সমবয়সীদের সাথে একত্রে খেলে থাকে। ধীরে ধীরে দলীয় খেলার রীতি-নীতি তারা বুঝতে পারে। এবং খেলার নৈপুণ্য দেখিয়ে সমবয়সীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। তাদের মাঝে

অনুকরণ প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। অনেক শিশু আবার ইর্ষা পরায়ণ হয় এবং একাকী খেলতে পছন্দ করে। সামান্য কারণে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ও মনমালিন্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যের জিনিসপত্র কেড়ে নেয়া, ধাক্কা দেয়া ইত্যাদি আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

ভাবাবেগ শিশুদের অতি প্রকট ও ক্ষণস্থায়ী হয়। শিশুদের স্বাধীনভাবে কোন কাজে বাধা প্রদান করলে চিৎকার করা। হাত পা ছোড়া ইত্যাদি আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে শেষের দিকে আবেগে কিছুটা স্থিতিশীলতা আসে এবং নিজেকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাদের মেজাজ-মর্জি কিছুটা নমনীয় ও বিনয়ীভাব লক্ষ্য করা যায়। বন্ধু বান্ধবের সাথে সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণও লক্ষ্য করা যায়। ন্যায় অন্যায় সর্ম্পকে ধারণার উদ্ভব হতে থাকে শারীরিক ও মানসিক স্থিতিশীলতার সাথে সাথে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে পড়ালেখা শুরু করে। ক্রমে ক্রমে শিশুরা বুঝতে শেখে খেলাধুলার সাথে সাথে আর ১টি নতুন বিষয় তাকে আয়ত্ব করতে হবে। শিশু দেখে তাকে বই খাতা নিয়ে নিয়মিত পড়ালেখার জন্য বসানো হচ্ছে। এতে তার মনের নতুন ১টি স্তরের বিকাশ ঘটে। তবে শিশুদের এই নতুন স্তরের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন অফুরন্ত ধৈর্য আর ভালবাসা। এভাবে তাদের সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিশুদের সামাজিক বোধ বিশেষ করে দলপ্রীতি ও বন্ধুপ্রীতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

সারাংশ

প্রাক্‌বিদ্যালয় সময় হল ২-৫/৬ বছর। এই সময় শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শিশুকালের তুলনায় এই বয়সের শিশুদের আচরণে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তারা পরনির্ভরশীল থেকে নির্ভরশীল হতে থাকে। তাদের কথা, আচার-আচরণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই বয়সের শিশুরা অতিমাত্রায় চঞ্চল থাকলেও শেষের দিকে তাদের চঞ্চলতা কমতে থাকে এবং শিশুরা পড়াশুনায় মনোযোগী হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রাক্ বিদ্যালয় সময় হল

ক. ২-৫/৬ বছর খ. ১-৫/৬ বছর

গ. ১ $\frac{১}{২}$ -৫/৬ বছর ঘ. ৫-৬ বছর

২। প্রাক্‌বিদ্যালয় সময়কে (Pre-school) সময় বলা হয় কেন?

ক. আনুষ্ঠানিকভাবে পড়ালেখা শুরু করে বলে খ. খেলাধুলোয় মনোনিবেশ করে

গ. বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে বলে ঘ. সামাজিক জীবনে প্রবেশ করতে শুরু করে বলে

৩। শিশুদের দুধ দাঁত পড়তে আরম্ভ করে কোন বয়সে?

ক. ৩ বছর বয়সে খ. ৫/৬ বয়সে

গ. ৪ বছর বয়সে ঘ. ৯/১০ বয়সে

৪। ৫ বছর বয়সের শেষের দিকে জ্ঞাত শব্দ সংখ্যা কত হয়?

ক. ৫০০-৭০০ টি খ. ১০০০-১২০০ টি

গ. ২০০০-২২০০ টি ঘ. ১৫০০-১৭০০ টি

পাঠ- ৩.৬ ঃ প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুর বিকাশমূলক কাজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুদের বিকাশমূলক কাজগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুদের বিকাশমূলক কাজগুলো জেনে, সমস্যা থাকলে তাকে সাহায্য করতে পারবেন

একটি শিশু যখন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে তখন শিশুটি অসহায় এবং পরনির্ভরশীল থাকে। ধীরে ধীরে শিশুর বয়স বাড়তে থাকে সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। শিশু বড় হয়ে ওঠার সময় প্রতিনিয়ত তার দেহের ওজন ও উচ্চতার বৃদ্ধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি, তার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, আচার আচরণ, বাচনভঙ্গির পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনগুলো নির্দিষ্ট সময় লক্ষ্য করা যায়; যেমন- শিশুরা ৫/৬ মাস বয়সে অন্যের সাহায্যে বসতে পারে, ৮ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, ১০/১১ মাসে ধরে ধরে হাঁটা এবং ১৫ মাসে স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিশুর দেহ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজনে বাড়েনি, সঙ্গে সঙ্গে তার গুণগত মানের পরিবর্তন হচ্ছে বা শিশুরা ধাপে ধাপে কিছু কিছু পারদর্শিতা অর্জন বা নৈপুণ্য অর্জন করছে। শিশুর ধাপে ধাপে এই নৈপুণ্য অর্জন করা হল বিকাশমূলক কাজের লক্ষণ। শিশু ধাপে ধাপে এই নৈপুণ্য অর্জন বা ক্ষমতা অর্জন না করতে পারলে, পরবর্তী ধাপে উপযুক্ত আচরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব একটা স্বকীয়তা আছে। তাই শিশুদের ক্রমঃবিকাশে কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। নিচে প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুদের কিছু বিকাশমূলক কাজ আলোচনা করা হল-

১। দক্ষতার সাথে হাঁটতে শেখা

স্বাধীনভাবে হাঁটতে শেখার ক্ষমতা শিশুদের মাঝে হঠাৎ করে হয় না। এই দক্ষতা অর্জনও ধীরে ধীরে শিশুরা আয়ত্ব করে। সাধারণত ৯/১০ মাসে শিশুরা অন্যের সাহায্যে এবং ১২-১৫ মাসে স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারে, ২ বছর বয়সে শিশুর হাঁটা ও চলাফেরার মধ্যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এভাবে ৩/৪ বৎসরের শিশু সূক্ষ্ম সঞ্চালনে পারদর্শি হয় এবং শিশুরা স্বাধীনভাবে দৌড়ানো, লাফানো, তিনচাকার সাইকেল চালানো এবং চলা-ফেরার গতি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অর্থাৎ প্রাক্‌বিদ্যালয় বয়সে শিশুরা দক্ষতার সাথে হাঁটার ক্ষমতা অর্জন করে থাকে।

২। শিশুর শক্ত খাদ্য গ্রহণ

শিশু জন্মের পর মাতৃদুগ্ধ অথবা তরল জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থাৎ ৪/৫ মাস বয়স থেকে বাড়তি খাদ্য বা পরিপূরক খাদ্য দিতে হয়। ক্রমান্বয়ে এই পরিপূরক খাদ্য পাতলা থেকে ঘন এবং পরিমাণে বাড়ানো হয়। কারণ অবুঝ শিশুটির পরিপাকযন্ত্র এবং পরিপাক প্রণালী ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং শিশু শক্ত খাদ্য গ্রহণ ও হজম করতে পারে। তবে শিশুদের পরিপূরক খাদ্য দেওয়ার আগে যথেষ্ট সর্তকর্তা অবলম্বন করা উচিত। কারণ পরিপূরক খাদ্য পুষ্টিকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হলে এবং একঘেয়েমি হয়ে গেলে শিশুদের জন্য ভাল ফলাফল বয়ে আনবে না।

৩। কথা বলা শিক্ষণ

শিশুর জীবনের প্রথম ধ্বনি হচ্ছে কান্না। ধীরে ধীরে শিশুর এই কান্না উদ্দেশ্যমূলক হয়। অল্প সময় ব্যবধানে শিশুরা কিছু কিছু বর্ণ উচ্চারণ করে থাকে। যেমন অ, আ, প, ফ, ব ইত্যাদি। ৭-৮ মাস বয়সে শিশু কিছু অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করে এবং পুনরাবৃত্তি করে থাকে। ১২/১৩ মাসে শিশুরা নিজের চাহিদা প্রকাশ করার মত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে।

৪। মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ

মলমূত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও শিশুরা ধীরে ধীরে আয়ত্ব করে। অধিকাংশ শিশুরা ৩ বছর বয়সে সঠিক সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে পারে। সাধারণত ৪ বছরের শিশুরা রাতের বেলায় বিছানা ভেজায় না। পিতামাতাও শিশুদের সেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তবে ৫ বছরের পরেও যদি কোন শিশু নিয়মিত রাতে বিছানা ভেজায়, তবে তাকে শাস্তি অথবা বকাবকি না করে ডাক্তার দেখানো উচিত।

৫। ছেলে-মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ

ক্রমান্বয়ে শিশু তার পরিবার, পরিজন ও পরিবেশের সাথে পরিচিত হয় এবং সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে শেখে। সঞ্চালন মূলক বিকাশের দিক দিয়ে ছেলে শিশুরা সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে যায়। ছেলেরা যতই বড় হয়, ততই শক্তি, বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কলাকৌশলে পারদর্শি হয়। শিশুরা বুঝতে শেখে পিতামাতার আচরণের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; যেমন-

মেয়ে শিশুর খেলনা (পুতুল) পোশাক, গল্প বলা এবং ছেলে শিশুর খেলনা (গাড়ি), পোশাক, গল্পের (দুঃসাহসিক গল্প) মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান এবং পিতামাতাও সেভাবে উৎসাহিত করে। পিতামাতা ছেলে শিশুর কাছ থেকে ছেলেসুলভ আচরণ এবং মেয়ে শিশুর কাছ থেকে মেয়েসুলভ আচরণ আশা করে। ফলে ছেলে-মেয়ে পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা তাদের স্পষ্ট হতে থাকে।

৬। আনুষ্ঠানিকভাবে পড়াশুনা শুরু করে

৫/৬ বছর বয়সে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্থিতিশীলতা আসে এবং শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে পড়ালেখা শুরা করে। শিশু বুঝতে পারে পিতামাতা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে পড়ালেখার জন্য উৎসাহিত করে থাকে। পিতামাতা যদি এই সময়ে শিশুদের সঠিকভাবে নিদের্শনা ও পরিচালনা করতে পারে, তাহলে শিশুরা সফলভাবে লেখা-পড়া আয়ত্ব করতে পারে। যদিও একথা স্মরণ রাখা দরকার সব শিশুদের মেধা, শারীরিক গঠন ও শিক্ষণ ক্ষমতা এক নয়।

৭। ন্যায়-অন্যায় এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ

শিশুদের ভাল কাজ, ভাল আচরণের জন্য পিতামাতা উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করে থাকেন। অপরপক্ষে মন্দ কাজ ও খারাপ আচরণের জন্য তিরষ্কার ও দৈহিক শাস্তি দিয়ে থাকেন। ফলে শিশুরা ন্যায়-অন্যায় মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারে।

৮। বিবেকের বিকাশ শুরু হয়

প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুদের বিবেকের বিকাশ তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তারা ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারলেও আত্মগ্লানি তাদের তেমন হয় না। এর পরিবর্তে ভুল কাজ বা পিতামাতার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে শাস্তির ভয়ে ভীত হয়। এছাড়াও ভাল কাজের প্রতি বড়দের উৎসাহ, অনুপ্রেরণায় শিশুরা উৎসাহিত হয় এভাবে ন্যায়-অন্যায়, ভুল-শুদ্ধ সম্বন্ধে তারা যে জ্ঞান অর্জন করে, তারই আলোকে তারা বিবেক গঠন করে।

৯। বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা হয়

শিশুদের শারীরিক বিকাশ ও স্থিতিশীলতার সাথে সাথে মানসিক বিকাশের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। তার আশে-পাশের জীব-জগৎ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে এবং চারপাশের পরিচিত বস্তুর নামও সে শেখে। পরিবেশ পরিস্থিতি তারা বুঝতে পারে।

১০। নৈপুণ্য অর্জন

প্রাকবিদ্যালয়গামী সময় শিশুদের নৈপুণ্য অর্জন করার উপযুক্ত সময়। কোন কাজ তারা যতক্ষণ সঠিকভাবে করতে না পারে, ততক্ষণ তারা চেষ্টা করে বা পুনরাবৃত্তি করে থাকে। এ থেকে শিশুরা যেমন আনন্দ উপভোগ করে, তেমনি কোন কাজের কলাকৌশল তারা রপ্ত করে। তাদের শারীরিক ও স্নায়ুবিক স্থিতিশীলতা ও কৌতূহলের কারণে প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুরা হাত দিয়ে সঠিক ভাবে বল ছুড়ে মারা, নিজের জামা-কাপড় খুলতে পারা, দ্রুত দৌড়ানো, এক-পা, দু-পায়ে লাফানো, তিনচাকার রিক্‌সা চালানো, বৃত্ত আঁকা, পেন্সিল দিয়ে রং করা ইত্যাদি কাজ তারা নৈপুণ্যের সাথে করতে পারে। ছেলে এবং মেয়ে শিশুর নৈপুণ্য অর্জনে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ছেলেরা বল খেলা, সাইকেল চালানো, অপরপক্ষে মেয়ে শিশুরা পুতুলখেলা, গৃহ পরিচালনার কলাকৌশলে পারদর্শিতা অর্জন করে থাকে এবং পিতামাতাও সেভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকে।

৩-৫/৬ বছর বয়স শিশুদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় যেমন শিশুদের জন্য শিক্ষার সময়, স্বাবলম্বি হওয়ার সময়, তেমনিভাবে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার সময়। তবে শিশুর পরিবেশের উপর তার বিকাশের মাত্রা অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। প্রথমে তারা তাদের পিতামাতার আচরণ অনুকরণ করতে থাকে। কাজেই এই বয়সের শিশুদের সামনে এমন কোন আচরণ করা উচিত নয় যা তাদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলবে।

আবার খেলাধুলা যে নিছক আনন্দের উৎস নয় এটা অধিকাংশ পিতামাতাই উপলব্ধি করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই খেলার মধ্যে দিয়েই শিশুদের মনের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়। শিশুদের স্বাভাবিক ইচ্ছাগুলো সঠিক পথে পরিচালিত করে তাকে তার ইচ্ছামত জিনিস তৈরি করতে দেওয়া উচিত, যাতে তার কল্পনা শক্তি বিকশিত হতে পারে।

শিশুকে সুশৃঙ্খল হতে শেখানো মানে সব সময় বকাবকি করা এবং শাস্তি দেওয়া নয়। শিশুদের আচার-আচরণ, দৈনন্দিন চলাফেরা গ্রহণযোগ্য হয় সেই নির্দেশনা দেওয়া। এক্ষেত্রে শিশুর কৌতূহল, চঞ্চলতা অনুকরণ প্রবণতাকে সঠিক কাজে

লাগিয়ে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের পথ সুন্দর এবং গঠনমূলক করা। পিতামাতার স্মরণ করা উচিত, প্রত্যেক শিশুর শেখার ক্ষমতা এক নয়। পিতামাতা যেমন চায় তাদের সন্তান সুন্দর হয়ে মানুষ হোক, তেমনিভাবে শিশুরাও চায় পিতামাতার স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা এবং নিরাপত্তা। সেখানে শিশুরা পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সাথে তাদের আগামী দিনের চলার পথ সুন্দর থেকে সুন্দরতর করতে পারে।

সারাংশ

বিকাশমূলক কাজ হচ্ছে ধাপে ধাপে শিশুদের নৈপুণ্য অর্জন; যেমন- ৫/৬ মাস বয়সে অন্যের সাহায্যে বসা, ৮ মাসে হামাগুঁড়ি দেওয়া এবং ১০/১১ মাসে ধরে ধরে হাঁটা। অর্থাৎ অন্যের সাহায্যে বসা থেকে ধাপে ধাপে ধরে দাঁড়ানো এবং হাঁটা। তবে শিশুর পরিবেশের উপর তার বিকাশের মাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রাকবিদ্যালয়গামী শিশুদের যে বিকাশমূলক কাজগুলো লক্ষ্য করা যায় তা হল - দক্ষতার সাথে হাঁটা, শক্ত খাদ্য গ্রহণ, কথা বলা শিক্ষণ, মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ ছেলে-মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ পড়ালেখার জন্য প্রস্তুত হওয়া ন্যায়-অন্যায় মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, বিবেকের বিকাশ, বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিকাশমূলক কাজ কোনটি?

ক. কথা বলা শিক্ষণ   গ. ওজনে বাড়া
খ. উচ্চতায় বাড়া   ঘ. আয়তনে বাড়া

২। শিশুরা নিজের চাহিদা প্রকাশ করার মত শব্দ উচ্চারণ করে কত মাস বয়সে?

ক. ৭-৮ মাসে   গ. ১২-১৩ মাসে
গ. ৪-৫ মাসে   ঘ. ৬-৭ মাসে

৩। প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুরা নিচের কোন্ কাজটি করে?

ক. আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া শুরু করে   খ. লেখাপড়া বন্ধ করে
গ. সব সময় সমবয়সীদের সাথে ঝগড়া করে   ঘ. সব সময় অসামাজিক আচরণ করে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রাকবিদ্যালয়গামী শিশুদের বিকাশমূলক কাজগুলো আলোচনা করুন।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ৩

অনুশীলনী- ৩.১	ঃ	১। ঘ	২। ক	৩। খ	৪। খ	৫। গ
অনুশীলনী- ৩.২	ঃ	১। খ	২। গ	৩। ক		
অনুশীলনী- ৩.৩	ঃ	১। খ	২। ক	৩। খ		
অনুশীলনী- ৩.৪	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ক		
অনুশীলনী- ৩.৫	ঃ	১। ক	২। ক	৩। খ	৪। গ	
অনুশীলনী- ৩.৬	ঃ	১। ক	২। খ	৩। ক		

ইউনিট ৪

শিশুর খেলাধুলা ও খেলার সরঞ্জাম

ভূমিকা

শিশুর জীবনে খেলার গুরুত্ব অপরিসীম। খেলার মাধ্যমে ছোট শিশুটির শারীরিক বর্ধন ও মানসিক বিকাশ প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়। খেলা যেমন শিশুকে অফুরন্ত, নির্মল আনন্দ দেয়, তেমনি তার কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা, দক্ষতা ইত্যাদি গুণাবলী বিকশিত করে। এছাড়া খেলাধুলা শিশু কিশোরদের দৈহিকভাবেও সুগঠিত হতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, খেলার মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং সামাজিকতাবোধ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলা একটি অপরিহার্য অংশ।
এই ইউনিটে আমরা শিশুর বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও খেলার উপকরণসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে তিনটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ- ৪.১ ঃ খেলার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
পাঠ- ৪.২ ঃ সার্বিক বিকাশে খেলার প্রয়োজনীয়তা
পাঠ- ৪.৩ ঃ খেলার সরঞ্জাম নির্বাচনের নীতি

পাঠ- ৪.১ ঃ খেলার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ খেলার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- ♦ খেলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- ♦ সক্রিয় খেলার নমুনা উপলব্ধি করতে পারবেন
- ♦ বয়সোপযোগী খেলার বিবরণ দিতে পারবেন
- ♦ খেলার বিভিন্ন প্রকারভেদ অন্যকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন

খেলা হচ্ছে শিশুর আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পথ। যে কাজ করে শিশু আনন্দ পায় সেটাই হল খেলা। শিশুর খেলা হয় অবাধ অনিয়ন্ত্রিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। যাকে সাধারণভাবে বলা হয় আমোদ প্রমোদ দিয়ে মনোরঞ্জন করা।

খেলাকে সাধারণত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, সক্রিয় খেলা ও নিষ্ক্রিয় খেলা। সক্রিয় খেলায় খেলোয়াড় যা করে তা থেকে আনন্দ পায় অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় খেলায় অন্যেরা যা করে তা থেকে মজা পাওয়া যায়। ২ থেকে ৫ বছরের শিশুরা অনধিকৃত খেলা, একাকী খেলা, অন্যের খেলা দেখা, সমান্তরাল খেলা, সহযোগী খেলা ও সমবায়ী খেলা খেলে থাকে।

খেলার সংজ্ঞা

খেলা হচ্ছে এমন কাজ যা থেকে ব্যক্তি খাটুনীর বদলে আনন্দ পায়। অর্থাৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ করা যা অনাবিল আনন্দ দেয় এবং আনন্দলাভের জন্যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করে।

এভাবেও বলা যায়- খেলা হচ্ছে এমন কাজ যা বাইরের কোন চাপ প্রয়োগ ব্যতীত আমোদ, আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের জন্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

শিশুর জীবনের অতি সাধারণ এবং মজার কাজই হল খেলা। খেলা এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতি যা শিশু খেলতে খেলতেই শেখে।

কাজ এবং খেলার মধ্যে পার্থক্য হল- কাজের উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু খেলার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যেহেতু শিশুরা খুব চঞ্চল, সেহেতু তাদের সব খেলাই অর্ধসমাপ্ত এবং শিশুরা দ্রুত একটি খেলা থেকে অন্য খেলায় যায় বলে মনোযোগ দিতে পারে না।

খেলার বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন বয়সের খেলার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। শিশুর খেলা সরল থেকে জটিল হয়। ছোট শিশুরা একাই খেলতে চায়। তাদের খেলা হলো কোন কিছু ঠেলা, টানাটানি করা, শব্দ করে খেলনা ফেলে দেয়া, দুধের বোতলের দিকে তাকিয়ে মজা পাওয়া ইত্যাদি। তাদের খেলা স্বত:স্ফূর্ত ও অনিয়ন্ত্রিত।

ইন্দ্রিয় ও অঙ্গের সমন্বয়তা হলে শিশু নিজের পায়ের আঙ্গুল মুখে দেয়, নাভিতে আঙ্গুল দেয়, হাতের কাছে যা পায় মুখে দেয়।

২ বছর বয়স থেকে শিশু কল্পনাপ্রবণ হয়, খেলনাকে জীবন্ত মনে করে এবং খেলনার সাথে কথা বলে।

৩ বছরের শিশু খেলনা সামগ্রী দিয়ে কোন ব্লক তৈরি করতে চায়। একই ব্লক দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে।

৪ বছরের শিশু বিভিন্ন বাঁধা নিয়ে খেলার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই খেলে।

৫ বছরের শিশু ছবি আঁকে, কাগজ দিয়ে নৌকা বানায়, ব্লক দিয়ে বাড়ি, গাড়ি বানাতে পারে।

৬ বছরের শিশুদের মধ্যে দক্ষতা অর্জনকারী খেলা খেলতে দেখা যায়। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলা, দলীয় খেলা ও নিয়মতান্ত্রিক খেলা দেখা যায়। সেসময় শিশু নেচে নেচে গান গায়, ছড়া বলে এবং কবিতা পড়ে। পরীক্ষামূলক ও সন্ধানমূলক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

লিঙ্গ ভেদে খেলার তফাৎ হয় যেমন ছেলেরা ফুটবল খেলে, পিস্তল ছোড়ে, পাইলট সাজে, ড্রাইভার সাজে অন্যদিকে মেয়েরা মায়ের মত শিশু লালন-পালন, রান্নাবান্না ইত্যাদি খেলা খেলে থাকে।

খেলার প্রকারভেদ

খেলাকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন- **(১) সক্রিয় খেলা ও (২) নিষ্ক্রিয় খেলা**। সক্রিয় খেলা বলতে শিশু যখন কোন খেলনা দিয়ে খেলে বা কোন কাজ করে আনন্দ পায় অর্থাৎ এখানে শিশু নিজেই খেলায় ব্যস্ত; যেমন- আবিষ্কারমূলক, গঠনমূলক, নাটকীয় এবং পরিবার ও প্রতিবেশীদের সাথে খেলা।

নিষ্ক্রিয় খেলা হল শিশু যখন কোন কিছু থেকে আনন্দ পায়; যেমন- অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা, ছবি দেখা, গল্প শোনা, কমিক বা কার্টুন দেখা, গান শোনা, টেলিভিশন দেখা ইত্যাদি। এখানে শিশু যখন ক্লান্ত থাকে এবং সক্রিয় খেলা খেলতে চায়না তখন অন্যের খেলা দেখে অথবা অন্যের কাছ থেকে গল্প বা গান শুনে আনন্দ পায়।

আবার খেলার স্থান অনুযায়ীও খেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন-

(১) **বহিরাঙ্গণ খেলা ঃ** খোলা পরিবেশে যে খেলা হয়। সাইকেল চালানো, দোলনায় দোল খাওয়া, দড়ি লাফানো, স্লাইডে চড়া, খেলনা ট্রেনে চড়া, বালি দিয়ে খেলা ইত্যাদি।

(২) **অভ্যন্তরীণ খেলা ঃ** বাড়ির কক্ষের ভিতর যে খেলা হয়; যেমন- ব্লক দিয়ে বাড়ি বানানো, ছবি আঁকা, ছবি দেখা, পুতুল খেলা ইত্যাদি।

খেলার মাধ্যমে শিশুর অতৃপ্ত ইচ্ছার তৃপ্তি ঘটে। শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে দু ধরনের খেলারই প্রয়োজন আছে।

সক্রিয় খেলা

(১) **আবিষ্কারমূলক খেলা ঃ** ছোট শিশুরা খেলনা ভেঙ্গে, কামড়িয়ে, আঁচড়িয়ে, দুমড়ে মুচড়ে এবং খুঁটিয়ে দেখে। খেলনা নেড়েচেড়ে কোন শব্দ হয় কিনা দেখে। এতে শিশুর সব কয়টি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে, আনন্দ পায় এবং জ্ঞান অর্জন করে।

(২) **গঠনমূলক খেলা ঃ** শিশুরা যতই বড় হয় ততই তারা বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বের করতে পারে এবং গঠনমূলক খেলায় মনোযোগ দেয়। ৫ বছরের শিশু গঠনমূলক খেলায় অংশগ্রহণ করে। ছেলেরা ইটের পর ইট সাজিয়ে অথবা ব্লক দিয়ে বিভিন্ন জিনিস গড়তে পারে। বালি দিয়ে বাড়ি তৈরি করে, কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন বস্তু তৈরি করে। ছবি এঁকে তাদের সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়। মেয়েরা পুতুলের জামা তৈরি করে, মালা গাঁথে, রান্নাবান্নার সরঞ্জামের প্রতি আগ্রহ দেখায়। এতে শিশুর আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং জ্ঞান অর্জন করে।

(৩) **নাটকীয় খেলা বা কাল্পনিক খেলা ঃ** তিন বছর বয়সের আগে শিশুরা নিজেরা অন্যের ভূমিকায় সাজে ও কথা বলে, এবং তাদের মত কাজ করতে পছন্দ করে। শিশু পুতুলকে রোগী বানিয়ে চিকিৎসা করে। নতুন ভাই বোনের আগমনে পুতুলকে নতুন শিশু ভেবে মায়ের মত সেবা যত্ন করে। খেলতে খেলতে শিশু পুতুলকে মারে এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে। এতে মানসিক শান্তি পায়। শিশুরা ফেরিওয়ালা সাজে, মায়ের মত করে ঘর ঝাড়ু দেয়, বিছানা করে, রান্না করে। আবার দল বেধে খেলে। এতে ভাষার বিকাশ হয়, শিশু সামাজিক হয়।

পারিবারিক খেলা ঃ দুই বছরের আগে শিশুরা পরিবারের সদস্যদের সাথে সহজ খেলা খেলে। এখানে প্রতিটি খেলায় একজনের সাথে খেলে এবং একজনের পর আর একজন খেলে। এধরনের খেলা হলো "আমার হাতে কি আছে বলত?" অথবা "বিড়ালটি বাজার করতে গিয়েছে।"

প্রথম শৈশবে আরও বেশি সদস্যদের সাথে খেলে; যেমন- বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী অথবা এসময় তাদের পাশে যারা থাকে। এগুলো সাধারণত অভ্যন্তরীণ খেলা। আবহাওয়া ভাল থাকলে এরা বাইরেও খেলতে পারে। অভ্যন্তরীণ খেলার মধ্যে ধাঁধাঁ, মিউজিকেল চেয়ার, লুকানো জিনিস খুঁজে বের করা। বহিরাঙ্গণ খেলা হলো দৌড়ানো, পালানো, লুকিয়ে থাকা এবং খুঁজে বের করা।

প্রতিবেশিদের সাথে খেলা ঃ চার-পাঁচ বছরের শিশুরা পারিবারিক খেলা খেলতে পছন্দ করে না। তারা তাদের সমবয়সীদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। এখানে অনেক প্রতিযোগিতা। এখানে দুই এর বেশি সমবয়সী থাকে এমনকি এরা দলগতভাবে খেলে - যেমন মূর্তি সাজা, নেতাকে অনুসরণ করা, লুকানো খেলা ইত্যাদি।

শিশু যতই বড় হয় ততই বড়দের অনুসরণ করে। তাদের খেলা হয়- বেস বল, ফুটবল, বাস্কেট বল ইত্যাদি।

স্বাধীন ও অনিয়ন্ত্রিত খেলা ঃ এ ধরনের খেলায় শিশু কোন নিয়ম মেনে চলে না। শিশু একাই খেলে। সাধারণত ২ বছর ৬ মাস বয়সের শিশুরা এ ধরনের খেলা খেলে থাকে। যেহেতু বড়দের হস্তক্ষেপ থাকে না সে জন্যে শিশু নিজের খেয়াল খুশী মত যখন ইচ্ছা তখন খেলে। ৩ বছর বয়স হলেই শিশুরা তার নিজস্ব পছন্দমত জিনিস সংগ্রহ করতে পছন্দ করে। সংগ্রহের প্রবণতা মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা দেয়। ছেলেরা খেলনা গাড়ি, গাড়ির ভাঙ্গা অংশ, মার্বেল, পয়সা, ডাকটিকেট, পেন্সিল

ইত্যাদি সংগ্রহ করে। অন্যদিকে মেয়েরা পুতুল, পুঁথির মালা, কলম, ছবি, গহনা, ডেকচি, পাতিল ও রান্নার সরঞ্জাম সংগ্রহ করে।

অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা ঃ শিশু খেলনার প্রতি মনোযোগ দেয়ার আগ পর্যন্ত এ ধরনের খেলা খেলে। হাত পা ছোড়াছুড়ি, আঙ্গুল মুখে দেয়া, নিজের দুধের বোতল ধরে রাখা, ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে তাকান ইত্যাদি। এতে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়ে ফলে ভাল ব্যায়াম হয়, রক্ত চলাচল হয়, মাংসপেশী সতেজ ও সবল হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দৌড় ঝাপ, সাইকেল চড়া, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা, সক্রিয় সংঘবদ্ধ খেলা যেমন ফুটবল, ভলিবল ইত্যাদি খেলে।

বই পড়া ঃ ২ বছর বয়স থেকেই শিশুর বই এর প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। উজ্জল বড় আকার তাদের আকৃষ্ট করে। ছবি দেখিয়ে গল্প শোনালে মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং গল্পের পাঠকের অঙ্গভঙ্গি ও গলার স্বর পছন্দ করে।

ছবি আঁকা ঃ ছবি আঁকার মাধ্যমে শিশুর সৃজনশীলতা বেড়ে যায়, পেশী সঞ্চালন সুসমন্বিত হয় এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। শিশু প্রথমে হিজিবিজি আঁকে। পরবর্তীতে ছবির বিষয়বস্তু মোটামুটি চেনা যায়। যে জিনিস থেকে তার আগ্রহ বাড়ে সে ধরনের ছবি আঁকতে চায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছবির সূক্ষ্ম অংশগুলো বোঝা যায়। ছেলেরা গাড়ি, প্লেন পিস্তল ইত্যাদি আঁকে, অন্যদিকে মেয়েরা ফুল, মানুষ, গাছ ইত্যাদি আঁকতে পছন্দ করে।

নিষ্ক্রিয় খেলা

ছবি দেখা ঃ ছোট শিশু বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত উজ্জল রংয়ের ছবি দেখে আনন্দ পায়। টেলিভিশন দেখে, ছবি দেখে শিশুরা বস্তুর অর্থ খুঁজে পায়। দেখার সময় বিভিন্ন প্রশ্ন করে ছবির অর্থ বোঝে। খবরের কাগজের ছবি, বিভিন্ন ম্যাগাজিন, টেলিভিশনে বিভিন্ন এ্যাড দেখে আনন্দিত হয়। জন্তু, জানোয়ার কিংবা পশুপাখির ছবির বই শিশু পছন্দ করে। সঙ্গীতের প্রতি শিশুর আকর্ষণ বাড়ে। গান বাজনা সে মনোযোগ দিয়ে শোনে। একই সাথে হাত পা নেড়ে সে বিভিন্নভাবে নাচে। বড় শিশুরা কার্টুন ছবি দেখতে পছন্দ করে।

গান শোনা ঃ গানের সুর এবং ছন্দ যদি শ্রুতিমধুর হয় তাহলে অনেকসময় শিশু নিজেই গাইতে থাকে। একই সুর তারা বার বার শুনতে পছন্দ করে এবং আনন্দ লাভ করে। ছন্দবহুল গান শিশুরা পছন্দ করে।

গল্প শোনা ঃ সহজ, সরল এবং প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত গল্প শিশুরা পুরোপুরি উপভোগ করে। পছন্দনীয় গল্প শিশু বার বার শুনতে চায়। শিশুরা ছন্দমূলক ছবি ও কবিতা পছন্দ করে এবং তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে। অনেক সময় সাধারণ গল্প বক্তার উপস্থাপনার কারণে পছন্দ ও অপছন্দ নির্ভর করে। একবার গল্প পছন্দ করলে বার বার শুনতে চায়। অবাস্তব এবং রূপকথার গল্প তাদের মন ছুঁয়ে যায়। যেসব গল্প শিশুদের মন ছুঁয়ে যায় সেগুলো হলঃ

পারিবারিক জীবনের উপর গল্প, স্কুল জীবনের গল্প, শিশুদের বিষয়ে গল্প, যাদের চিনে যেমন ডাক পিয়ন অথবা পুলিশ অফিসার এবং তাদের পেশা, সব ধরনের পশুপাখি, শিশুকে গল্পের প্রধান চরিত্র করলে, বাপ মা, দাদা-দাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে গল্প, পাঁচ বছরের শিশুরা পরীর গল্প, অবাস্তব গল্প, সামান্য অংশের গল্প, ছবিসহ অন্য দেশের লোকজন, তাদের জীবনযাপন, ইত্যাদি প্রথম শৈশবের থেকে দুঃসাহসিক গল্প পছন্দ করে।

অন্যকে দেখে আনন্দ পাওয়া ঃ শিশু অন্যদের খেলা দেখে অথবা তাদেরকে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে দেখে আনন্দ পায়। বাড়িতে কাজের লোক যেসব কাজ করে সেগুলোও শিশুদেরকে ব্যস্ত রাখে। বাড়িতে পোষা জন্তুর সাথে শিশু ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারে। শিশুকালে চিড়িয়াখানা পরিদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এতে শিশু বইয়ের ছবির সাথে মিল দেখে আনন্দ লাভ করে। অনেক সময় শিশু তার অজানা খেলা বা নতুন ধরনের খেলা অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে। এতে শিশু যেমন ব্যস্ত থাকে তেমনি উপভোগ করে এবং সামাজিক হয়।

কমিক বই অথবা কার্টুন দেখা ঃ কার্টুন কমিকের রং থাকে উজ্জল এবং আঁকা ছবি থাকে সহজ এতে বুঝতে সহজ হয়। কেউ যদি পড়ে বুঝিয়ে দেয় তাতে শিশু আনন্দিত হয়। অবাস্তব গল্প হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। বাবা মাকে সতর্ক হতে হবে কারণ অনেক সময় ভয়ের ছবি দেখে শিশুর আনন্দের চেয়ে ভয় বেশি পায়।

টেলিভিশন দেখা ঃ উপযোগী প্রোগ্রাম হলে টেলিভিশন হতে পারে শিক্ষা, বিশ্রাম এবং আমোদ প্রমোদের মাধ্যম। ভয়ের ছবি দেখলে দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে এবং ঘুমের সমস্যা হবে। মারামারি, খুনখারাবির ছবি শিশুদেরকে দেখতে দেয়া উচিত নয়।

সারাংশ
বাইরের কোন চাপ ছাড়া আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে যে কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা হয় তাই খেলা। বিভিন্ন বয়সে খেলার বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। খেলাকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন সক্রিয় খেলা ও নিষ্ক্রিয় খেলা। যে কাজে শিশু নিজে জড়িত সেটা হল সক্রিয় খেলা এবং অন্যদিকে কোন কাজ না করে কোন বস্তু থেকে যখন আনন্দ পাওয়া যায় তা হলো নিষ্ক্রিয় খেলা। শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে দুই ধরনের খেলারই প্রয়োজন আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খেলা বলতে কি বোঝায়?
ক. আনন্দদায়ক কাজ
খ. যে কাজের উদ্দেশ্য থাকে
গ. যে কাজে চাপ প্রয়োগ করা হয়
ঘ. অনুশীলনের ফল

২। দুই বছর বয়সে শিশু খেলনাকে কি করে?
ক. কামড় দিয়ে পরীক্ষা করে
খ. জীবন্ত মনে করে
গ. ভেঙ্গে পরীক্ষা করে
ঘ. ভয় পায়

৩। সক্রিয় খেলা কি?
ক. অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা
খ. ছবি দেখা
গ. গল্প শোনা
ঘ. গঠনমূলক খেলা

৪। বহিরাঙ্গণ খেলা কোনটি?
ক. ব্লক দিয়ে বাড়ি বানানো
খ. ছবি আঁকা
গ. পুতুল খেলা
ঘ. সাইকেল চালানো

৫। কাল্পনিক খেলা বলতে কি বোঝায়?
ক. কাদামাটি দিয়ে খেলা
খ. বাড়ি তৈরি করা
গ. ছঁবি আকা
ঘ. ফেরিওয়ালা সাজা

৬। অনিয়ন্ত্রিত খেলা কি?
ক. খেয়াল খুশীমত খেলা
খ. ডাকটিকিট সংগ্রহ করা
গ. ছবি সংগ্রহ করা
ঘ. পুতুল খেলা

৭। নিষ্ক্রিয় খেলা বলতে কি বোঝায়?
ক. সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা
খ. বই পড়া
গ. ছবি দেখা
ঘ. ছবি আঁকা

৮। কোন ধরনের গল্প শিশুরা পছন্দ করে?
ক. বিজ্ঞানভিত্তিক
খ. ভ্রমণের গল্প
গ. শিশুদের বিষয়ে গল্প
ঘ. ভালবাসার গল্প

৯। শিশুরা কমিক পছন্দ করে কেন?
ক. আমোদ প্রমোদের মাধ্যম
খ. আঁকা ছবি বুঝতে সহজ
গ. পড়তে হয় না
ঘ. ছবির রং উজ্জ্বল হয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খেলার সংজ্ঞা দিন? বয়সোপযোগী খেলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. খেলা কত প্রকার? সক্রিয় খেলার ব্যাখ্যা দিন।
৩. পারিবারিক খেলা বলতে কি বোঝায়? নিষ্ক্রিয় খেলা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ- ৪.২ ঃ সার্বিক বিকাশে খেলার প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খেলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা কিভাবে বজায় থাকে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- কীভাবে শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে খেলার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন
- শিশুর খেলা পরিচালনা করতে পারবেন

খেলা সময় নষ্ট করা নয়। এমনকি ছোট শিশুদের ব্যস্ত রাখারও কোন উপায় নয় অথবা বাবা-মা যখন নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত তখন তাদেরকে ব্যস্ত রাখা নয়। বরং স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও ভাল ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে খেলা জরুরী। অন্য কোন কার্যাবলী যা না পারে খেলা তাই করতে পারে খেলা শিশুকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের সুযোগ দেয়। যে সব শিশুরা সারাদিন খেলে তারা, যাদের খেলার সুযোগ কম তাদের চেয়ে পরবর্তী জীবনে ভালভাবে খাপ খাওয়াতে পারে।

ছোট শিশুর জীবনে খেলা অত্যন্ত মূল্যবান। খেলার মাধ্যমে ছোট শিশুরা যে ধরনের উপকার পায় তা হল-

খেলা শরীরের অতিরিক্ত শক্তি বের করে দেয়, শরীরের বিভিন্ন অংশের বিকাশ হয়; যেমন- হাড়, পেশী এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ। ব্যায়াম হয় ফলে ক্ষুদা বাড়ে এবং ঘুম ভাল হয়। শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শেখায়। সারা জীবনের জন্য কার্যকরী অনেক দক্ষতার বিকাশ হয়। সক্ষমতার বিকাশ হয়। সৃজনশীলতার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়। পরিবেশের বিভিন্ন জিনিসের অর্থ আবিষ্কার করতে সুযোগ দেয়। রাগ, ভয়, হিংসা এবং দুঃখ থেকে অব্যাহতি পেতে উপায় হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য শিশুদের সাথে কীভাবে মিশবে তা শেখার সুযোগ হয়। ভাল খেলোয়াড় হতে শেখায়, তার অর্থ হল জয়-পরাজয় মেনে নিতে পারে। আইন কানুন অনুসরণ করতে সুযোগ দেয় ইত্যাদি।

যদি শিশুরা খেলা থেকে উপকার পেতে চায় তবে তাদের অতিরিক্ত শক্তি থাকতে হবে। খেলার সময় শিশু শান্তভাবে থাকে, যথেষ্ট সরঞ্জাম, খেলার জায়গা এবং খেলার সঙ্গী থাকতে হবে। খেলার বিভিন্ন রকম তালিকা থাকতে হবে। কিন্তু এই বিভিন্নতার সাথে সমন্বয় থাকতে হবে।

গুরুত্ব অনুসারে খেলার প্রয়োজনীয়তাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখে। সামাজিকতা শিক্ষা দেয়, নৈতিকতার সুষ্ঠু বিকাশ হয় এবং জ্ঞান অর্জন করে।

শারীরিক সুস্থতা

খেলাধূলা শরীরকে ভাল রাখে। শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়ার ফলে ভাল ব্যায়াম হয়, রক্তচলাচল ভাল হয়, মাংশপেশী সতেজ ও সবল হয় এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপক্ব হয়। অঙ্গসঞ্চালন খেলা মাংসপেশীর সমন্বয় সাধনের সাহায্য করে। এতে মাংসপেশীসমূহ শক্ত হয়। ছবি আঁকার ফলে হাত এবং চোখের সমন্বয় সাধন হয়। শিশুর হাত, বাহু, চোখ এবং মাংশপেশীর সমন্বয় সাধন হয়। এতে দক্ষতার প্রশিক্ষণ এবং ব্যায়াম হয় ফলে হাতের সঞ্চালন প্রক্রিয়া ভাল হয়। মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা বাড়ে। প্রধানত খেলার মাধ্যমেই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিপক্বতা সাধিত হয়।

মানসিক সুস্থতা

খেলা মনের জড়তা, দুঃখ ও বেদনা কমিয়ে দেয়। মানসিক অবসাদ দূর করে এবং কাজের জন্য মনকে সবল ও সতেজ করে। ক্লান্তি ও হতাশা দূর করতে যেমন বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন তেমনি জড়তা দূর করে শরীরকে সবল ও সতেজ করার জন্য খেলার প্রয়োজন। শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক রকম উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও অশান্তি দেখা দিতে পারে। খেলার মাধ্যমে দুঃখ, ক্ষোভ ভোলা যায় এবং আবেগ প্রকাশ করা যায়। শিশু বইয়ের চরিত্রের সাথে নিজেদের সনাক্ত করে একাত্ম হয়ে আবেগ প্রকাশ করতে পারে। গল্প করে, ছবি দেখে ভয়, ঘৃণা, আনন্দ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে হালকা হতে পারে। খেলা প্রয়োজন ও ইচ্ছা মেটাবার একটি ভাল উপায়। এতে রাগ, ভালবাসা প্রকাশ করা যায়। হিংসার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় নিজের পুতুলকে মারে। এতে মনের ক্ষোভ মেটে এবং মনটা হালকা হয়, সুস্থ আবেগের বর্হিপ্রকাশ ঘটে। শিশুর মানসিক বিকাশ সুষ্ঠু হয়।

সামাজিকতা শেখা

দলীয় খেলায় অংশগ্রহণ করে শিশু সামাজিক হয়। শিশু শিখে কিভাবে অন্যের সংগে মিশতে হয়, কীভাবে তাদের সাথে সহযোগিতা করতে হয়। নেতৃত্ব নেয়ার ক্ষমতা অর্জন করে এবং নিজের কর্মদক্ষতা তুলনা করতে পারে। খেলার মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান হয়, দলের রীতিনীতি শেখে। গঠনমূলক খেলায় শিশুরা নিজেদের সমালোচনা করতে শেখে। নাটকীয় খেলার মাধ্যমে সামাজিক বোধের সৃষ্টি হয়। অন্যথায় শিশু একাকী ও অসামাজিক হয়।

নৈতিক শিক্ষা লাভ

শিশুরা পরিবার থেকেই নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করে থাকে। খেলতে যেয়ে শিশু খেলার রীতিনীতি এমন সুষ্ঠুভাবে পালন করে যা পরিবারের রীতিনীতি থেকে কঠোর। শিশুকে দলে গ্রহণযোগ্য হতে হলে তাকে হতে হবে সত্যবাদী, সৎ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং ভাল খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব। খেলার দলে থাকতে হলে হারজিত নিয়ে দুঃখ না করে খেলোয়াড়সুলভ আচরণ করতে হয়। মন খারাপ করা ভাল খেলোয়াড়ের লক্ষণ নয়। তাকে দলের কঠোর রীতিনীতি পালন করতে হবে। এভাবেই শিশুর নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে।

জ্ঞানের বিকাশ

খেলার মাধ্যমে শিশু স্বাধীনভাবে এবং আগ্রহ সহকারে স্বেচ্ছায় শেখে। শিশুর মধ্যে অবস্থিত সহজাত শক্তি এবং প্রবৃত্তিই হচ্ছে শিক্ষার উৎস।

বিভিন্ন ধরনের খেলনা দিয়ে খেলার ফলে শিশু খেলার সরঞ্জামের সাথে পরিচিত হয় এবং চিনতে শেখে। বয়স বাড়ায় সাথে সাথে বিভিন্ন খেলায় পারদর্শী হয়। বিভিন্ন ধরনের খেলা আবিষ্কার করতে যেয়ে অনেক তথ্যের অধিকারী হতে পারে। বই পড়া, সক্রিয় খেলা, ছবি আঁকা, টেলিভিশন দেখা, ইত্যাদি শিশুর জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটায়। এতে অনেক আনন্দ পায়। কার্টুন, বই, টেলিভিশন, সিনেমাতে যা দেখে তা আরও জানার জন্য আগ্রহী করে তোলে। নাটকীর খেলার মাধ্যমে সে বাস্তব জগৎ ও কাল্পনিক জগতের তফাৎ বুঝতে পারে এবং ভাষার বিকাশ ঘটে। নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতার সাথে অন্যদের তুলনা করতে পারে। অনুসন্ধানমূলক খেলার মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজও চালিয়ে যেতে পারে। খেলার ভূমিকা পালন করে নিজের ভূমিকার সাথে পরিচিত হয়।

খেলার গুরুত্বপূর্ণ দিক

সুষ্ঠু খেলা পরিচালনার মাধ্যমে শিশু তার নিজের ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী সংগঠনমূলক শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

১. শিশুরা বয়স অনুযায়ী সংগঠনমূলক শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।
২. খেলনার বিভিন্ন অংশ খুলে এবং আবার জুড়ে শিশু কৌতূহল মেটায়। এতে তাদের মনোযোগ, উদ্ভাবনী শক্তি ও অঙ্গসঞ্চালনের নিপুণতা বাড়ে।
৩. শিশুর কাজে এবং খেলায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ফলে শিশুর একাগ্রতার সুঅভ্যাস গড়ে উঠে না।
৪. শিশু যখন পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে খেলে তখন তার খেলা সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে।
৫. নার্সারী স্কুলে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে শিশু সমাজ জীবন ও সুশৃংখলতার শিক্ষা লাভ করে।
৬. শিশু মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য এমন খেলনা দিতে হবে যাতে বিকাশ সুষ্ঠু হয়।
৭. শিশুকে গঠনমূলক খেলার জন্য উপকরণ দিলে শিশুর বিকাশের পথ সুগম হবে এবং শিশু তৃপ্ত হবে।
৮. খেলার উপকরণের মত খেলার পরিবেশের প্রতি ও বিশেষ নজর দিতে হবে। শিশুরা যাতে সহজভাবে খেলতে পারে সেজন্য বিস্তৃত জায়গার দরকার। এতে শিশু আনন্দ পায় এবং শরীর চর্চাও হয়।
৯. খেলার মত কাজে শক্তি ব্যয় করার জন্য অবশ্যই বাড়তি শক্তি থাকতে হবে।
১০. খেলনার ব্যবহার সম্পর্কেও তাকে জানতে হবে।
১১. অনেক সময় রং পেন্সিল দিয়ে শিশু দেয়ালে আঁকে, এক্ষেত্রে তাকে শিখাতে হবে।
১২. সারাদিনের খেলা শেষ হওয়ার পর ছোটদের ইচ্ছানুযায়ী শান্ত খেলার সুযোগ থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, যে শিশু খেলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত সে শিশু শেখা থেকেও বঞ্চিত।

সারাংশ

খেলা সময়ের অপচয় নয় কিংবা শিশুদের ব্যস্ত রাখার কোন মাধ্যম নয়। শিশুর জীবনের সাধারণ কাজই হল খেলা। শিশুর শারীরিক মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও জ্ঞানের বিকাশের জন্য খেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনার মাধ্যমে শিশু তার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশ লাভ করতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খেলা শিশুর কি ধরনের বিকাশের সুযোগ দেয়?
ক. শারীরিক
খ. হাত ও পায়ের
গ. চোখের
ঘ. আইন কানুনের

২। খেলা থেকে উপকার পেতে হলে কি দরকার?
ক. সময়
খ. সঙ্গী
গ. খেলার জায়গা
ঘ. সুস্বাস্থ্য

৩। গুরুত্ব অনুসারে খেলার প্রয়োজনীয়তাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে
খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে
ঘ. ৫ ভাগে

৪। খেলায় কীভাবে ব্যায়াম হয়?
ক. অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া হয়
খ. অঙ্গসঞ্চালন হয়
গ. রক্তচলাচল হয়
ঘ. মাংসপেশী সতেজ হয়

৫। খেলার মাধ্যমে কীভাবে শিশু রাগ প্রকাশ করে?
ক. নিজের পুতুলকে মেরে
খ. সঙ্গীকে মেরে
গ. খেলনা ভেঙ্গে
ঘ. অন্যকে আক্রমণ করে

৬। কোন ধরনের খেলায় শিশু সামাজিক হয়?
ক. গঠনমূলক খেলায়
খ. দলীয় খেলায়
গ. পুতুল খেলায়
ঘ. কাল্পনিক খেলায়

৭। খেলার মাধ্যমে কীভাবে নৈতিকতা শিক্ষা লাভ হয়?
ক. দলে গ্রহণযোগ্য হয়ে
খ. খেলার রীতি নীতি মেনে
গ. খেলোয়াড় সুলভ আচরণ করে
ঘ. গঠনমূলক খেলা খেলে

৮। শিশু জ্ঞান লাভ করে কোন ধরনের খেলা খেলে?
ক. একই খেলা বার বার খেলে
খ. বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলে
গ. খেলনার বিভিন্ন অংশ দেখে
ঘ. অন্যদের খেলা দেখে

৯। শিশুর কৌতূহল নিবৃত্ত করার সুযোগ দিলে কি হয়?
ক. মনোযোগ বাড়ে
খ. উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে
গ. সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ে
ঘ. সামাজিক হয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খেলার মাধ্যমে ছোট শিশুরা কি ধরনের উপকৃত হয়? আলোচনা করুন।
২. গুরুত্ব অনুসারে খেলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিশুর খেলা কীভাবে পরিচালনা করতে হয়? পরিচালনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪.৩ ঃ খেলার সরঞ্জাম নির্বাচনের নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- যেসব সরঞ্জাম শিশুর বিকাশকে উদ্দীপিত করে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- শিশুর জন্য খেলনাসামগ্রী বাছাই করতে বাবা-মা যে ধরনের ভুল করেন তা বর্ণনা করতে পারবেন
- শিশুর জন্যে সঠিক খেলনাসামগ্রী নির্বাচনের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিশুর খেলনাসামগ্রীর উপযোগিতা অনুধাবন করতে পারবেন

একেবারে ছোট শিশুর খেলা হল- হাত, পা ও আঙ্গুল নিয়ে খেলা। তার খেলা থাকে অনিয়মিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। পরবর্তীতে সে অন্য বস্তুর প্রতি আগ্রহী হয়। ২ বছর বয়স থেকেই শিশু খেলনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। খেলনাকে জীবন্ত মনে করে। প্রতিটি বয়সের শিশুর জন্যই খেলার সরঞ্জাম দরকার। সে সরঞ্জাম হতে পারে কাঠি, পুথি, ফিতা, কাদা মাটি, রঙ্গিণ কাগজ, ভাঙ্গা কলকব্জা, চামচ, চিরুনি, ইত্যাদি। অনেক অব্যবহৃত জিনিস নিয়েও শিশু খেলে। শিশুর জন্য খেলনা বাছাই করতে শিশুর চাহিদা ও দক্ষতার দিকে নজর দিতে হবে।

খেলার সরঞ্জাম যদি শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক চাহিদা মিটিয়ে থাকে তবে সেটাই হল সঠিক সরঞ্জাম। যেমন-

শারীরিক বিকাশ

উঠানামা করার বাক্স, দোলনা, স্লাইড, ধাক্কা দেয়া এবং ঠেলা যায় এমন খেলনা, জাঙ্গেল জিম, সি-স, পিছলানোর জন্য সমান ও মসৃণ জায়গা, স্কেট, সাইকেল ইত্যাদি।

দীর্ঘ পেশীর সমন্বয় সাধন

বোলার স্কেট, তিনচাকার সাইকেল, লাফানোর দড়ি, পুতুল টানার গাড়ি, বল, জাঙ্গেল জিমে, আইসকেটস, বাগান করার যন্ত্রপাতি, বালির বাক্স, উঠানামার বাক্স।

ক্ষুদ্র পেশীর সমন্বয় সাধন

কাঁচি, রঙ্গিন পেন্সিল, ছবি আঁকার রং, মাটি, পেন্সিল, ছোট ব্লক, পেগ বোর্ড, বুননের যন্ত্রপাতি, জেকস এবং বল।

মানসিক বিকাশ

রেকর্ড, ছবির বই, গল্পের বই, টেলিভিশন, রেডিও, সিনেমা, ধাঁধা, খেলাধুলা, কমিক বই ইত্যাদি।

সৃজনশীলতার বিকাশ

পুরনো কাপড় চোপড়, গৃহস্থলীর সরঞ্জাম, পুতুল, মমি করা জন্তু, সহজ গানের যন্ত্রপাতি (হারমোনিয়াম), খেলনা ট্রেন, প্লেইন, ট্রাক, মুখোশ ইত্যাদি।

ভাষার বিকাশ

কমিকের বই, ম্যাগাজিনের ছবি, গল্প, বই, রেডিও, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান।

সামাজিক বিকাশ

যে কোন জিনিস যা ভাগাভাগি করা যায় অথবা অন্য শিশুদের সাথে খেলায় ব্যবহার করতে পারে; যেমন- স্লেড, বালির বাক্স, পিছলানোর জন্য সমান ও মসৃণ জায়গা, নাটকীয় খেলার যন্ত্রপাতি। খেলার যন্ত্রপাতি, বল, দোলনা, সি-স, জাঙ্গল জিম এবং লাফানোর দড়ি ইত্যাদি।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে সরঞ্জাম জটিল হয়। ছোট শিশু অনিয়ন্ত্রিত খেলা খেলে। ২-৩ বছর বয়সে দৌড়াদৌড়ি করে। ৪-৫ বছর বয়সে সন্ধানমূলক ও গঠনমূলক খেলায় আগ্রহী হয়। পরবর্তীতে খেলা কাজে পরিণত হয়। ক্ষমতা, পরিকল্পনা, ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে কাজ শেষ করার গুণাবলী অর্জন করে। ৫-৬ বছরের শিশুরা খেলনা ভাঙ্গে এবং গড়ে। এতে অঙ্গসঞ্চালনের নিপুণতা বাড়ে এবং আত্মসন্তুষ্টির সাথে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করতে পারে।

শিশুর জন্য খেলার সরঞ্জাম

খেলায় আগ্রহ জাগাতে শিশুর খেলনাসামগ্রীর প্রয়োজন হয়, যার ফলে তাদের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হবে। বাবা-মা শিশুর জন্য খেলার সামগ্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তারা সন্তানকে খেলার সামগ্রী দিতে গিয়ে অনেক জিনিস দিয়ে থাকেন এবং প্রায়ই খেলার সামগ্রী বাছাইকরণে ভুল করে থাকেন। এমন ৭টি ভুল হলো ঃ

১. বাবা-মা হয়ত অনেক খেলনা, অনেক বই অথবা বহিরাঙ্গণে খেলার জন্য অতিরিক্ত সরঞ্জাম দিয়ে থাকেন। এমন প্রচারণা আছে যে, যেসমস্ত বাবা-মা শিশুদের অধিক সংখ্যক খেলনা দেন না তারা ভাল বাবা-মা নন। কিন্তু ছোট শিশুরা পুনরাবৃত্তি পছন্দ করে। শিশু একই খেলনা দিয়ে অনেকবার খেলতে পছন্দ করে। উদাহরণস্বরূপ, টেডিবিয়ারটি নিয়ে শিশু সব জায়গায় যায় যেখানে, অন্য খেলনা হয়ত অব্যবহৃত থাকে।
২. অনেক বাবা-মা খুব সুন্দর ও মজার খেলনা কেনেন। তারা কখনও ভাবেন না যে শিশু এটি দিয়ে কি করবে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু হয়ত খেলনা কুকুরের প্রতি বিরক্তি বোধ করে অন্যদিকে বাবা-মা হয়ত ভাবেন যে খুব চমৎকার খেলনা।
৩. অনেক বাবা-মা বেশি টাকা দিয়ে খেলনা কিনে থাকেন। তারা হয়ত বুঝতে পারেন না যে, বাজার থেকে কেনা পুতুলের চেয়ে বাড়িতে তৈরি খেলনা তার কাছে বেশি মূল্যবান।
৪. যেসব খেলার সরঞ্জাম সম্পূর্ণ সেখানে শিশুর গঠনমূলক ও নাটকীয় খেলার সুযোগ কম থাকে। একবার শিশু দেখে ফেললে এগুলো দিয়ে খেলতে চায় না। একটি সম্পূর্ণ ট্রেন সেট যেটি আসল ট্রেনের মত মনে হয় সেসব খেলনা শিশুর অনুসন্ধানমূলক ও গঠনমূলক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়।
৫. যদি শিশুরা বয়সে বড় হয় অথবা সরঞ্জামের জন্য বেশি ছোট হয় তাতে তাদের চাহিদা মিটবে না। একজন শিশুর বয়স ৪ বছর হতে পারে এর অর্থ এই নয় যে সব ধরনের খেলনা ৪ বছরের শিশুর উপযোগী। একটি উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু খেলনাটিকে ছোট শিশুদের খেলনা ভাবতে পারে অন্যদিকে যে শিশু পরিপক্ক নয় তার কাছে এটি কঠিন মনে হবে।
৬. বাবা-মা অনেক সময় এক ধরনের খেলার জন্য বেশি সরঞ্জাম দিয়ে ফেলেন। উদাহরণস্বরূপ, শিশুর হয়ত বহিরাঙ্গন খেলার জন্য সরঞ্জাম আছে কিন্তু বৃষ্টির দিনে আনন্দ দেয়ার জন্য কিছু নেই অথবা যখন পরিশ্রান্ত হয়ে যায় তখন কিছু নেই।
৭. অনেক বাবা-মা খেলবার নিরাপত্তার ব্যাপারে ভুলে যান। তারা ভাবেন এ জন্য কারখানা দায়ী এবং ক্রেতদের জন্য সরকারই দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। কেনার আগে ভাল করে দেখা উচিত। কারণ খেলনার কোনা ধারাল, ছোট ছোট খেলনার অংশ শিশুদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

শিশুদের জন্য সঠিক খেলনা সামগ্রী ঃ সব সময়ে শিশুদের আগ্রহ, সক্ষমতা ও চাহিদা মেটাতে পারে। সব ধরনের খেলাতে আগ্রহ জাগাতে উদ্দীপিত করতে পারে। যদি বাবা-মা প্রতিটি শিশুর চাহিদা, আগ্রহ ও সক্ষমতা সম্পর্কে আলাদাভাবে ভাবেন তা হলে তাঁরা শিশুর জন্য ভাল খেলনা সামগ্রী বাছাই করতে পারবেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতার কথা ভেবে খেলনা এবং অন্যান্য সামগ্রী পছন্দ করতে হবে।

খেলার সরঞ্জাম নির্বাচনের নীতি

ছোট শিশুদের জন্য খেলনা সামগ্রী নির্বাচন করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন ঃ

- একই খেলনায় বিভিন্ন ধরনের খেলার সুযোগ থাকতে হবে।
- শিশুর বয়স এবং বিকাশ উপযোগী হবে। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ভাষার বর্ধন উপযোগী হবে।
- খেলনা হবে হালকা, পাতলা এবং আকার হবে ছোট।
- বিভিন্ন বিকাশ লাভে সহায়ক হবে। শিশুর উদ্ভাবনী শক্তি, সংগঠন ক্ষমতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, মনোযোগ, আকর্ষণ ইত্যাদি বিকাশে সহায়ক হবে।
- খেলনার প্রতি শিশুর আকর্ষণ বোধ থাকতে হবে।
- যে ভাবেই শিশু ব্যবহার করুক তা নিরাপদ হতে হবে। ধারাল এবং ক্ষতিকর খেলনা পরিহার করে বিপদমুক্ত হতে হবে।
- বড়দের সাহায্য ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে এবং নড়াচড়া করার সুযোগ থাকবে।
- অন্য শিশুদের সাথে খেলার সুবিধা থাকবে। ঘরে এবং বাইরে খেলার সুযোগ থাকবে।

- খেলার পরিবেশের মত উপকরণ হবে।
- শিশুর পছন্দমত রংয়ের খেলনা হবে, রং এর প্রতি আগ্রহ বাড়াতে আবেদন রাখতে পারবে।
- শিশুর আগ্রহ ও সৃজনশীলতাকে উদ্দীপিত করবে।
- যেন বিশেষ শিক্ষাগত মূল্য থাকে। চিন্তা ও মেধা চর্চায় সহায়ক হবে।
- সব শিশু একই ভাবে খেলেনা। নানা কারণে একই বয়সের শিশুদের মধ্যে খেলার আগ্রহ, নমুনা ও প্রকাশে তারতম্য দেখা যায়; যেমন- লিঙ্গ, পরিবেশ, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ইত্যাদির কারণে।

এমন অনেক খেলনা আছে যা সব ছোট শিশুকে আকৃষ্ট করে। প্রায় বেশির ভাগ শিশুই মমি করা জন্তু পছন্দ করে যেগুলো দেখতে আসল জন্তুর মত এবং এমন ব্লক যা দিয়ে গাড়ি বানানো যায়। তারা এমন ধরনের খেলার সরঞ্জাম পছন্দ করে যাতে বেয়ে উঠতে পারে, পায়ে ঘুরার চেয়ে দ্রুত চারদিকে ঘুরতে পারে অথবা আকাশে উড়তে পারে।
খেলনা বাছাই করার আগে দেখতে হবে কোন খেলনা নিয়ে শিশু বেশিক্ষণ খেলে এবং প্রায়ই খেলে। এ ধরনের খেলনা শিশু অন্যদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, শিশুকে খেলনার দোকানে নিয়ে গেলে বলতে হবে যেটি বেশি পছন্দ করে সেটাই কিনতে পারবে। এতে শিশুর আগ্রহ সম্পর্কে বাবা-মা বুঝতে পারবেন।

শিশুর খেলনা সরঞ্জামের উপযোগিতা

রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকলে শিশু নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। হাত, বাহু, চোখ এবং মাংসপেশীর সমন্বয় সাধন হয়। এতে দক্ষতার প্রশিক্ষণ হয়।

বালি নিয়ে খেললে হাতের সঞ্চালন ভাল হয়, বুদ্ধির বিকাশ সাধন হয়। পানিতে খেললে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু বর্ধন হয়, শিশু সামাজিক হয়। ব্লক দিয়ে খেললে কোন জিনিস তৈরি করা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে। মাংসপেশীর বর্ধনে ও সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে। গঠনমূলক খেলা সমানুপাত, নকশা ও আকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দেয়।

পশু পাখি নিয়ে খেললে তাদের নাম জানতে পারে ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হয়। ব্লক দিয়ে কিছু বানালে শিশুরা কোন কিছু তৈরি সম্পর্কে ধারণা পায়। পানি নিয়ে খেললে পানির সংগে বিভিন্ন বস্তু নাড়াচাড়া করার ফলে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু বিকাশ হয়।

সারাংশ

বিভিন্ন বয়সে শিশুর বিকাশের জন্য খেলনা সামগ্রীর প্রয়োজন। যে খেলনা শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক চাহিদা মেটায় এবং বিকাশকে উদ্দীপিত করে সেগুলো হল খেলার সঠিক সরঞ্জাম। খেলার সরঞ্জাম বাছাই করতে সরঞ্জাম নির্বাচনের নীতি অনুসরণ করতে হবে। এতে শিশুর বিকাশ সুষ্ঠু ও সঠিক হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিশুর জন্য খেলার সঠিক সরঞ্জাম কি?

ক. যা দিয়ে শিশু খেলতে পছন্দ করে — খ. দামী খেলনা
গ. যা শিশুর বিকাশকে উদ্দীপিত করে — ঘ. সাইকেল চালানো

২। কোন ধরনের খেলার সরঞ্জাম শিশুর শারীরিক বিকাশে সহায়তা করে?

ক. গল্পের বই — খ. দোলনা
গ. ছবি আঁকার রং — ঘ. কমিক বই

৩। ক্ষুদ্র পেশীর সমন্বয় সাধনের জন্য কোন ধরনের খেলার সরঞ্জাম প্রয়োজন?

ক. কাঁচি — খ. পুরনো কাপড় চোপড়
গ. সাইকেল — ঘ. বালির বাক্স

৪। খেলার সরঞ্জাম নির্বাচনের প্রধান নীতি কোনটি?

ক. খেলার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এমন সরঞ্জাম
খ. শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিকারী সরঞ্জাম
গ. শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগী সরঞ্জাম
ঘ. শিশুর পছন্দমত রংয়ের সরঞ্জাম

৫। ছবি আঁকলে শিশুর কি হয়?
ক. রং সম্পর্কে জ্ঞান হয়
খ. নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে
গ. ছবি সম্পর্কে ধারণা হয়
ঘ. সামাজিক হয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কোন কোন খেলার সরঞ্জাম শিশুর বিকাশকে উদ্দীপিত করে বর্ণনা করুন।
২. শিশুর জন্য খেলনা নির্বাচন করতে বাবা-মা কি ধরনের ভুল করে থাকেন আলোচনা করুন।
৩. শিশুর জন্য সঠিক খেলনা সামগ্রী নির্বাচনের নীতিগুলোর ব্যাখ্যা দিন।
৪. শিশুর খেলনা সামগ্রীর উপযোগিতা উল্লেখ করুন।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ৪

অনুশীলনী- ৪.১	ঃ	১। ক	২। খ	৩। ঘ	৪। ঘ	৫। ঘ	৬। ক	৭। গ	৮। গ	৯। খ
অনুশীলনী- ৪.২	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ঘ	৪। ক	৫। ক	৬। খ	৭। খ	৮। খ	৯। খ
অনুশীলনী- ৪.৩	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ক	৪। গ	৫। খ				

ইউনিট
৫

শিশুর আচরণগত সমস্যা ও প্রতিকার

ভূমিকা

শিশু জন্ম মুহূর্ত থেকে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও এমন কতকগুলো আচরণ করতে দেখা যায় যা ন্যূনতম সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। সে আচরণগুলো জন্মগত, বংশগত বা পরিবেশগতভাবে বেমানান হয়ে পড়ে যা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এই ইউনিটে আপনারা বাবা-মার স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত শিশু যারা সহজে বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না, প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে এবং আচরণে উগ্রভাব প্রকাশ করে সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়া শিশুদের আচরণগত সমস্যায় এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে প্রতিবন্ধী শিশুরা। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা শিশুর ও শিশুর পিতামাতার স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনকে করে তোলে নিরানন্দ ও বিষময়। শিশু জগৎ বিরাট বৈচিত্র্যময়। স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশু সব দিকেই প্রায় একইভাবে বড় হতে থাকে। কিন্তু একই বয়সে বিভিন্ন কারণে শিশুর আচরণ ও বড় হওয়ার সাথে সাথে আচরণের ভিন্নতা দেখা যায় যা, তার জীবন বিকাশের নানা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ- ৫.১ ঃ শিশুর আচারণগত সমস্যার সংজ্ঞা ও কারণ
পাঠ- ৫.২ ঃ প্রতিবন্ধী শিশুকে জানা ও পরিচালনা করা
পাঠ- ৫.৩ ঃ শিশুর আচরণগত সমস্যার প্রতিকার
পাঠ- ৫.৪ ঃ একই বয়সের শিশুর আচরণের মিল ও অমিল

পাঠ- ৫.১ ঃ শিশুর আচরণগত সমস্যার সংজ্ঞা ও কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিশুর আচরণগত সমস্যা ও তার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন
- শিশুদের যাতে সমস্যা না হয় সে সম্পর্কে সজাগ হতে পারবেন

যে আচরণ ন্যূনতম সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয় তাকে সমস্যা বলা হয়। কম বেশি সব শিশুরা কোন না কোন এক সময়ে এমন সব আচরণ করে যা সামাজিক ও নৈতিকভাবে অগ্রহণীয়, অস্বাভাবিক আচরণ মনে করা হয়। স্বাভাবিক আচরণ এমন একটি প্রচেষ্টা যা দিয়ে প্রাণী নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। প্রত্যেক স্বাভাবিক আচরণের একটি সুনির্দিষ্ট মান ঠিক করা থাকে। আমাদের আচরণ যদি সেই মান বা আদর্শের নিচে হয় তাহলে সেসব আচরণকে ব্যক্তিগত বা সমাজগত উভয় দিক থেকে সমস্যামূলক আচরণ বলা হয়।

সাধারণত দুই থেকে পাঁচ বছর শিশুদের মধ্যে এসব সমস্যামূলক আচরণ দেখা যায় যা শিশুর বাবা-মা ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসকল সমস্যা সামাজিকভাবে ও পারিবারিকভাবে বিরক্তিকর ও অগ্রহণীয়। শিশুদের মধ্যে নানাকারণে এ সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাবা-মার সঠিক যত্ন ও পরিচর্যার অভাব শিশুদের নিরাপত্তার অভাব, স্নেহ-মায়া মমতার অভাব, শিশুদেরকে ছোটবেলা থেকে ধৈর্য্য সহকারে সদভ্যাস গড়ে তোলার অভাব ইত্যাদি কারণে শিশুদের মধ্যে নানা সমস্যা তৈরি হয়। ছোট্ট শিশুর শিশুকালের নানা প্রকার দ্বন্দ্ব ও অনিশ্চয়তার ফলে অবচেতন মনে তার ভেতর মানসিক ভাবে এসকল সমস্যা বাসা বাঁধতে থাকে। নিচে যে সমস্ত কারণে শিশুর মধ্যে সমস্যাজনিত আচরণ দেখা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১। **অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ ঃ** প্রতিটি গৃহে সুখ-শান্তি শৃঙ্খলা সকলেরই কাম্য। পরিবারের প্রতিটি সদস্য যদি এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখেন তাহলে বাস্তবে সেটা প্রতিফলিত হতে পারে। কেননা গৃহ পরিবেশের এই সুখ-শান্তি ছোট শিশুদের মনে দারুণভাবে রেখাপাত করতে থাকে। বাবা-মার সবসময় ঝগড়া-বিবাদ ও অমধুর সম্পর্ক শিশুকে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগায়। এছাড়া সংসারে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সমস্যা, দুঃখ, বেদনা, দারিদ্র্য শিশুকে অন্তর্মুখী করে তোলে। সে নিজের জগতে বিচরণ করতে ভালবাসে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তার মানসিক নানারকম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে নানা সমস্যা তার আচরণে ধরা পড়তে থাকে।

২। **অহেতুক মানসিক অস্থিরতা ঃ** ছোট্ট শিশুকে যখন তার নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে বিশেষ করে লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কাজে অহেতুক চাপ সৃষ্টি করা হয় তা শিশুর জন্য দারুণ মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এক্ষত্রে প্রায় সময়ই শিশু অসামর্থ্য প্রকাশ করে বা অসফল হয় যার ফলস্বরূপ তাকে বাবা-মার কাছে তীব্রভাবে সমালোচিত হতে হয়। বাবা-মার বেশি প্রত্যাশা শিশুকে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে তোলে। যে সমস্ত বাবা-মা শিশুদের অতিমাত্রায় শাসনে রাখেন সেখানে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছা পূরণে নানা বাঁধা আসে ফলে তার আগ্রহ ও কাজের প্রতি বিরক্তি এবং অনীহা আসে এবং ফলস্বরূপ সে ভীরু ও লাজুক হয়। শিশু কাজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে অযথা বকা ঝকা বা সমালোচনা করলে শিশু অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হয় এবং নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। ফলে তার আচরণে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার কোন পরিবারে বাবা-মা বা অন্য কোন ছেলে মেয়ে বা ভাই বোন মানসিক ভাবে অসুস্থ হলে বা বিকারগ্রস্থ (Mental disorder) থাকলে শিশুর সুস্থ মানসিকতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা শিশুর অসঙ্গত আচরণকে অস্বাভাবিক আচরণে পরিণত করে ও নানা সমস্যা তৈরি হয়।

৩। **শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় বাঁধা দান ঃ** শিশু স্বভাবজাত ভাবেই তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, প্রাণখুলে কথা বলে, প্রাণ চাঞ্চল্যে পরিবেশকে মুখরিত করে তোলে। কিন্তু শিশুর এই প্রাণ-চাঞ্চল্যতা অবদমিত হয় যখন নানা বিষয় তার প্রতিকূলে কাজ করে।

৪। **শারীরবৃত্তীয় ও মনোবৃত্তীয় কারণ ঃ** কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় ও মনোবৃত্তীয় ঘটনার সমন্বয়ে ব্যবহারে আচরণগত সমস্যা দেখা যায়। মস্তিষ্কের আঘাত ও দৈহিক আঘাত ইত্যাদির কারণে শারীরিক ত্রুটি দেখা যায়। এছাড়া

শিশুর কোন অঙ্গহানি, বিকৃতি বা অসুস্থতা থাকলে সে হাঁটাচলাফেরা, খেলাধুলা, লাফ-ঝাপ করতে পারে না। আবার তার কোন প্রবলতর ইচ্ছাকে কঠোরভাবে দমন করলে তার স্বতস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়। আবার অনেক সময় বাবা-মা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হলে শিশুর সব কাজে মাথা ঘামালে শিশু তার নিজস্ব আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, নানারকম হীনমন্যতা দেখা যায়। এরকম নানা পরিস্থিতিতে শিশু মনে নানা সমস্যা তৈরি হয় যা তার আচরণে নানা ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতি একান্তই শিশুর নিজস্ব। তবে নানা রকম আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতির (Defence Mechanism) সাহায্যে সে নিজেকে বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে।

যে সব শিশুরা বাবা মার অনাদরে বড় হয়, অবহেলা ও লাঞ্ছনার মধ্যে বাড়তে থাকে তাদের মধ্যে নানাধরনের আচরণের সমস্যা দেখা যায় যার ফলস্বরূপ তারা মিথ্যা বলে, চুরি করে অযথা অন্যকে আঘাত করে।

সুতরাং বলা যায় শিশু মনের ও শিশুকালের দ্বন্দ্ব এবং অনিশ্চয়তাই পরবর্তীকালে মানসিক নানা সমস্যা তৈরি করে।

সারাংশ

শিশুর সব আচরণ তার মনের চিন্তা ও ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত। যা তার অবচেতন মনে অবদমিত হয়ে বাস করে এবং সেখানে সৃষ্টি হয় অন্তর্দ্বন্দ্বের। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় না কিন্তু তার সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে। শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাগুলো নানারকমভাবে তার আচরণে সমস্যা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। শিশুর সমস্যামূলক আচরণ আজকাল শুধুমাত্র বাহ্যিক লক্ষণ হিসেবে বিচার না করে তার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করে যাতে শিশু সুসঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে বেড়ে ওঠে তার জন্য বিশেষ যত্ম নেওয়া প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

১। আচরণগত সমস্যা কাকে বলে?
- ক. যে আচরণ সামাজিকভাবে গ্রহণীয় হয় তাকে
- খ. যে আচরণ সামাজিকভাবে স্বীকৃত তাকে
- গ. যে আচরণ স্বাভাবিক সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে তাকে
- ঘ. যে আচরণ ন্যূনতম সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয় তাকে

২। বাবা-মার বেশি প্রত্যাশা শিশুর উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?
- ক. শিশুকে হাসি খুশী রাখে
- খ. শিশুর স্বতস্ফূর্ততা নষ্ট হয়
- গ. শিশুর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে
- ঘ. শিশুকে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে তোলে

৩। শিশুকে যখন নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে কোন কিছু করতে দেয়া হয় তখন তার উপর কিসের প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়?
- ক. শারীরিক
- খ. মানসিক
- গ. সামাজিক
- ঘ. আবেগিক

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমস্যামূলক আচরণ কাকে বলে? কি কি কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়? পারিবারিক অসুস্থ পরিবেশ শিশুকে কি কি সমস্যায় ফেলে আলোচনা করুন।

২। শিশুর আচরণগত যে সব সমস্যা দেখা যায় তার কারণগুলো উল্লেখ করে বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৫.২ ঃ প্রতিবন্ধী শিশুকে জানা ও পরিচালনা করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রতিবন্ধী শিশুকে কীভাবে পরিচালনা করা যায় যে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারবেন

প্রতিবন্ধী শিশু বলতে আমরা সেসব শিশুকে বুঝে থাকি যাদের আচরণ স্বাভাবিক মানের নয়, স্বাভাবিক গড় মানের চেয়ে অনেক নিচে। যারা শারীরিক, মানসিক, অথবা সামাজিক সমস্যার জন্য দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। প্রতিবন্ধী শিশুদের আওতায় পরে ঃ

ক. শ্রবণ প্রতিবন্ধী
খ. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
গ. শারীরিক প্রতিবন্ধী
ঘ. মানসিক প্রতিবন্ধী
ঙ. পাঠ গ্রহণে অক্ষমতা বা শিখন অক্ষমতা
চ. আচরণ বৈকল্য বা আবেগগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ
ছ. ভাব বিনিময় বৈকল্য (কথা বলা ও ভাষা)
জ. গুরুতর বাঁধাগ্রস্থ প্রতিবন্ধী ইত্যাদি।

সংক্ষেপে এই শ্রেণীবিভাগগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল -

ক. শ্রবণ প্রতিবন্ধী ঃ শ্রবণ প্রতিবন্ধী তাদের বলা হয় যারা বধির অর্থাৎ কানে শোনে না। যাদের শ্রবণ ক্ষমতা এতটাই নষ্ট হয়েছে যে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে অন্যের কথা শুনতে সক্ষম হয়। সাধারণত বধিরতা থেকে পরবর্তীতে বোবা হতে দেখা যায়। শিশু বয়সে যে শিশু কানে শুনতে পায় না পরবর্তী জীবনে সে বোবা হয়ে যায়। আমাদের সমাজে আগে এদেরকে বধির বলা হলেও বর্তমান কালে এদেরকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পরিবারের পিতামাতা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীর ব্যাপারে উপযুক্ত আগ্রহ অনুভব করলেই তার আচরণ হতেই তার মধ্যে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে প্রাথমিক সনাক্তকরণ করতে সক্ষম হবেন।

খ. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ঃ তাদেরকেই 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধী' বলা হয় যারা চোখে দেখতে পায় না, চোখের দৃষ্টি নেই অর্থাৎ দেখার অক্ষমতাকেই বুঝিয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী এবং পৃথিবীতে প্রায় ৩০ মিলিয়ন দৃষ্টিহীন রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর কেবলমাত্র ভিটামিন 'এ'র অভাবে ৩০ হাজার শিশু দৃষ্টি হারাচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন লোক (যাদের চোখে আলোর অনুভূতি নেই) এরূপ লোকের সংখ্যা ৯ মিলিয়ন। যাদের চোখে আংশিক দৃষ্টি আছে বা ৩ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত আঙ্গুল গুনতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা ২ মিলিয়ন। এই বিপুল সংখ্যক দৃষ্টিহীনের ৫০% হচ্ছে ১ মাস থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে।

গ. শারীরিক প্রতিবন্ধী ঃ যারা শারীরিকভাবে অসুস্থ অস্থি বৈকল্য, অবশ, পক্ষাঘাত দ্বারা আক্রান্ত; অর্থাৎ যাদের আমরা পঙ্গু বলি, তারা শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত। শিশুদের এই প্রতিবন্ধকতা জন্মের সময় দেখা দিতে পারে অথবা জন্মের পর পারিপার্শ্বিক দুর্ঘটনায় হতে পারে। এরা অনেক সময় হাঁটতে পারে না, ধরতে পারে না বা শারীরিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্থ থাকে।

ঘ. মানসিক প্রতিবন্ধী ঃ মানসিক প্রতিবন্ধী বলতে আমরা সেই ব্যক্তিকে বুঝি যারা জীবনের শুরু থেকে বুদ্ধির দিক থেকে দুর্বল, যাদের বিকাশের গতি ধীরসম্পন্ন, যাদের শিক্ষণ গ্রহণ ক্ষমতার অভাব এবং সামাজিক ও আচরণগত সামঞ্জস্যের অভাবগ্রস্থ। মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী, সমাজসেবক ও চিকিৎসক প্রচুর গবেষণা করেছেন। নানাভাবে তাদের আখ্যায়িত করেছেন। ওয়েস্লার ও টারম্যান নামক দুজন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধাঙ্ক (I.Q)র উপর ভিত্তি করে মানসিক প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তারা বলেন, যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা (I.Q) কোন আদর্শায়িত বুদ্ধি অভীক্ষার প্রাপ্ত স্কোর ৭০ এর নিচে তারা মানসিক প্রতিবন্ধী। স্বাভাবিক গড় বুদ্ধাঙ্ক হল ১০০। American Association of Mental Relation ship (AAMR) আধুনিককালে মানসিক প্রতিবন্ধী সম্পর্কে বলেছেন-

১। ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক কোন আদর্শায়িত বুদ্ধি অভীক্ষা অনুসারে ৭০ বা তার কম হবে।

২। মাতৃদেহে গর্ভধারণ থেকে শিশুর বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়

৩। ব্যক্তি তার নিজের পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অক্ষম হবে এবং সমাজে অভিযোজন করতে অক্ষম হবে।

ঙ. পাঠ গ্রহণে অক্ষমতা বা শিখন প্রতিবন্ধী ঃ এ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষণের বিভিন্ন দিক; যেমন- শোনা, কথা বলা, পড়া, লেখা, চিন্তাকরা, বানান করা, অংক করা ইত্যাদির এক বা একাধিক ক্ষেত্রে সমস্যা থাকবে যার ফলে শিশুরা শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত প্রতিবন্ধী হয়। এদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১। লেখাপড়া ও অংক কষাতে একই বয়সের অন্য শিশুদের তুলনায় সমস্যা বেশি করে।

২। এই শিশুদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার তুলনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত কৃতিত্ব অনেক কম।

৩। কতকগুলো স্নায়ুবিক সমস্যার কারণে ব্যক্তির মধ্যে প্রাথমিকভাবে এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়।

চ. আচরণে বৈকল্য বা আবেগগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ঃ এই ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে বেশ কিছু অক্ষমতা রয়েছে যা তাদেরকে শিক্ষাগত দিক থেকে বাধাগ্রস্থ করে। যার ফলে সমবয়সীদের সাথে, শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতার অভাব দেখা যায়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিজেকে গুটিয়ে নেয় বা আড়াল করে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং কখনো কখনো এসব শিশুরা খুব আক্রমণাত্মক মনোভাব (Aggressive Attitude) ব্যক্ত করে।

ছ. ভাব বিনিময় বৈকল্য ঃ শিশু যখন কোন কিছু বুঝতে অক্ষম হয় বা প্রকাশ করতে অক্ষম হয় তখন তার ভেতর কথা বলা ও ভাষা ব্যবহারের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। এধরনের প্রতিবন্ধকতা এদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। জন্মের পর পরই মাস দুই/তিন হলে শিশু বিভিন্ন ইশারায়, কথা বলা, আকার-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু ভাব বিনিময় বৈকল্য শিশু কথা বলতে বা ইশারা করতে সমস্যা দেখা দেয়। কথা বলতে বাগযন্ত্রের ত্রুটি দেখা দেয়। ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে না। ভাষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অক্ষম হয়।

জ. গুরুতর বাঁধাগ্রস্থ প্রতিবন্ধী ঃ যে সকল শিশু একাধিক ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মায় বা জন্মের পরবর্তীকালে একাধিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। এরা মূক-বধির এবং সেই সাথে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অথবা মানসিক ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ। এরা অনেক সময় সারাজীবন অন্যের উপর নির্ভর করে চলাফেরা করে। অধিকাংশ শিশুই বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারে না। সমবয়সী শিশুদের সাথে খেলতে ও বন্ধুত্ব করতে পারে না। এই সব শিশুদের খাওয়ান খুব সমস্যাদায়ক। এদের প্রতি পিতামাতার প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়, শিশুকে পিতামাতা গ্রহণ করতে পারে না, শিশুর জন্য অধিক আর্থিক ভার বহন করতে হয়। এই সকল শিশুর মায়েরা প্রচন্ড মানসিক চাপের কারণে শিশুর চাহিদা পূরণে অক্ষম হন।

এসব প্রতিবন্ধী শিশুকে কীভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আমরা জানব। প্রতিবন্ধী শিশুর সঠিক পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন তার পরিবার অর্থাৎ শিশুর মা ও বাবার সাহায্য। প্রাক-শৈশবে অর্থাৎ শিশুর জন্মের পর থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত সময়ে শিশুর বিকাশের জন্য প্রাক শৈশবকালীন কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশেষ শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞকে শিশুর পরিবারে নিয়ে এসে শিশুর মাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। গৃহ পর্যবেক্ষক শিক্ষক এখানে স্বয়ং এসে প্রতিবন্ধী শিশুর বাড়িতে বাবা মাকে সাহায্য করতে পারে। ফলে মা-বাবার আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বেড়ে যাবে। এতে সন্তানের জন্য তারা অন্ততপক্ষে কিছু করতে পারবেন বলে সান্ত্বনা পাবেন। তারা শিশুর প্রাত্যহিক আচরণ লক্ষ্য করে আচরণের কতটা পরিবর্তন হচ্ছে তাও বুঝতে পারবেন। প্রতিবন্ধী শিশুদের মাতা-পিতার মানসিক অবস্থা সবসময়ই খুব নাজুক অবস্থায় থাকে। সেজন্য এ ধরনের পর্যবেক্ষক শিক্ষক সুপরামর্শের মাধ্যমে মা-বাবাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, শিশুটির বাঁচার অধিকার, শেখার অধিকার রয়েছে। যার ফলে শিশুটির সম্পর্কে সবরকম নেতিবাচক মনোভাব ত্যাগ করে শিশুর সাথে একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলে তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন। শিশুর সম্বন্ধে পরিবারে যে স্বচ্ছ ধারণা থাকে তার থেকেই পরিবার শিশুর স্বাস্থ্য ও বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ সহায়তা দান করতে পারেন।

সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এসকল প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিক পরিচালনার জন্য মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মনোচিকিৎসকের মধ্যে নানাবিধ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। সঠিকভাবে তাদের সনাক্ত করতে পারলে পরিচালনাও সঠিক পথে পরিচালিত হবে। এতে তাদের সমস্যা নিরূপণ ও চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয় তাদের বিশেষ আচরণগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। এতে মাতা-পিতার সঙ্গে, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারেন যার ফলে শিশুদের বিশেষ চাহিদাগুলো উন্মোচিত হয়।

শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয় তখন সে বিদ্যালয়ে যায়, সমবয়সীদের সঙ্গে মেশে, দল গঠন করে এবং তার উপর সমবয়সীদলের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। সাধারণত প্রতিবন্ধী শিশুদের সমবয়সীরা দলে মিশতে দিতে চায় না, তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করে ও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকান্ড থেকে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। কাজেই প্রতিবন্ধী শিশুদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা দরকার। সমাজ যদি তাকে অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত মনে করে তাহলে তাদের দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না। সামাজিক ধ্যান-ধারণার উপর এদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে এ সকল শিশুদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা আবশ্যক।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ন্যায় বধির ও কানে খাটো শিশুদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশু বিশেষজ্ঞ যদি দেখেন যে, শিশুর ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধী হওয়ার কোন সম্ভাবনা রয়েছে তবে চিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্য প্রারম্ভিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে উপযুক্ত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করে শিশুকে শব্দ শুনতে সাহায্য করতে হবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সদিচ্ছা থাকলে বধির শিশুর মানসিক অস্বাস্থ্যের অনেকদিকই কাটিয়ে তোলা যায়।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। গর্ভকালীন মার অপুষ্টির কারণে গর্ভস্থ শিশুর দৃষ্টিহীনতা হতে পারে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে অবহেলা, অসচেতনাতা, অজ্ঞতার কারণে শিশুর মস্তিষ্ক ও চোখের কোন আঘাত বা কোন দুর্ঘটনার কারণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে সেমিনার, কর্মশালা, পুস্তিকার প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের এবং তাদের অভিভাবকদের সচেতনতা আনতে পারা যাবে। শিশুর প্রতিবন্ধীতা রোধে এটা অনেক কার্যকরী পদক্ষেপ। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে বহু শিশু এ থেকে মুক্তি পেতে পারে, প্রতিবন্ধীতাজনিত সমস্যা কম হতে পারে। শিশুর দৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্থ হলে চিকিৎসার দ্বারা অবশিষ্ট দৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে এবং অবশিষ্ট দৃষ্টিকে সে যাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিবারের দ্বন্দ্ব ও শিশুর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব যাতে না থাকে সেটা খেয়াল করতে হবে। এতে শিশুর বিভিন্ন বিকাশকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়।

শিখন প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পিতামাতার সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। শিখন প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিতকরণ, নির্ণয় এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা দানের ক্ষেত্রে পিতামাতার সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। শিক্ষণ প্রতিবন্ধী শিশুকে ছড়ার ও ছবির মাধ্যমে সহজে শিক্ষা দেওয়া যায়। এছাড়া সমবয়সীদের সহায়তায় শিক্ষাদান করলে শিখন প্রতিবন্ধী শিশুরা দ্রুত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

মানসিক প্রতিবন্ধিতা কোন রোগ নয়। এটি এক ধরনের অক্ষমতা এবং এই অক্ষমতাটি হয় স্থায়ী প্রকৃতির। প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের আচরণ ও অক্ষমতার কারণ এই উভয় ক্ষেত্রেই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কিছু শিশু বাড়িতে নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করে, অনেক শিশুকে দেখাশুনা করা বেশ কষ্টকর ও বাড়িতে রাখা অসম্ভব, অনেকে কেবল স্কুলের সাফল্যের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে, অনেকে আবার শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে এত মারাত্মক অক্ষমতার শিকার যে, তরুন বয়সেও তারা বসতে এবং কথা বলতে ও খেলাধুলা শিখতে পারে না। তবে অধিকাংশ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি হলেও মানসিক দিক থেকে তারা পিছিয়ে থাকে।

মানসিক প্রতিবন্ধীকতার কোন ওষুধ নেই। ওষুধ কিংবা ট্রেনিং কোন কিছুর মাধ্যমেই একটি অস্বাভাবিক শিশুকে স্বাভাবিকত্বে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবু সযত্ন ও সহানুভূতিশীলতা এ সকল প্রতিবন্ধীদের আচরণে যথেষ্ট উন্নতি ঘটায়। যার ফলে স্বল্প মাত্রায় মানসিক প্রতিবন্ধীরা বড় হয়ে জীবন ধারণের মত কাজ পেতে সক্ষম হতে পারে এবং অন্যান্য ধরনের শিশুদের অন্তত পরিচ্ছন্নতা, নিজের দৈনন্দিন ছোটখাট কাজ করে নেয়া এবং অন্যদের সাথে মেলামেশা করার প্রাথমিক নিয়মগুলো শেখানো যায়। শিশু বেশির ভাগ সময় যেহেতু বাড়িতেই কাটায় তাই এসব প্রতিবন্ধীদের আচার আচরণে যথাসম্ভব স্বাভাবিকত্ব আনার ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেয়া উচিত যাতে করে বাড়িতেই শিশুকে এ প্রশিক্ষণ দেয়া যায়।

সারাংশ

প্রতিবন্ধী শিশু হল, যারা শারীরিক, মানসিক অথবা সামাজিক সমস্যায় নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় না। এদের মধ্যে রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ইত্যাদি। এদের নানাবিধ আচরণে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য, ভাব আদান প্রদানের সমস্যা। ইন্দ্রিয়গত পার্থক্য এবং আরো বহুবিধ সমস্যা। তাই এদের জন্য প্রয়োজন সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা। যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ও ধৈর্য্য সহকারে এদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে অনেকেই স্বাভাবিক জীবন ও সুস্থ জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে অন্ততপক্ষে অস্বাভাবিকত্বের মাত্রার আধিক্য কমাবে বৈকি বাড়াবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

সঠিক উত্তরটি টিক চিহ্ন (√) দিন

১। যারা বধির তাঁরা কোন প্রতিবন্ধীকতার আওতাভুক্ত?
ক. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
খ. মানসিক প্রতিবন্ধী
গ. শ্রবণ প্রতিবন্ধী
ঘ. শারীরিক প্রতিবন্ধী

২। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের কোন দিকে ঘাট্‌তি বেশি দেখা যায়?
ক. শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে
খ. বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে
গ. দৃষ্টি ও শ্রবণের ঘাটতি
ঘ. ভাবের আদান-প্রদানের ঘাটতি

৩। প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিচর্যার জন্য কার ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ?
ক. প্রশিক্ষকের
খ. ভাই-বোনের
গ. মার
ঘ. সমবয়সী বন্ধুর

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রতিবন্ধী শিশু কাকে বলে? বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। প্রতিবন্ধী শিশুদের কীভাবে পরিচালনা করা যায় এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।

পাঠ- ৫.৩ ঃ শিশুর আচরণগত সমস্যার প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিশুর বিভিন্ন প্রকার আচরণের সমস্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন
- আচরণগত সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন

শিশুর জীবনে সমস্যা অনেক। কিছু কিছু আচরণ আছে আপাতদৃষ্টিতে সমস্যা মনে হলেও শিশু বয়সে তা স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। ছোট শিশুরা যখন সবেমাত্র স্কুলে যেতে শুরু করে তখন স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে, বাবা-মা ও পাড়াপ্রতিবেশিদের কাছ থেকে কিছু উদ্বেগজনিত ও অনাকাঙ্খিত আচরণের কথা শোনা যায়। আমরা এই পাঠে এমনি কিছু সমস্যা ও তার সমাধানের কথা আলোচনা করব। যেমন: আঙ্গুল মুখে দেওয়া, মিথ্যা বলা, না এর প্রবণতা, ভাইবোনের প্রতি ঈর্ষা ইত্যাদি।

আঙ্গুল মুখে দেওয়া

শিশু জন্ম গ্রহণ করার পরপর প্রথম খাদ্য গ্রহণ করে চোষার মাধ্যমে। কম বেশি সব শিশুর মধ্যে এটা দেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় আঙ্গুল চোষা মাতৃস্তন্য চোষার বিকল্প হিসেবে ধরা হয়। শিশুর দুধ পান অসম্পূর্ণ হলে বা শিশু অতৃপ্ত থাকলে এটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। পরবর্তীতে আঙ্গুল চোষার মধ্য দিয়েই সে তার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করে। এক বছরের নিচের শিশুদের জন্য এটাকে স্বাভাবিক ধরা যায়। তবে শিশু যখন একটু একটু করে বড় হতে থাকে তখন সেটা সমস্যা বলে ধরা হয়।

কারণ

১. শারীরিকভাবে শিশু অসুস্থ থাকলে, অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিম্বা ঘুম পেলে শিশু আঙ্গুল চুষে থাকে।
২. গৃহ পরিবেশ যদি শিশুর অনুকূলে না থাকে। নিরানন্দময় বাড়ির পরিবেশে শিশু সবসময়ই অবহেলিত হয়, পিতামাতা সেখানে অত্যন্ত শীতল মনোভাব প্রকাশ করে, শিশুর অনেক ব্যাপারে উদাসীন থাকে সেখানে শিশু বিকল্প হিসেবে আঙ্গুল চুষে।
৩. যখন শিশু মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা বোতলের দুধের প্রতি আসক্ত থাকে তখন এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। বোতলের দুধে শিশুর দুধপানের সম্পূর্ণ তৃপ্তি মেটায় না। বিকল্প হিসেবে আঙ্গুল চুষে সে তখন তার অভাববোধ পূরণ করে।
৪. যে সকল শিশু অবাধে খেলাধুলা করতে পারে না, চারদেয়ালে আটকে থেকে একঘেঁয়ে বোধ করে, কোন কারণে তাদের মধ্যে হিংসা ও উদ্বেগ চাপা অবস্থায় থাকে, তাদের মধ্যেই আঙ্গুল চোষা, নখ কামড়ানো ইত্যাদি প্রবৃত্তি বেশি দেখা যায়।

শিশুর এসব অভ্যাস ছাড়ানোর জন্য জোর জবরদস্তি করা, গালিগালাজ করা, মারা, বা এক্ষেত্রে অত্যধিক মনোযোগ দেয়া ঠিক না। এ ধরনের সমস্যা শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা কমে আসে। তবে চার-পাঁচ বছরের শিশু যদি আঙ্গুল চোষার অভ্যাস ত্যাগ করতে না পারে তাহলে আমাদের এমন কতগুলো ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে সে এ অভ্যাস থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে।

১. শিশুকে যথা সময়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া। শারীরিক অসুস্থতা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তার চিকিৎসা করা।
২. বাড়ির পরিবেশ সুন্দর রাখা। যে পরিবেশ শিশুকে নিরাপত্তা দিবে ও আনন্দে রাখবে এমনি পরিবেশ রচনা করা।
৩. আঙ্গুল চোষা অভ্যাসে পরিণত হওয়ার পূর্বেই সতর্ক হতে হবে। খাওয়ার পূর্বে চোষাটা অনেক সময় স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হয়। তখন এটাকে ক্ষিধের জন্যই করা হয় বলে ধরা হয়। কিন্তু খাবার পরেও যদি এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায় তাহলে অবশ্যই তা খেয়াল করতে হয়। শিশু তার খাদ্য গ্রহণ যাতে সম্পূর্ণ করে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়।
৪. শিশুরা যাতে অবাধে মুক্ত মনে বিচরণ করতে পারে, প্রচুর খেলাধুলা করতে পারে, অন্যের খেলাধুলা করতে দেখে তার খেলার বাসনা যেন অতৃপ্ত না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শহরে বন্দী জীবনে শিশুরা হাঁপিয়ে উঠে সেজন্য বাবা-মা যেন শিশুকে মাঝে মাঝে পার্ক, শিশুদের খেলার মাঠ, শিশু ক্লাবে নিয়ে গিয়ে তার মানসিক উৎকর্ষতা সাধন করেন। বাড়িতেও নানা ধরনের বয়স অনুযায়ী খেলার সামগ্রী দেয়া উচিত যা দিয়ে শিশু তার শক্তিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

৫. সর্বোপরি সমস্যা বেশি হলে শিশুর হতাশার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। বড় শিশুকে এব্যাপারে লজ্জা দিলে তার আত্মবিশ্বাসের উপর কঠিন আঘাত হানে। তাকে ভালভাবে এর অপকারিতা বুঝাতে হবে। এটা তার আঙ্গুল ও নখের আকৃতির পরিবর্তন, ঠোঁট এবং পেটের নানা ধরনের অসুখ হবার কারণ হতে পারে। শিশুর এতে সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত ঘটতে পারে এভাবে বুঝালে অনেক সময় ধীরে ধীরে তার অভ্যাসটি চলেও যেতে পারে।

মিথ্যা বলা

মিথ্যা বলা শিশুদের একটি সাধারণ সমস্যা। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও দোষণীয় একটি কাজ। প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের শিশুদের মধ্য থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যা অনেক সময়ই চলতে থাকে। তাবে ৪/৫ বছরের শিশু যে মিথ্যা বলে সেটা বেশীর ভাগ সময়ে সে অজান্তে বা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ না বুঝেই বলে। তার উপলব্ধি শক্তি অতটা সূক্ষ্মভাবে কাজ করে না। তার ভেতর আজ, কাল, পরশু, আগে, পরে, গতকাল, আগামী কাল ইত্যাদির প্রভেদে গন্ডগোল হয় বিধায় অতটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। বড় হতে হতে এ ধরনের মিথ্যা বলা আপনা থেকে চলে যায় কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু যে মিথ্যা বলে অর্থাৎ জ্ঞানত ও স্বেচ্ছায় যে মিথ্যা বলে সেটা একটা সমস্যা তৈরি করে। শিশুর এই কারণে অকারণে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার কারণটি খুঁজে বের করতে হবে।

কারণ

১. যে পরিবারে বাবা-মা মিথ্যা বলেন সে পরিবারে ছোট শিশু তাদের অনুসরণ করে বলে সেও মিথ্যা বলে।
২. বাবা-মাকে ফাঁকি দেয়ার জন্য বা তাদের শাস্তির ভয়ে মিথ্যা বলে।
৩. সমবয়সী বন্ধু দল গঠনের বা দল থেকে বাতিল হবার ভয়ে মিথ্যা বলে।
৪. অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা ভীতিজনক পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলে।
৫. অবহেলিত ও অনাদৃত শিশুরা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মিথ্যা বলে।
৬. অতৃপ্ত বাসনা পূরণের জন্য শিশু মিথ্যা বলে। নিজের অবচেতন মনে না পাওয়ার ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য অনেক সময় মিথ্যা বলে।
৭. অত্যধিক মানসিক চাপের সম্মুখীন হলে শিশু পরিস্থিতি মোকাবেলা না করতে পারলে মিথ্যা বলে।

প্রতিকার

১. শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়। তারা বাবা মাকে ছোট থেকেই অনুসরণ করে। শিশুকে কোন কথা দিলে যথাসম্ভব তা রাখার চেষ্টা করতে হবে না করতে পারলে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে হবে। সেজন্য বাবা মাকে খুব সাবধানে কথা বার্তা বলতে হবে। যাতে শিশুরা তাদের থেকে ভাল ও সত্য জিনিস গ্রহণ করতে শেখে।
২. শিশু কেন বাবা-মাকে ফাঁকি দিতে চায় বা তাদের ভয় করে এটার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। অনেক সময় বিশেষ করে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ কম হলে বা পড়ার বিষয় আগ্রহ কম হলে সে ফাঁকি দিতে চায়।
৩. ছোট থেকেই শিশু যেন সত্যবান, আদর্শবান ও নীতি পরায়ণ বন্ধু সংস্রবে মেশে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। অন্যথায় সে বন্ধু সংস্রবে মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের অপরাধ গোপন করে। শিশুকে নানাভাবে পুরস্কৃত করে, শাস্তি না দিয়ে সত্যবান হওয়াতে চেষ্টা করতে হবে।
৪. যে সমস্ত শিশুরা আদর যত্ন স্নেহ ভালবাসা পায় না তাদের অবচেতন মনে সব সময়ই একটা না পাওয়ার বেদনা কাজ করে। যেখান থেকে অনেক শিশু বাহাদুরী নেবার জন্য অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মিথ্যা বলে। সে জন্য শিশুর গৃহ পরিবেশ অত্যন্ত আদর, যত্ন, স্নেহ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হতে হবে।
৫. অনেক সময় শিশু বিদ্যালয়ের কাজে মনোযোগ দেয় না বা পরীক্ষার খারাপ ফলাফলের কথা বাবা মাকে বলে না। এক্ষেত্রে বাবা মা ছেলের কথা উপেক্ষা করে তার উপর আরও মানসিক চাপ দিতে থাকে তখন শিশু তার অসফলতার ভয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এব্যাপারে পরিবারের সদস্যদের শিশুর সঙ্গে সহযোগিতা ও ধৈর্য্য দেখাতে হবে।

'না' এর প্রবণতা

শিশু বর্ধনের নানা পরিবর্তনে শিশুর নেতিবাচক মনোভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত দুই তিন বছরের শিশুদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই সময় তাদের ভেতর সবসময়ই বিপরীতধর্মী কাজ করতে দেখা যায়। প্রায় কথাতেই 'না' কথাটি ব্যবহার করে এমনকি যুক্তিসঙ্গত কথাতেও সেটা দেখা যায়। স্বাধীন মতামত দাড় করাবার চেষ্টা করে এবং তার কাঙ্খিত বস্তুটিকে পাবার জন্য প্রতিবাদ করে তার জেদ ও কাজে সে অটল থাকে। শিশুর বয়স যখন

তিন/চার তখন সে নিজের ক্ষমতায় পারুক না পারুক, এমন একটি ভাব দেখায় যেন সব পরিস্থিতি তার নিজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এক্ষেত্রে বাধা দান করলেই সে প্রবলভাবে 'না' বলে প্রতিবাদ করে। যেমন বেশ ওজন বিশিষ্ট কোন ভারী মালামাল বহন করতে বা সরাতে সে নিজের পারদর্শীতা দেখায়। এক্ষেত্রে অন্যরা সাহায্য করতে চাইলে সে 'না' বলে হাত সরিয়ে দেয়।

বাবা-মা, স্কুল শিক্ষক, বড় ভাই-বোন সকলের কাছে সে স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রকাশ করে। দুই তিন বছরের শিশুরা এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলে বা ভাবে যা তারা মোটেও বোঝে না, বা এমন সব কাজ করে যার সম্বন্ধে তার কোন যোগ্যতা নেই। আর সে জন্যই সমস্ত অসুবিধার ফলে তার ভিতর বিরোধিতামূলক প্রতিক্রিয়া হয়। 'না' প্রত্যাখান তার সত্তাকে রক্ষা করারই একটি উপায় মাত্র।

কারণ

১. পরিবারে মা-বাবার পারস্পরিক বিপরীতধর্মী আচরণ শিশু মনে নানা প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। কখনও তার প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব আবার কখনও শিশুর মত আচরণ তাকে তা করার চাপ সৃষ্টি করে।
২. বাবা-মার অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয়ের ফলে হয়।
৩. শিশুর ক্ষমতার বাইরে তার থেকে দাবী করা।
৪. শিশুর কর্মক্ষমতা, আগ্রহ, ইচ্ছা, অনুভূতি শিশুকে প্রচন্ডভাবে নেতিবাচক করে তোলে।
৫. শিশুর স্বাধীনতায় বার বার হস্তক্ষেপ করলে তার ভেতর নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়।

প্রতিকার

১. শিশুর গৃহ পরিবেশ সুন্দর, স্বাচ্ছন্দময় ও সেখানে বাবা ও মার শাসন পদ্ধতির ভেতর সমন্বয় থাকতে হবে। এবং তাদের আচরণ শিশুর ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
২. শিশুর সাধারণ সমস্যাগুলো বাবা-মা ধৈর্য সহকারে বুঝতে চেষ্টা করবেন। যাতে সমস্যা বেশি দূরে না গড়ায়।
৩. শিশুর শরীর স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে, তার সুষম খাদ্য, ঘুম ইত্যাদি মৌলিক চাহিদাগুলো যেন পূরণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শারীরিক অসুবিধা দূর হলে তার ভেতর নেতিবাচক মনোভাব কমে আসবে।
৪. শিশুকে পর্যাপ্ত স্নেহ, ভালবাসা, মায়া-মমতা ইত্যাদি দিতে হবে। তাদের গুরুত্ব ও সম্মানসূচক মর্যাদা দিতে হবে যার ফলে পরিবারে তারা মানসিকভাবে একটা স্থান করে নেয় ফলে ধীরে ধীরে তার নেতিবাচক মনোভাব কমতে থাকে।

ভাইবোনের প্রতি ঈর্ষা

ভাইবোনদের প্রতি দ্বন্দ্ব, হিংসা ও ঝগড়াঝাটি শিশুর সামাজিক ও মানসিক জীবনকে প্রভাবিত করে। নানা কারণে ভাই-বোনের মধ্যে ঝগড়া করার প্রবণতা বা পরস্পরকে হিংসা করার প্রবণতা দেখা দেয়। ছেলেবেলার এই ঈর্ষা যদি দৃঢ়ভাবে ভাইবোনের মধ্যে গেঁথে থাকে পরবর্তীতে অনেক সময় সেটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য ছেলেবেলার ভাই-বোনের সম্পর্ক খুব মধুর হতে হয়। এজন্য বাবা-মাকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হয়। নানা কারণে এরূপ সমস্যা তৈরি হয় যেমন-

১. শিশুর অবস্থানের উপর বাবা-মার পক্ষপাতিত্ব: অনেক পরিবারে বাড়ির বড় ছেলে বা কনিষ্ঠ মেয়ে বাবা-মার অতি আদরের হতে দেখা যায়। অনেক পরিবারেই নির্দিষ্ট একটি ছেলে বা মেয়েকে বেশি যত্ন ও প্রশ্রয় দেয়া হয়। এতে অন্য ভাইবোনদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। সাফল্য লাভ করার পরেও যে শিশুটি পরিবার থেকে কম প্রশংসিত বা স্বীকৃতি পায় সে সন্তানটির মনে গভীর রেখাপাতের সৃষ্টি হয়। যার জন্য তার ভেতর হতাশা আসে ও অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। অনেক সময় প্রথম সন্তানের প্রতি বাবা-মার নির্ভরশীলতা সুযোগ সুবিধা, স্বাধীনতা বেশি বিধায় অন্য সন্তানদের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার অভাব দেখা যায় ফলে ভাইবোনদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতা আসে ও একে অন্যকে ঈর্ষা করতে থাকে।
২. বাড়িতে নতুন শিশুর আগমনে অন্য শিশুদের দিকে বাবা-মার মনোযোগ কমে যায় জন্য তারা নতুন শিশুটির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়।

শিশুদের এই মনোভাব শিশু বয়সের জন্য স্বাভাবিক বলে ধরে নিলেও যদি এই মনোভাব চলতে থাকে তখন পরবর্তী জীবনের জন্য সেটা আশংকাজনক। কাজেই ভাই-বোনের সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে হবে-

১. প্রতিটি শিশুর পারিবারিক অবস্থান ও তাদের সমান মর্যাদা দিতে হবে। বাবা-মা সন্তানদের সঙ্গে এমনি আচরণ করবেন যাতে কোন শিশুই নিজেকে অপ্রয়োজনীয় বা অবহেলিত মনে না করতে পারে।
২. প্রত্যেকে যেন নিজ কাজে প্রশংসিত ও স্বীকৃতি পায় সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
৩. বাড়িতে নবজাতকের আগমন বার্তায় প্রত্যেকে যেন মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। ছোটকে ছোটদের মত ও বড়দের বড়দের মত ভালবাসতে শেখান বাবা-মার দায়িত্ব।
৪. কোন সন্তান কে নিয়েই বেশি মাতামাতি করা ঠিক নয়।
৫. দুটি সন্তানের পারস্পরিক তুলনা পরিহার করতে হবে।

সারাংশ

শিশুর জীবনে বিভিন্ন রকম আচরণগত সমস্যা দেখা যায়; যেমন- আঙ্গুল মুখে দেওয়া, মিথ্যা বলা, 'না' এর প্রবণতা, ভাইবোনের প্রতি ঈর্ষা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সাধারণত শিশুর মানসিক ও শারীরিক অপূর্ণতা এবং পারিবারিক সম্পর্কের অসঙ্গতির কারনেই হয়ে থাকে। শিশুর প্রতি স্নেহ, ভালবাসা, মনোযোগ, যত্ন, মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক সুন্দর গৃহ পরিবেশ, শিশুর সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি নিশ্চিত হলে আচরণগত সমস্যা তৈরি হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (√) দিন

১। শিশুর দুধ পান অসম্পূর্ণ হলে কি ধরনের সমস্যা দেখা যায়?
ক. শিশু মিথ্যা কথা বলে
খ. শিশুর 'না' বলার প্রবণতা দেখা যায়
গ. শিশু ভাই-বোনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়
ঘ. শিশু আঙ্গুল মুখে দিয়ে চোষে

২। বাবা-মাকে ফাঁকি দেয়ার জন্য বা তাদের শাস্তির ভয়ে শিশু কি করে?
ক. আঙ্গুলে চুষে
খ. না বলার প্রবণতা দেখা যায়
গ. ভাই-বোনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়
ঘ. শিশু মিথ্যা কথা বলে

৩। ভাই-বোনের মধ্যে সম্পর্ক মধুর ও সুন্দর রাখার জন্য কে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে?
ক. দা-দাদী
খ. নানা-নানী
গ. বাবা-মা
ঘ. চাচা-চাচী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিশুর বিভিন্ন রকম আচরণের সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
২। শিশুর আচরণগত সমস্যার প্রতিকার কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ- ৫.৪ ঃ একই বয়সের শিশুর আচরণের মিল ও অমিল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- একই বয়সের শিশুদের আচরণের মিল খুঁজে পাবেন
- একই বয়সের শিশুদের আচরণের অমিল বর্ণনা করতে পারবেন

শিশু জন্ম মুহূর্ত থেকে ক্রমবর্ধমান জীব। শিশুর জন্ম মুহূর্ত থেকে দশ বার বছর সময়সীমা পর্যন্ত তার শৈশবকাল ধরা হয়। এই বয়সসীমার মধ্যে শিশুর এমন সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা অন্য বয়সে দেখা যায় না। শিশুর বর্ধন ও বিকাশ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। পৃথিবীতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতার কারণে দুটি শিশু কখনই এক হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দুজনের বিভিন্ন আচরণে মিল থাকলেও পাশাপাশি নানাবিধ অমিল দেখা যায়। সকল শিশুর বিকাশের প্রকৃতি একই রকম হয়। যেমন শিশু প্রথম বসতে শেখে, পরে দাঁড়াতে শেখে, পরে হাঁটতে শেখে এবং একসময় সে দৌড়াতে শেখে। প্রাকৃতিক কারণেই দুটি শিশুর মধ্যে অথবা শিশুতে শিশুতে পার্থক্য দেখা যায়।

নবজাতক শিশু

মিল

১. সকল নবজাতক শিশু সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করলে তা কান্নার মাধ্যমে সর্বপ্রথম তার আগমনের বার্তা সবাইকে জানায়।
২. শিশু ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২০ ঘন্টাই ঘুমিয়ে থাকে।
৩. খুব ছোট শিশুর দেহের তুলনায় মাথা ও কপাল বড় হয়।
৪. ১ থেকে ৪ মাস বয়সের মধ্যে শিশু মাকে সবচেয়ে বেশি চিনতে পারে, বিশেষ করে যদি সে মাতৃদুগ্ধ পান করে। ক্ষুধার্ত শিশুর যে দিকে স্পর্শ করা হয় শিশু সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে হা করে। শিশু প্রথমে চোখ, মাথা, ঘাড় এবং পরে বাহু, কনুই ও আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।
৫. হঠাৎ শব্দে চমকে উঠলে দেহটাকে শক্ত করে পাদুটো উপরে উঠায় ও হাত দুটো বুকের কাছে টেনে আনে।
৬. আত্মরক্ষামূলক কিছু সহজাত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কোন স্থানে আঘাত পেলে হাত গুটিয়ে আনে। তীব্র আলো মুখে পড়লে চোখ বন্ধ করে, মুখের উপর কাঁথা, কাপড় পড়লে হাত দিয়ে তা সরাবার চেষ্টা করে।
৭. সকল নবজাতকের মাথার মাঝখানের তালুতে বেশ কিছুটা অংশ নরম তুলতুলে থাকে বেশ কিছু দিন। অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় মুখশ্রী অনেক সুশ্রী দেখায়।
৮. ২-৩ মাসে শিশু এক পাশে ফিরতে সক্ষম হয়।
৯. দেহত্বক খুব মসৃণ ও সংবেদনশীল হয়।
১০. একটি সুস্থ স্বাভাবিক নবজাতক শিশু সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।
১১. সাধারণত ৫ মাস বয়সে কমবেশি সকল শিশু গড়াগড়ি যায়, ৮ মাসে বুক দিয়ে হাঁটে, ৯ মাস বয়সে হামাগুঁড়ি দেয়, ১২ থেকে তের মাস বয়সে শিশু হাঁটতে শেখে।

অমিল

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতার কারণে দুটো শিশুর আচার-আচরণে পার্থক্য দেখা যায়। বংশগত ও পরিবেশগত পার্থক্যই এই স্বাতন্ত্রতার অন্যতম কারণ।

১. সব নবজাতক সব শিশু জন্ম স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে হয় না। অস্ত্রোপচারের সাহায্যেও শিশু জন্মগ্রহণ করে।
২. স্বাভাবিক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে সবাই জন্মায় না। চোখ, নাক, কান, পাকস্থলীর নানাবিধ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।
৩. পূর্ণ সময়ের পূর্বে যেসব শিশু ভূমিষ্ট হয় তাদের ভেতর নানাবিধ অসুবিধা দেখা যায়।
৪. শরীরের তাপ ও ওজনে পার্থক্য দেখা যায়।
৫. অনেক শিশু দিনে ঘুমাতে পছন্দ করে আবার অনেকে রাতে বিরক্ত করে না।
৬. খাদ্যের প্রতি সকলের একই রকম আগ্রহ থাকে না।
৭. মাতৃদুগ্ধের প্রতি গভীর আকৃষ্ট হয় আবার কোন কোন শিশু তা মোটেও গ্রহণ করতে চায় না। করলেও স্বেচ্ছায় বন্ধ করে।
৮. ছেলে ও মেয়ের আকৃতিগত পার্থক্য থাকে। ছেলেরা সাধারণত লম্বা হয়।

প্রাক্-বিদ্যালয় শিশু

সাধারণত ৩ বছর বয়স থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে এই পর্যায়ে ফেলা হয়।

মিল

১. এই সময় চলাফেরায় স্বাধীনতা আসে।
২. দু' শব্দ যোগে বাক্য রচনা করতে শেখে।
৩. হ্যাঁ এবং না বলার প্রবণতা বাড়ে।
৪. শিশুর চঞ্চলতা ও দুরন্তপনা বাড়তে থাকে।
৫. সে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা স্বাচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করতে ভালবাসে।
৬. ভীতিজনক কথা বা পরিস্থিতিতে সহজেই ভয় পায়।
৭. অত্যন্ত কৌতূহলী হয়। সব কিছু কেন, কি, কখন ইত্যাদি প্রশ্নে মাকে জর্জরিত করে তোলে।
৮. ২০০ থেকে ২৫০ টি শব্দ আয়ত্ত করতে পারে।
৯. ছেলে মেয়ের পার্থক্য করতে পারে।
১০. দৈহিক গড়নের পরিবর্তন হয়। থুতনি ও ঘাড়ের বৃদ্ধি হয় এবং পায়ের হাড়ও বৃদ্ধি হয়।
১১. দলবদ্ধ হয়ে খেলতে অভ্যস্ত হয়।
১২. নিজের জিনিসপত্র চিনতে পারে ও নিজের জিনিসের প্রতি সজাগ হয়।
১৩. ঘুম, আবেগ ও মনোযোগ কমতে শুরু করে।

অমিল

১. অনেক শিশুর ভেতর স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয় না। অনেকে মার প্রতি অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়।
২. অনেকে স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ততার বদলে নির্জীব হয়। চুপচাপ, ঠান্ডা, অসংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়।
৩. অন্যের সঙ্গে মিশতে চায়না। 'মা' ছাড়া বাড়ির সকলের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে।
৪. বিনা কারণে জিদ করতে থাকে।
৫. একটানা অনেকক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়। অনেক বাসনা কান্না দিয়ে পূর্ণ করবার প্রবণতা দেখা যায়।
৬. বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে শিশুতে শিশুতে পার্থক্য দেখা যায়। কেউ অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন, কেউ মাঝারি বা কেউ হীন বুদ্ধি সম্পন্ন হয়।
৭. নিজের মধ্যে থাকতেই পছন্দ করে। মাকে বাবার থেকে পৃথক চোখে দেখতে পছন্দ করে। নিজে পারা সত্বেও মাকে দিয়ে তা ইচ্ছানুযায়ী কাজ জোর করে করিয়ে নিতে বাধ্য করে।
৮. কখনও কখনও শিশুর মধ্যে 'না' সূচক মনোভাব অত্যধিক পরিলক্ষিত হয়।

বিদ্যালয়গামী শিশু

৬ থেকে ৯ কিম্বা ১০ বছরের শিশুরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

মিল

১. দৈহিক বৃদ্ধি ধীরে ধীরে চলতে থাকে।
২. ছেলে মেয়ের দৈহিক গড়নে তেমন পার্থক্য হয় না।
৩. মাথার বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেলেও দেহের, হাতের ও পায়ের বৃদ্ধি চলতে থাকে। ফলে সে খেলাধুলা, লাফালাফি ও দৌঁড়াদৌঁড়িতে পারদর্শী হয়।
৪. ছেলে মেয়েরা আলাদা আলাদা খেলতে পছন্দ করে।
৫. বন্ধু বান্ধবকে বেশি পছন্দ করে ও তাদের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ে।
৬. শিশুরা দায়িত্ব নিতে চায় ফলে দায়িত্ব জ্ঞান বাড়ে।
৭. শিশুর অঙ্গসঞ্চালন নিপুণতা আসে ফলে শিশু হাতের লেখা, ছবি আঁকা, কাগজ কাটা ইত্যাদি ভালভাবে রপ্ত করতে পারে।
৮. শিশু এই বয়সে ক্ষমতা-অক্ষমতা ও তার আগ্রহ সম্পর্কে সচেতন হয়।

৯. আত্মকেন্দ্রিকতা ভাব কাটিয়ে সমাজকেন্দ্রিক মনোভাব দেখা যায়। বিভিন্ন দলে কাজ করতে পছন্দ করে। ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে, মেয়েরা মেয়েদের দলে মিশে খেলা করতে পছন্দ করে।
১০. দৈহিক সৌন্দর্য কিছুটা ম্লান হয় এবং হঠাৎ করে বাড়তে থাকে হাত ও পা।
১১. শিক্ষকদের বিরাট মর্যাদার আসনে অধিষ্টিত করে। তাদের কথা অসম্ভব মান্য করে। তাদেরকে জীবনের আদর্শ ভাবে।
১২. অনুমানের উপর কথা না বলে যুক্তির মাধ্যমে কোন সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে ও সমাধানের পথ খোঁজে।

অমিল

১. স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে কেউ কেউ হঠাৎ করে উচ্চতা, ওজন ও দৈহিক আকৃতিতে অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠে।
২. কেউ কেউ অন্তর্মুখী আবার কেউ কেউ বহির্মুখী হয়।
৩. ছেলেরা হঠাৎ করে বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে। বাবা মার কথার গুরুত্ব দেয় না।
৪. আবার অনেকে নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ ও অসংবেদনশীল হয়।
৫. লেখাপড়ায় অমনোযোগীতা প্রকাশ পায় অন্যদিকে খেলাধুলায় আগ্রহ প্রবলতর হয়।
৬. কোন কিছুর অসাফল্য ও অকৃতকার্যতা তার ভেতর হতাশার সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ বিভিন্ন শিশুর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কেউ কেউ মনোযোগী হয় আবার কেউ কেউ সঠিক নির্দেশনার অভাবে বিপথে পরিচালিত হয়।

সারাংশ

সকল শিশুর সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার অধিকার আছে। গৃহের সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে যা আর দশটা শিশুর স্বাভাবিক আচরণের সঙ্গে মিলে যায়। এর ব্যতিক্রম হলে নানা রকম আচরণে অমিল দেখা যায়। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুদের মধ্যে আচরণগত কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যা সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে শিশুকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠাতে সাহায্য করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নবজাতক শিশু স্বাভাবিকভাবে কতক্ষণ ঘুমায়?

ক. ১০ ঘন্টা খ. ১২ ঘন্টা
গ. ১৬ ঘন্টা ঘ. ২০ ঘন্টা

২। কোন পর্যায়ের শিশুর মধ্যে প্রথম চলাফেরায় স্বাধীনতা আসে?

ক. নবজাতক শিশুর মধ্যে খ. প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর মধ্যে
গ. বিদ্যালয়গামী শিশুর মধ্যে ঘ. নবজাতক থেকে বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একই বয়সের শিশুদের স্বভাবে মিল ও অমিলগুলো আলোচনা করুন।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ৫

অনুশীলনী- ৫.১ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ

অনুশীলনী- ৫.২ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ

অনুশীলনী- ৫.৩ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। গ

অনুশীলনী- ৫.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ

ইউনিট ৬

দেহে খাদ্যের পরিপাক

ভূমিকা

আহারের মাধ্যমে আমরা খাদ্যবস্তুকে গ্রহণ করি। খাদ্যের পুষ্টি উপাদান রক্তে ও কোষ কলায় পৌঁছার আগে সহজ, সরল, শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত করার প্রয়োজন হয়। এই পরিণতিকে খাদ্যের পরিপাক ও পরিশোষণ বলে।

এই ইউনিটে মানবদেহের পরিপাকতন্ত্রের ধারণা, দেহে খাদ্য উপাদানের পরিপাক ক্রিয়া ও পরিশোষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটকে ছয়টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে-

পাঠ- ৬.১ ঃ দেহে খাদ্য পরিপাকের সংজ্ঞা
পাঠ- ৬.২ ঃ পরিপাক তন্ত্র
পাঠ- ৬.৩ ঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের পরিপাক
পাঠ- ৬.৪ ঃ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাক
পাঠ- ৬.৫ ঃ স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক
পাঠ- ৬.৬ ঃ পরিপাকতন্ত্রে খাদ্যের শোষণ

পাঠ- ৬.১ ঃ দেহে খাদ্য পরিপাকের সংজ্ঞা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্যের পরিপাকের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবেন
- পরিপাকের সাধারণ ধারণা লাভ করবেন
- পরিপাকের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন

পরিপাক হচ্ছে একটি বিশেষ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় জটিল, অদ্রবণীয়, অশোষণীয় খাদ্য উপাদানসমূহ বিশ্লেষিত হয়ে সহজ, সরল ও দ্রবণীয় অণুতে পরিণত হয় এবং শোষণযোগ্য হয়ে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

পরিপাক ক্রিয়া নির্দিষ্ট উৎসেচক (enzymes), পাচকরস (gastric juice), ও হরমোনের সহায়তায় সংঘটিত হয়। খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া একটি বিশেষ তন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সেই তন্ত্রকে পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (digestive system) বলে। এই তন্ত্র মানবদেহের মুখবিবর (mouth) হতে আরম্ভ হয়ে মলদ্বার (anus) পর্যন্ত বিস্তৃত।

পরিপাকের সংজ্ঞা

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৌষ্টিক তন্ত্রের ভেতর জটিল, অদ্রবণীয়, অশোষণীয় খাদ্য উপাদানসমূহ (প্রোটিন, শ্বেতসার, তেল ও চর্বি) নির্দিষ্ট উৎসেচক, পাচকরস ও হরমোনের উপস্থিতিতে এবং প্রভাবে পর্যায়ক্রমে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে শোষণযোগ্য, সরল খাদ্যসারে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে।

অধিকাংশ খাদ্যবস্তু বৃহৎ ও জটিল অণু আকারে গৃহিত হয়; যেমন- শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহ। কিন্তু এসব খাদ্য উপাদান দেহে সরাসরি শোষিত ও গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই এদেরকে ধাপে ধাপে পরিপাককারী উৎসেচকের প্রভাবে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে সহজতর অণুতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয়। যেমন ভাতের শ্বেতসার অথবা ডিমের প্রোটিন কখনই সরাসরি রক্তে পৌঁছাবে না বা পুষ্টিসাধন করবে না; যতক্ষণ না পর্যন্ত শ্বেতসার ভেঙ্গে গ্লুকোজ ও প্রোটিন ভেঙ্গে এ্যামাইনো এসিড তৈরী হয়। খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদান শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ হতে উৎপন্ন গ্লুকোজ বা অন্য কোন একশর্করা, এ্যামাইনো এসিড, গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিড দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিভিন্ন কোষ কলায় পৌঁছায়। পরিপাক ক্রিয়া এই জটিল কাজটি সম্পন্ন করে তাই দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য পরিপাক অপরিহার্য।

পরিপাক ক্রিয়া দুটো পর্যায়ের সমন্বয় ঘটে-

(১) যান্ত্রিক পর্যায় (mechanical phase)

(২) রাসায়নিক পর্যায় (chemical phase)

প্রথম পর্যায়ে খাদ্যবস্তুর বড় অংশকে দাঁত ও জিহ্বার সমন্বিত ক্রিয়ায় পিষে ছোট কণায় পরিণত করা হয় এবং লালা রসের সাথে মিশে নরম, পিচ্ছিল মন্ডতে পরিণত করা হয়। পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যমন্ডের সঞ্চালন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। একে ক্রমসংকোচন (Peristalsis) বলে। এটা পরিপাক ক্রিয়ার যান্ত্রিক পর্যায়ে পড়ে।

পরিপাকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল রাসায়নিক পর্যায়। এই পর্যায়ে পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থি হতে নিঃসৃত পাচকরস, হরমোন ও উৎসেচকের প্রভাবে খাদ্যবস্তুর জটিল বন্ধনী ও আকৃতি ভেঙ্গে ক্ষুদ্রতম অণুতে বিশ্লেষিত হয়। মুখের লালারস, পাকস্থলীর প্রাচীরের অভ্যন্তর হতে ক্ষরিত পাচকরস, অগ্নাশয় রস, পিওথলি হতে পিওরস, ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর হতে আন্দ্রিক রসের বিভিন্ন উৎসেচক ও রাসায়নিক পদার্থ খাদ্য উপাদানের জটিল আকার এবং প্রকৃতিকে বিশ্লেষিত করে সরল ও দ্রবণীয় করে তোলে। খাদ্যের যে অংশ উৎসেচকের প্রভাবে পরিপাক হয় না, তা বৃহদান্ত্রে পৌঁছায়। এর মধ্যে খাদ্যাংশ, অপাচ্য সেলুলোজ অন্যতম। এসব বস্তু মল তৈরিতে সহায়তা করে।

খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত খনিজ উপাদান ভিটামিন ও পানি পরিপাক ছাড়াই সরাসরি দেহের অভ্যন্তরে শোষিত হয়। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন, তেল চর্বির উপস্থিতিতে ভালভাবে শোষিত হয়।

দেহে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া বেশ কয়েকটি অবস্থা দিয়ে প্রভাবিত হয়। উদারাময়, আমাশয় ও বদহজমে পরিপাক এবং শোষণ ব্যহত হয়। অতিরিক্ত আঁশ, সেলুলোজ, অন্যান্য খাদ্য উপাদানের শোষণে বাধা দেয়। উদ্বেগ, উত্তেজনা প্রভৃতি মানসিক চাপে পরিপাককারী হরমোন ও উৎসেচকের ক্ষরণের পরিমাণ কমে যায়, ফলে খাদ্যের পরিশোষণ ভালভাবে হয় না। পরিপাকে প্রভাবিত এসকল বিষয় দেহের পুষ্টি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সারাংশ

দেহের পরিপাক তন্ত্রের মাধ্যমে গৃহীত খাদ্য উপাদানের জটিল ও বৃহৎ অণুর পর্যায়ক্রম আর্দ্র বিশ্লেষণকে পরিপাক ক্রিয়া বলে। পরিপাক একটি জৈব প্রক্রিয়া, যেখানে নির্দিষ্ট উৎসেচক ও পাচকরসের প্রভাবে খাদ্যের শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ বিশ্লেষিত হয়ে সরল শোষণযোগ্য গ্লুকোজ, এ্যামাইনো এসিড, গ্লিসেরল ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন

১। পরিপাক ক্রিয়ায় কোনটি সংঘটিত হয়?
ক. খাদ্যবস্তুর আর্দ্র বিশ্লেষণ হয় খ. খাদ্যের উপাদান শোষণযোগ্য হয়
গ. খাদ্যবস্তু নরম হয় ঘ. উপরের সব কয়টি

২। কোনটি দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়?
ক. পানি খ. উৎসেচক
গ. রক্ত ঘ. ঘাম

৩। কোনটি পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে পড়ে না?
ক. হাত খ. পাকস্থলী
গ. ক্ষুদ্রান্ত্র ঘ. মুখবিবর

৪। পরিপাকের যান্ত্রিক পর্যায় কোনটি?
ক. চিবানো খ. নিঃসরণ
গ. আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘ. শোষণ

রচনামূলক

১। পরিপাক ক্রিয়ার সংজ্ঞা দিন ।
২। পরিপাকে শ্বেতসার ও প্রোটিনের কি রূপান্তর হয়? পরিপাকের কয় পর্যায় ও কি কি?
৩। পরিপাকে কি কি বিষয় প্রভাবিত করে?

পাঠ- ৬.২ ঃ পরিপাকতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মানবদেহের পরিপাক সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন
- পরিপাকতন্ত্রের সাথে জড়িত গ্রন্থি ও পাচকরসের নাম ও কাজ সম্পর্কে অবগত হবেন
- পরিপাকক্রিয়ার ধারাবাহিকতা সর্ম্পকে জানতে পারবেন

পরিপাকতন্ত্র একটি একনলবাহী নালী। এর দৈর্ঘ প্রায় ৮-১০ মিটার। এই নালীর সাথে সংযুক্ত আছে পরিপাকে ও বিপাকে সহায়তাকারী গ্রন্থিসমূহ। সুতরাং পরিপাকতন্ত্রে দুটো অংশ আছে ঃ

(১) পৌষ্টিক নালী (alimentary canal) ঃ মুখবিবর, গলবিল, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও মলাশয়।

(২) পরিপাক গ্রন্থিসমূহ (digestive glands) ঃ লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়, যকৃত, আন্ত্রিক গ্রন্থি।

মুখবিবর ঃ মুখবিবর হচ্ছে একটি গহ্বর বিশেষ যার অগ্রভাগে দুটো ঠোঁট দিয়ে বেস্টিত মুখছিদ্র আছে। মুখবিবর হচ্ছে পৌষ্টিকনালীর প্রবেশ দ্বার। মুখগহ্বরের ভেতর দু'পাটি দাঁতের সারি, একটি মাংসল জিহ্বা ও গহ্বরের পেছনে ঝুলন্ত আলজিব বিদ্যমান।

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যেক চোয়ালের মাড়িতে ১৬টি দাঁত থাকে মধ্যখানে ৪টি কর্তন, তার দু পাশে ১টি করে ছেদন, ছেদনের পাশে ২টি করে চর্বন এবং চোয়ালের দু প্রান্তে ৩টি করে পেষণদাঁত রয়েছে।

মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু মুখগহবরে প্রবেশ করে এবং সেখানে দাঁত ও জিহ্বার সমন্বিত ক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু কাটা, ছেঁড়া ও পেষা হয়। এই ক্রিয়ায় মুখের লালাগ্রন্থি হতে নিঃসৃত লালারস খাদ্যকে পিচ্ছিল, নরম ও গলধকরণের উপযোগী করে। শ্বেতসারের পরিপাক ক্রিয়া মুখে আরম্ভ হয়।

গলবিল ঃ মুখবিবর এবং অন্ননালীর মধ্যবর্তী ছোট অংশকে গলবিল বলে। গলবিলের মাধ্যমে আংশিক পরিপাককৃত লালামিশ্রিত খাদ্য মুখগহবর থেকে অন্ননালীতে পৌছায়।

অন্ননালী ঃ গলবিলের পর থেকে প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা নলাকার অন্ননালী পাকস্থলীর অগ্রভাগে এসে শেষ হয়। অন্ননালীর পেশন সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

পাকস্থলী ঃ পেটের উপরের অংশে, মধ্যচ্ছেদার নিচের গহবরের অংশে ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো পাকস্থলি আছে। এর প্রাচীর অত্যন্ত পুরু, মিউকাস স্তরযুক্ত ও পেশীবহুল। পাকস্থলীর সম্মুখভাগ অন্ননালীর সাথে এবং পশ্চাৎভাগ ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামের সাথে যুক্ত। পাকস্থলীকে কয়েক অংশে ভাগ করা হয়েছে। যথা

(ক) অন্ননালীর পরবর্তী অংশকে কার্ডিয়া (cardia) বলে। এদের সংযোগস্থলে কার্ডিয়াক স্ফিংটার নামক পেশীবলয় আছে।

(খ) কার্ডিয়াকের বাঁ পাশে গম্বুজ আকারের অংশকে ফান্ডাস বলে।

(গ) ফান্ডাসের পরবর্তী পাকস্থলীর মধ্য অঞ্চলকে পাকস্থলীর দেহ বলে।

(ঘ) পাকস্থলীর যে প্রান্তটি ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়েছে, তা পাইলোরাস নামে পরিচিত। পাইলোরাস ও ডিওডেনামের মধ্যস্থলে একটি পেশী বলয় আছে, যাকে পাইলোরিক স্ফিংটার বলে।

পাকস্থলীর অন্ত্র ঃ প্রাচীরের গায়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি থাকে, যা থেকে পাচকরস নিঃসৃত হয়।

পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু সাময়িকভাবে জমা থাকে। পাচকরসের হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও মিউসিন খাদ্যবস্তুকে যথাক্রমে জীবাণুমুক্ত ও পিচ্ছিল করে।

চিত্র ঃ মানবদেহের পরিপাক তন্ত্র

ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) ঃ পাকস্থলীর পেছনে ৬-৭ মিটার লম্বা ক্ষুদ্রান্ত্র অবস্থিত। এটি পাইলোরিক স্ফিংটারের পর হতে আরম্ভ হয়ে বৃহদান্ত্রের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা ঃ

(ক) ডিওডেনাম বা গ্রহণী। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম ২৫-৩০ সে:মি: U অংশটিকে গ্রহণী বলে।

(খ) জেজুনাম হচ্ছে ডিওডেনামের পরবর্তী অংশ এবং লম্বায় প্রায় ২.৫ মিটার।

(গ) ইলিয়াম ক্ষুদ্রান্ত্রের সর্বশেষ অংশ এবং মোট ক্ষুদ্রান্ত্রের তিন পঞ্চমাংস লম্বায়। ইলিয়ামের অন্ত:প্রাচীরে অসংখ্য আঙ্গুলের প্রবৃদ্ধি বা ভিলাস থাকে।

ক্ষুদ্রান্ত্র পাকস্থলী থেকে প্রাপ্ত পাকমন্ডের অগ্রসর ঘটায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরের পৌষ্টিক গ্রন্থি হতে ক্ষরিত রস পরিপাকের গতিকে ত্বরান্বিত করে। ডিওডেনামে অগ্নাশয় রস ও পিত্তরস নিঃসৃত হয় এবং খাদ্যের প্রোটিন, শ্বেতসার ও চর্বির আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটায়। পাচিত খাদ্যসার যেমন গ্লুকোজ, এ্যামাইনো এসিড, গ্লিসেরল, ফ্যাটি এসিড ইলিয়ামের ভিলাই হতে সরাসরি রক্ত বাহিকায় ও লসিকা বাহিকায় শোষিত হয়।

পিত্তথলি (Gall blader) ঃ যকৃতের তলদেশে অবস্থিত। যকৃত থেকে পিত্তরস সংশ্লেষিত হয়ে পিত্তথলিতে জমা হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের উপস্থিতিতে পিত্তরস হরমোনের প্রভাবে নিঃসৃত হয়। পিত্তথলি হতে পিত্তর সপরিবাহী পিত্তনালী এবং অগ্নাশয় হতে অগ্নাশয়রস পরিবাহী অগ্নাশয়নালী মিলিত হয়ে একটি সাধারণ পিত্ত অগ্নাশয় নালী (hepatopancreatic duct) গঠিত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের সামনের অংশের এম্পুলার গহ্বরে উন্মুক্ত হয়।

বৃহদান্ত্র (Large intestine) ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী অপেক্ষাকৃত মোটা নলাকৃত অংশ যা পায়ু (anus) পর্যন্ত বিস্তৃত তাকে বৃহদান্ত্র বলে। এর দৈর্ঘ্য ২ মিটার। এর কয়েকটি অংশ হচ্ছে-

(ক) সিকাম- বৃহদান্ত্রের প্রথম অংশ এর একটি বদ্ধ অংশে ছোট নলাকৃত এ্যাপেন্ডিকস অবস্থিত।

(খ) কোলন- সিকামের পর ১৫-১৯ সে.মি. লম্বা কোলনের তিনটি অংশ হচ্ছে- ঊর্ধ্বমুখী কোলন, আড়াআড়িভাবে অবস্থিত অণুপ্রস্থ কোলন এবং নিম্নগামী কোলন। এর পরবর্তী অংশ হচ্ছে সিগময়েড কোলন এটি S আকৃতির যা মলাশয়ে উন্মুক্ত হয়।

(গ) মলাশয় (rectum) একটি থলি বিশেষ যার শেষ প্রান্তে মলদ্বার বা পায়ুছিদ্র থাকে।

বৃহদান্ত্রে খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলে পরিণত হয়। পায়ুছিদ্র দিয়ে মল নিষ্কাষিত হয়। একে মলত্যাগ (defecation) বলে। পায়ুছিদ্রের বহিঃস্থ পেশী ঐচ্ছিক স্নায়ু দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।

পরিপাক গ্রন্থি ঃ যে সকল গ্রন্থির নিঃসরণ খাদ্য উপাদানের পরিপাকে প্রভাবিত করে সেগুলোকে পরিপাক গ্রন্থি বলে। মানবদেহের নির্দিষ্ট পরিপাক গ্রন্থি হচ্ছে ঃ

(ক) লালাগ্রন্থি (Salivary glands) ঃ মুখের ভেতর কয়েকস্থানে তিনজোড়া করে লালা গ্রন্থি আছে। জিহ্বার নিচে ১ জোড়া সাবলিঙ্গুয়াল, নিচের চোয়ালের ভেতরে ১ জোড়া সাবম্যাকিলারী এবং কানের পেছনে ১ জোড়া প্যারোটিড গ্রন্থি হতে লালারস নিঃসৃত হয়। লালারসের পিচ্ছিল পদার্থ মিউসিন খাদ্যবস্তুকে নরম পিচ্ছিল করে ও গিলতে সাহায্য করে, ডেকসট্রিন ও মলটোজে পরিণত করে।

(খ) অগ্নাশয় (Pancreas) ঃ পাকস্থলীর পেছনে ও ডিওডেনামের আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশ্র গ্রন্থি হচ্ছে আগ্নাশয়। এই গ্রন্থির স্বনালী অংশ হতে কয়েকটি উৎসচেক ও অনালী অংশ হতে শর্করা নিয়ন্ত্রণের হরমোন ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন ক্ষরিত হয়। এটি ২০ সে.মি. লম্বা ও ৫ সে.মি. চওড়া। স্বনালী অংশ হতে অগ্নাশয়রস নিঃসৃত হয়। এই রসে শ্বেতসার, প্রোটিন ও চর্বি পরিপাকের উৎসেচক থাকে।

(গ) যকৃত (Liver) ঃ মানবদেহের সবচেয়ে বড় পুষ্টি গ্রন্থি। উদরগহবরের উপরিভাগে এবং পাকস্থলীর ডান পাশে এর অবস্থান। ডান, বাঁ, কোয়াড্রেট ও কর্ডেট নামে চারটি অসম্পূর্ণ খন্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। ডান খন্ডটি সবচেয়ে বড়। যকৃতের নিচের অংশে পিত্তথলি অবস্থিত। যকৃত পিত্তরস তৈরি করে ও পিত্তথলিতে জমা রাখে। পরিপাকতন্ত্র হতে খাদ্য উপাদান যকৃতে পৌছায়। যকৃত দেহের বিপাকে ও পুষ্টি সাধনে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এছাড়াও নিচের গ্রন্থিসমূহ পরিপাকে সহায়তা করে ঃ

(ঘ) পাকস্থলীর অন্তঃপ্রাচীরের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য গ্রন্থিকোষ হতে পাচক রস ক্ষরিত হয়। এই রসে প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক থাকে।

(ঙ) আন্ত্রিক গ্রন্থি- ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের বিভিন্ন অংশে পরিপাককারী গ্রন্থিকোষ হতে আন্ত্রিক রস (intestinal juice) ক্ষরিত হয়। এই রসের উৎসেচকগুলো ডেক্সট্রিন, মলটোজ, প্রোটিন ও স্নেহের পরিপাকে সাহায্য করে।

পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ হতে উৎসেচকের নাম ও কাজ

উৎস	উৎসেচক	কাজ
লালা গ্রন্থি	টায়ালিন	শ্বেতসার ভেঙ্গে ডেক্সট্রিন ও মলটোজ উৎপন্ন হয়।
পাকস্থলীর পাচক রস	পেপসিন	প্রোটিনকে প্রোটিওজ ও পেপটোন-এ পরিণত করে।
অগ্নাশয়ের অগ্নাশয়রস	ট্রিপসিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন হতে সরল প্রোটিন ও এ্যামাইনো এসিড উৎপন্ন হয়।
ঐ	লাইপেজ	স্নেহকণাকে ভেঙ্গে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসেরল তৈরি করে।
ঐ	এ্যামাইলেজ	মলটোজ ও অন্যান্য শ্বেতসারকে গ্লুকোজে পরিণত করে।
ক্ষুদ্রান্ত্রের আন্ত্রিক রস	মলটেজ	মলটোজকে গ্লুকোজে-এ পরিণত করে
	সুক্রোজ	সুক্রোজকে গ্লুকোজে-এ পরিবর্তিত করে
	ল্যাকটোজ	ল্যাকটোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে
ঐ	লাইপেজ	স্নেহ হতে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসেরল উৎপন্ন হয়

সারাংশ

মানবদেহের পরিপাক তন্ত্রটি একটি সঞ্চালন তন্ত্র যা মুখছিদ্র হতে আরম্ভ হয়ে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই তন্ত্রের সংলগ্ন পরিপাক গ্রন্থি যেমন লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্নাশয়, আন্ত্রিক গ্রন্থি বিভিন্ন প্রকারের পাচক রস নিঃসরণ করে। এই রসে পরিপাককারী উৎসেচক ও খাদ্যবস্তুকে শোষণপযোগী করার জন্য রস, আয়ণ, লবণ প্রভৃতি থাকে। পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উপাদানের পরিপাক সংঘটিত হয় যেমন মুখে কার্বোহাইড্রেট, পাকস্থলীতে প্রোটিন ও ক্ষুদ্রান্ত্রে ফ্যাট ও অন্যান্য সব খাদ্য উপাদানই পরিপাক হয়ে শোষণ হয়। অপাচ্য খাদ্যবস্তু বৃহদান্ত্রে মলে পরিণত হয়ে দেহ হতে নির্গত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি পরিপাক গ্রন্থি নয়?

ক. পিত্তথলি খ. যকৃত
গ. প্যারোটিও ঘ. অগ্নাশয়

২। লালারসের পিচ্ছিল পদার্থের নাম কি?

ক. এনজাইম খ. মিউসিন
গ. টায়ালিন ঘ. পিত্তরস

৩। পরিপাকতন্ত্রের কোন অংশ হতে গ্যাসট্রিক জুস নিঃসৃত হয়?

ক. কোলন খ. অগ্নাশয়
গ. যকৃত ঘ. পাকস্থলী

৪। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশের নাম কি?

ক. ডিওডেনাম খ. মলাশয়
গ. গলনালী ঘ. পিত্তনালী

৫। বৃহদান্ত্রে কোনটি সংঘটিত হয়?

ক. খাদ্য শোষিত হয় খ. খাদ্য পিচ্ছিল করা হয়
গ. খাদ্য নরম করা হয় ঘ. খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলে পরিণত হয়

৬। মানবদেহের সর্ববৃহৎ বড় পুষ্টি গ্রন্থি কোনটি?

ক. অগ্নাশয় খ. যকৃত
গ. লালা গ্রন্থি ঘ. পাকস্থলী

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানুষের পৌষ্টিক নালীর চিহ্নিত চিত্র অংকন করুন।

২. নিম্নলিখিত অংশগুলোর কাজ সংক্ষেপে লিখুন। পাকস্থলী, অগ্নাশয়, ক্ষুদ্রান্ত্র
৩. পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ হতে নিঃসৃত উৎসেচকের নাম ও কাজের বিবরণ দিন।

পাঠ- ৬.৩ ঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য পরিপাক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচকের নাম বলতে পারবেন
- কার্বোহাইড্রেটের পরিপাকে অসুবিধাগুলো সনাক্ত করতে পারবেন

আমাদের খাদ্যে প্রধান কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে- শ্বেতসার (ভাত, রুটি, আলু), গ্লাইকোজেন (মাংস পেশী), সুক্রোজ (চিনি, মধু), ল্যাকটোজ (দুধ)। বেশিরভাগ শ্বেতসার সমৃদ্ধ খাদ্য রান্না করে খাওয়া হয়, যার ফলে শ্বেতসারের দানার চারদিকের সেলুলোজের আবরণ ভেঙ্গে যায়, দানা নরম ও হজমোপযোগী হয়। কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক পদ্ধতির বর্ণনা নিচে দেওয়া হোল-

মুখবিবরে পরিপাক

খাদ্য চিবানোর সময় লালারস খাদ্যবস্তুকে নরম করে। লালারসে টায়লিন ও মলটোজ নামে দুটি উৎসেচক শ্বেতসারের বন্ধনীকে বিশ্লেষিত করে ছোট আকারের ডেকসট্রিন ও সামান্য গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। টায়ালিনের ক্রিয়ায় শ্বেতসার ও গ্লাইকোজেনের মত জটিল শর্করা সরল শর্করায় পরিণত হয়। খাদ্যমন্ড পাকস্থলীতে উপস্থিত হওয়ার পরও কিছুক্ষণ পর্যন্ত টায়ালিনের ক্রিয়া চলতে থাকে।

পাকস্থলী

পাকস্থলীর পাচকরসে কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী কোন উৎসেচক নেই। তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত পাকস্থলীর পাচকরস সম্পূর্ণভাবে খাদ্যকে মিশ্রিত করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত টায়ালিনের আর্দ্রবিশ্লেষণ চলতে থাকে। পাচকরসের অম্লীয় পরিবেশে টায়ালিনের কার্যক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়। অর্ধপাচ্য খাদ্য কাইমে বা পাকমন্ডে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে।

বেশিরভাগ কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশে দুটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়

(ক) বহিঃকোষীর পরিপাক (Extracellular or intraluminal digestion)

অগ্নাশয় রসের শক্তিশালী উৎসেচক এ্যামাইলেজ শ্বেতসার, মলটোজ ডেকসট্রিন প্রভৃতি সরল কার্বোহাইট্রের বিশ্লেষণে দ্বিশর্করা উৎপন্ন করে। এ্যামাইলেজ ক্ষারীয় মাধ্যমে সক্রিয় থাকে (PH ৬.৫-৭.২)। এই মাধ্যম পিত্তরসের লবণ ও অগ্নাশয় রসের বাইকার্বোনেট দ্বারা সৃষ্টি হয়।

(খ) অন্তঃকোষীয় পরিপাক (Intracellular digestion)

ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত আন্ত্রিক গ্রন্থি হতে আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়। এই রসে তিন প্রকারের দ্বিশর্করা বিশ্লেষণকারী উৎসেচক থাকে। এগুলো হচ্ছে ঃ

সুক্রেজ (sucrase)- সুক্রোজকে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুকটোজে পরিণত করে।

মলটেজ (maltase)- মলটোজকে দুই অণু গ্লুকোজে পরিণত করে।

ল্যাকটেজ (lactase)- ল্যাকটোজকে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাকটোজে পরিণত করে।

সুতরাং দেখা যায় যে কার্বোহাইড্রেটের সম্পূর্ণ পরিপাকে কেবলমাত্র একশর্করা উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে ৮০ ভাগ গ্লুকোজ ও অবশিষ্ট ২০ ভাগ ফ্রুকটোজ ও গ্যালাকটোজ। অন্ত:কোষীয় পরিপাক ও শোষণ ইলিয়ামে সম্পন্ন হয়।

খাদ্য উপাদানের মধ্যে কেবলমাত্র কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক খাদ্যের সেলুলোজ আঁশ প্রভৃতির নির্দিষ্ট উৎসেচক নেই বলে এদের পরিপাক হয় না। এসকল অপাচ্য অংশ বৃহদান্ত্রে পৌছায় এবং কোলনের ভেতরে ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ফ্যাটি এসিড ও গ্যাস উৎপন্ন করে।

কোন কারণে দ্বিশর্করা বিশ্লেষণকারী উৎসেচকের ক্ষরণে বাধা আসলে এই সকল শর্করার পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এর ফলে ডায়রিয়া, পেট ফাঁপা, বদহজম প্রভৃতি দেখা দেয়। অনেকের মধ্যে দুগ্ধ শর্করা ল্যাকটোজ পরিপাককারী উৎসেচক

ল্যাকটেজের অভাব দেখা দেয়। এরা দুধ হজম করতে পারে না। একে ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা (Lactose intolerance) বলে। খাদ্য হতে দুধ বাদ দিলে উপকার হয়। গমের প্রোটিন গ্লুটেনের প্রতি কারও কারও অসহিষ্ণুতা দেখা যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একপ্রকার ডায়রিয়া দেখা দেয়। একে সিলিয়াক ডিজিজ (celiac disease) বলে। গমের তৈরি খাদ্য বাদ দিলে এর উপশম হয়।

সারাংশ

কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক মুখে আরম্ভ হয়। মুখের লালা রসের উৎসেচক টায়ালিন শ্বেতসার কণাকে ভেঙ্গে ডেক্সট্রিন ও মালটোজ উৎপন্ন করে। পাকস্থলী কার্বোহাইড্রেটের কোন পরিপাক না হলেও ক্ষুদ্রান্ত্রে অগ্নাশয় রসের এ্যামাইলেজ ড্রেক্সট্রিন আরও বিশ্লেষিত করে দ্বিশর্করায় রূপান্তরিত করে। আন্ত্রিক রসের ডাইস্যাকারাইডেজে দ্বিশকর্রাকে ভেঙ্গে সব একশর্করায় রূপান্তরিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন

১। কোন খাদ্য উপাদানের পরিপাক মুখে আরম্ভ হয়?
- ক. প্রোটিন খ,. ভিটামিন
- গ. কার্বোহাইড্রেট ঘ. পানি

২। লালারসে কোন উৎসেচক থাকে?
- ক. পেপসিন খ. টায়লিন
- গ. পিত্তরস ঘ. সুক্রেজ

৩। অগ্নাশয় রসের এ্যামাইলেজ কোন মাধ্যমে বেশি সক্রিয় থাকে?
- ক. নিরপেক্ষ খ. অম্লীয়
- গ. আদ্র ঘ. ক্ষারীয়

৪। নিচের কোনটি আন্ত্রিক রসের উৎসেচক নয়?
- ক. সুক্রেজ খ. পেপসিন
- গ. মলটেজ ঘ. ল্যাকটেজ

রচনামূলক

১. আগ্নাশয় রসের কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচকের নাম লিখুন। এই উৎসেচকের প্রভাবে কি উৎপন্ন হয়?
২. ক্ষুদ্রান্ত্রে কার্বোহাটড্রেট পরিপাকের বিবরণ দিন।
৩. অপাচ্য কার্বোহাইড্রেটের কি পরিণতি হয় লিখুন।
৪. সংক্ষেপে লিখুন ঃ ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা, সিলিয়াক ডিজিজ।

পাঠ- ৬.৪ ঃ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- দেহে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের ধারণা লাভ করবেন
- প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকের নাম বলতে পারবেন
- দেহে প্রোটিনের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন

প্রোটিনবহুল খাদ্যের মধ্যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল, বাদাম উল্লেখযোগ্য। এসব খাদ্যবস্তু রান্না বা সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। উত্তাপে প্রোটিন জমাট বাঁধে, পেশীর কোলাজেন, ইলাষ্টিন প্রভৃতি নরম হয়ে জিলোটিনে পরিণত হয়। প্রোটিনের এই রূপান্তর পরিপাকে সাহায্য করে।

মুখে প্রোটিনের কোন পরিপাক হয় না। প্রোটিনের পরিপাক মূলত পাকস্থলীতে আরম্ভ হয়।

পাকস্থলীতে খাদ্য উপস্থিত হলে, পাকস্থলীর গায়ে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি হতে পাচক রস (gastric juice) ক্ষরিত হয়। এই রসে প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক পেপসিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, মিউসিন, ইত্যাদি থাকে। পেপসিন নিষ্ক্রিয় পেপ্সিনোজেন রূপে ক্ষরিত হয়। এই ধরনের নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে জাইমোজেন (zymogen) বলে। অম্লীয় পরিবেশে (PH ২-৩) পেপ্সিনোজেন সক্রিয় পেপসিনে রূপান্তরিত হয়। পেপ্সিন প্রোটিন অণুর বিভিন্ন অংশের পেপটাইড বন্ধনীর আদ্রবিশ্লেষণ ঘটায়, যার ফলে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্রতর প্রোটিন অণু প্রোটিওজ, পেপ্টোন উৎপন্ন হয়। পেপসিন ছাড়া ছোট শিশুদের পাকস্থলিতে অনেক প্রকার উৎসেচক আছে, যাকে রেনিন (Rennin) বলে। রেনিন দুধের প্রোটিনকে জমাঁট বাধায় এবং পরিপাকে সাহায্য করে। পাকস্থলীর পাচক রসে জিলোটিনেজ নামক উৎসেচক জিলেটিনকে আংশিক পরিপাক করে পেপটোন ও পলিপেপটাইড উৎপন্ন করে।

অধিকাংশ প্রোটিন খাদ্য পাকস্থলীর পেপসিনের ক্রিয়ায় পেপটোন ও প্রোটিওজে পরিণত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে অগ্নাশয় হতে আগত অগ্নাশয় রস এবং আন্ত্রিক রসের সম্মিলিত ক্রিয়ায় প্রোটিনের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়। ক্ষুদ্রান্তের ক্ষারীয় পরিবেশে পেপসিনের ক্রিয়া হ্রাস পায়।

আগ্নাশয় রসের প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জাইমোজেনরূপে অন্ত্রে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন, প্রোকার্বক্সিপেপটাইডেজ, ও প্রোইলাস্টেজ প্রধান। ক্ষুদ্রান্ত্রের আন্ত্রিক রসের উৎসেচক এন্টারোকাইনেজ ট্রিপসিনোজেনকে সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত করে। পরবর্তীতে ট্রিপসিন আরও ট্রিপসিনোজেনকে ক্রমাগত ট্রিপসিনে পরিণত করতে থাকে।

ট্রিপসিন আরও দুটো জাইমোজন প্রোকার্বক্সিপেপটাইডেজ ও প্রোইলাস্টেজ যথাক্রমে কার্বোক্সিপেপটাইড ও ইলাস্টেজ নামক সক্রিয় উৎসেচকে রূপান্তরিত করে। ট্রিপসিন ক্ষারীয় পরিবেশে (PH-৮) বেশি সক্রিয় এবং প্রোটিন, পলিপেপটাইড, পেপটোন প্রভৃতি অণুর পেপটাইড বন্ধনী ছিন্ন করে।

কাইমোট্রিপসিন দুধের প্রোটিন কেসিনকে ছানায় পরিণত করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃকোষ হতে কিছু পেপটাইডেজ ক্ষরিত হয় (Peptuidases)। এদের মধ্যে কার্বোক্সিপেপটাইডেজ ও এ্যামাইনোপেপটাইডেজ পেপটাইড অণুকে ভেঙ্গে আরও ক্ষুদ্রতর পেপটাইডে ও এ্যামাইনো এসিড উৎপন্ন করে। ইলাস্টেজ এর প্রভাবে ইলাস্টিন নামক যোজককলা ভেঙ্গে পেপটাইডে পরিণত হয়।

প্রোটিন ভঙ্গকারি উৎসেচককে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বলে। প্রত্যেক উৎসেচক তার নির্দিষ্ট প্রোটিন অণু ও বন্ধনী ভাঙ্গতে প্রভাবিত করে, যেমন পেপ্সিন কেবলমাত্র এ্যারোমেটিক এ্যামাইনো এসিড বিশিষ্ট বন্ধনী ভাঙ্গে।

কাইমোট্রিপসিনোজেন (এন্টারোকাইনেজ) - ট্রিপসিন
কার্বোট্রি পেপটাইডেজ (ট্রিপসিন) - কার্বোক্সিপেপটাইডেজ
প্রোইলাস্টেজ (ট্রিপসিন) - ইলাস্টেজ পেপটাইডেজ

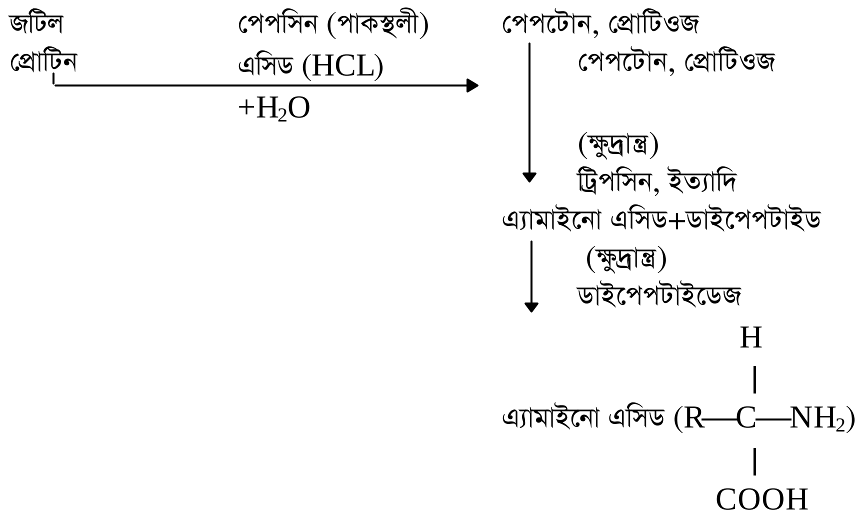

সারাংশ

খাদ্যের প্রোটিনের সর্বপ্রথম পরিপাক পাকস্থলীতে অম্লীয় পরিবেশে পেপসিন এনজাইমের প্রভাবে সংঘটিত হয়। এর ফলে প্রোটিওজ, পেপটোন উৎপন্ন হয়। অগ্নাশয় রসের ট্রিপসিন ও ডাইপেপটাইডেজের প্রভাবে প্রোটিওজ, ডাইপেপটাইড প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রোটিন অণু ভেঙ্গে এ্যামাইনো এসিড তৈরি হয়। প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকগুলো নিষ্ক্রিয় জাইমোজেন রূপে ক্ষরিত হয় এবং উপযুক্ত প্রভাবকের ক্রিয়ায় সক্রিয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন

১। ট্রিপসিনের নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে কি বলে?
ক. এন্টারোকাইনেজ খ. ট্রিপসিনোজেন
গ. ডাইপেপটাইডেজ ঘ. এ্যামাইলেজ

২। প্রোটিনের সম্পূর্ণ আদ্রবিশ্লেষণে কি পাওয়া যায়?
ক. সুক্রোজ খ. ফ্যাটি এসিড
গ. এ্যামাইনো এসিড ঘ. গ্লুকোজ

৩। পাকস্থলীর পাচক রসের প্রধান উৎসেচক কোনটি?
ক. লাইপেজ খ. টায়ালিন
গ. এ্যামাইলেজ ঘ. পেপসিন

৪। নিচের কোনটি দুধের প্রোটিন কেজিনকে ছানায় পরিণত করে?
ক. কাইমোট্রিপসিন খ. ইলাস্টেজ
গ. জিলেটিনেজ ঘ. কোলজিনেজ

রচনামূলক

১। মানবদেহে প্রোটিনের পরিপাকের বিবরণ দিন।
২। প্রোটিন পরিপাকের বিভিন্ন উৎসেচকের নাম ও কাজ সম্পর্কে লিখুন।
৩। ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রোটিন পরিপাকের ধাপগুলো সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ- ৬.৫ ঃ স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মানবদেহে স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- স্নেহের পরিপাকে বিভিন্ন উৎসেচকের নাম বলতে পারবেন
- স্নেহের পরিপাকের সাথে জড়িত অসুখগুলোর বর্ণনা করতে করবেন

আমরা দৈনন্দিন যে সব স্নেহজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি তার ভেতর উল্লেখযোগ্য, তেল, ঘি, মাখন, মাছ মাংসের চর্বি ইত্যাদি। এসব খাদ্যে ট্রাইগ্লিসেরাইডের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। স্নেহ পদার্থের পরিপাক মুখে হয় না। তবে স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পাকস্থলীতে আরম্ভ হলেও ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষ হয়। পাকস্থলীর পাচক রসের লাইপেজ সামান্য পরিমাণে দুধের চর্বিকণাকে ভেঙ্গে মনোগ্লিসেরাইড, ফ্যাটি এসিড উৎপন্ন করে। আহারে তেল, চর্বি বেশি থাকলে, পাকস্থলীতে খাদ্যের স্থায়ীকাল বেশি হয়, সহজেই ক্ষুধা পায় না।

ক্ষুদ্রান্ত্রে স্নেহপদার্থের উপস্থিতির প্রেক্ষিতে পিত্তরস ক্ষরিত হয়। এই রস আংশিক বিশ্লিষ্ট স্নেহপদার্থকে অবদ্রবে পরিণত হতে সাহায্য করে। এই অবদ্রব (emulsion) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বিকণা ও পানির সংমিশ্রণ। এই অবদ্রবে চর্বির আদ্রবণীয় কণা দ্রবীভূত হয়, কণার আয়তন বেড়ে যেয়ে লাইপেজের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। অগ্নাশয় রস ও আন্ত্রিক রসের লাইপেজ স্নেহ পদার্থকে আদ্রবিশ্লেষিত করে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসেরল ডাইগ্লিসেরাইড, মনোগ্লিসেরাইড উৎপন্ন করে। পরে তা ধীরে ধীরে গ্লিসেরল ও ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত হয়।

এছাড়াও অগ্নাশয় রসের ফসফোলাইপেজ ট্রিপসিনের প্রভাবে সক্রিয় হয়ে ফসফোলিপিড যেমন লেসিথিন, কেফলিন প্রভৃতিকে আদ্রবিশ্লিষ্ট করে ফ্যাটি এসিড ও লাইপোফসফোলিপিড উৎপন্ন করে।

স্নেহ পদার্থ (তেল, চর্বি) —পিওরস→ অবদ্রব স্নেহ (emulsified fat)
↓ লাইপেজ
ফ্যাটি এসিড, মনোগ্লিসেরাইড
↓ লাইপেজ
ফ্যাটি এসিড, গ্লিসেরল

ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরে ক্ষারীয় পরিবেশে পিত্তরস, ফ্যাটিএসিড, মনোগ্লিসেরাইড পরস্পর মিলিত হয়ে ক্ষুদ্র দ্রবণীয় স্নেহকণা তৈরি করে। একে মাইসেল (micelle) বলে। এই কণা সহজেই ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়ে দেহে শোষিত হয়।

স্নেহের পরিপাকে পিত্তরস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিত্তথলির অসুখে, পিত্তনালীর অবরোধে পিত্তরসের ক্ষরণ কম হলে স্নেহের পরিপাক ব্যাহত হয়। অসুস্থতায় অগ্নাশয়ের কার্যক্ষমতা কমে যায়। ফলে স্নেহের পরিপাক ও শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অপাচ্য স্নেহকণা মলের সাথে বের হয়। একে steatorrhea বলে।

সারাংশ

স্নেহের পরিপাকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসেরল উৎপন্ন হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগে অর্থাৎ ডিওডেনামে পিত্তরসের প্রভাবে স্নেহ পদার্থ অবদ্রবে (emulstion) পরিণত হয়। এই অবস্থায় স্নেহকণাগুলো পানিতে মিশে ও অগ্নাশয় রসের লাইপেজের ক্রিয়ায় মনোগ্লিসেরাইড, ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসেরল উৎপন্ন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন

১। স্নেহের পরিপাক কোথায় আরম্ভ হয়?
ক. মুখে খ. পাকস্থলী
গ. যকৃত ঘ. ক্ষুদ্রান্ত্র

২। নিচের কোনটি হতে পিত্তরস ক্ষরিত হয়?
ক. পিত্তথলি খ. যকৃত
গ. অগ্নাশয় ঘ. পাকস্থলী

৩। কোনটি স্নেহ পরিপাককারী উৎসেচক?
ক. লাইপেজ খ. কোলিন
গ. পেপসিন ঘ. রেনিন

৪। স্নেহের পরিপাকে কি উৎপন্ন হয়?
ক. এ্যামাইনো এসিড খ. গ্লুকোজ
গ. ল্যাকটোজ ঘ. ফ্যাটি এসিড

রচনামূলক

১। স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়ার বর্ণনা দিন।
২। স্নেহ পরিপাককারী বিভিন্ন উৎসেচকের নাম ও কাজ সম্পর্কে লিখুন।
৩। সংক্ষেপে লিখুন ঃ
পাকস্থলীতে স্নেহের পরিপাক; ক্ষুদ্রান্ত্রে স্নেহের পরিপাক।

পাঠ- ৬.৬ ঃ পরিপাককৃত খাদ্যের শোষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মানবদেহের শোষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা করতে পারবেন
- খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহের শোষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ব্যাহত পরিশোষণ কি ও কেন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

পরিপাকের পর খাদ্যবস্তু যে প্রক্রিয়ায় রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে তাকে শোষণ (Absorption) বলে। পরিপাকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্রে অধিকাংশ খাদ্য উপাদানের শোষণক্রিয়া সংঘঠিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অসংখ্যা আঙ্গুলের ন্যায় ভিলাই (villi) আছে, যার মধ্য দিয়ে খাদ্য উপাদান দেহে প্রবেশ করে। প্রতিদিন ক্ষুদ্রান্ত্র হতে কয়েকশত গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ৮০-১০০ গ্রাম, স্নেহ, ৫০-১০০ গ্রাম এ্যামাইনো এসিড, ৫০-১০০ গ্রাম বিভিন্ন প্রকার আয়ণ, ৭-৮ লিটার পানি শোষিত হয়। বেশির ভাগ পরিশোষণ ব্যাপন (diffusion) প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

কার্বোহাইড্রেটের শোষণ

পরিপাকের ফলে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য একশর্করা যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, ও গ্যালাকটোজে পরিণত হয়। সকল একশর্করাই প্রায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষুদ্রান্ত্র দিয়ে শোষিত হয়। তবে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশেই প্রায় ৮০ ভাগ শর্করা শোষিত হয়। একশর্করাগুলো অতিরিক্ত দ্রবণীয় ও ব্যাপনযোগ্য হওয়ায় এরা দ্রুত আন্ত্রিক প্রাচীরের (intestinal wall) ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে। গ্যালাকটোজের শোষণের গতি সবচেয়ে বেশি এরপর গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, ইত্যাদি।

গ্যালাকটোজ>গ্লুকোজ>ফ্রুকটোজ>ম্যানোজ গ্লুকোজের শোষণ সোডিয়াম আয়ণ ও (ATP) সহযোগে সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে (active transport) শোষিত হয়।

শোষিত হওয়া একশর্করাগুলো পোস্টাল শিরা দিয়ে যকৃতে পৌছায়। এরপর গ্লুকোজ বিপাকীয় পথে প্রবেশ করে।

প্রোটিনের শোষণ

প্রোটিনের পরিপাক শেষে যে এ্যামাইনো এসিডগুলো উৎপন্ন হয় সেগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই প্রাচীর কোষস্তর হতে সহজেই দেহে শোষিত হয়। এ্যামাইনো এসিডের শোষণ সাধারণত সক্রিয় পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। তবে ব্যাপন পদ্ধতিতেও কিছু কিছু এ্যামাইনো এসিড শোষিত হয়। এল এ্যামাইনো এসিডগুলো ডি-এ্যামাইনো এসিড অপেক্ষা দ্রুত শোষিত হয় নবজাতকের ক্ষুদ্রান্ত্র হতে শালদুধের গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিন আদ্রবিশ্লেষিত না হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। যার ফলে নবজাতকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। বিভিন্ন প্রকারের এ্যামাইনো এসিড থাকায়, তাদের শোষণ পদ্ধতিতেও ভিন্ন ভিন্ন বাহকের প্রয়োজন হয়। কিছু এ্যামাইনো এসিডের শোষণে সোডিয়াম আয়ণ প্রভাবিত করে।

স্নেহের শোষণ

পাকস্থলীতে স্নেহপদার্থের শোষণ হয় না। খাদ্যের স্নেহপদার্থ ক্ষুদ্রান্ত্রে পিত্তলবণ (Bile salt) ও লাইপেজ এনজাইমের ক্রিয়ায় ফ্যাটি এসিড, গ্লিসেরল, মনোগ্লিসেরাইড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গ্লিসেরল অণু পানিতে দ্রবণীয় বলে সহজেই শোষিত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। ছোট ছোট ফ্যাট এসিড ও এভাবে শোষিত হয়। কিন্তু আংশিক বিশ্লেয়িত ট্রাইগ্লিসেরাইড অণু ও লম্বা শিকলের ফ্যাটি এসিডগুলো এক বিশেষ পদ্ধতিতে শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষারীয় পরিবেশে পিত্তলবণ, ফ্যাটি এসিড, মনোগ্লিসেরাইড প্রভৃতি একসাথে মিশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বিকণা তৈরি হয়। একনাগুলোকে মাইসেল (micelle) বলে। মাইসেল ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে। কোষের ভেতর মাইসেলের পিত্তলবণ মুক্ত হয়ে পুনরায় স্নেহকণা তৈরিতে অংশ নেয়। এদিকে কোষে শোষিত মনোগ্লিসেরাইড, ফ্যাটি এসিড, ATP সহযোগে ও এসাইলথায়োকাইনেজ এনজাইমের প্রভাবে এসাইলকো -এ উৎপন্ন করে। অন্যদিকে ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত গ্লিসেরল গ্লিসেরোফসফেট এ পরিণত হয়। এসাইলকো-এ ও গ্লিসেরোফসফেট যুক্ত হয়ে পুনরায় ট্রাইগ্লিসেরাইড, কিছু ফসফোলিপিড এবং অল্প পরিমাণে কোলেস্টোরল ও প্রোটিন যুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র চর্বিকণা উৎপন্ন হয়। একে কাইলোমাইক্রন (chylomicrons) বলে। এগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের ঝিল্লী কোষ হতে লসিকায় প্রবেশ করে। শোষণের পর লসিকা হতে কাইলোমাইক্রন কণাগুলো যকৃত ও মেদকলা গ্রহণ করে। নিচের চিত্রে স্নেহপদার্থের শোষণ পদ্ধতি দেখানো হল ঃ

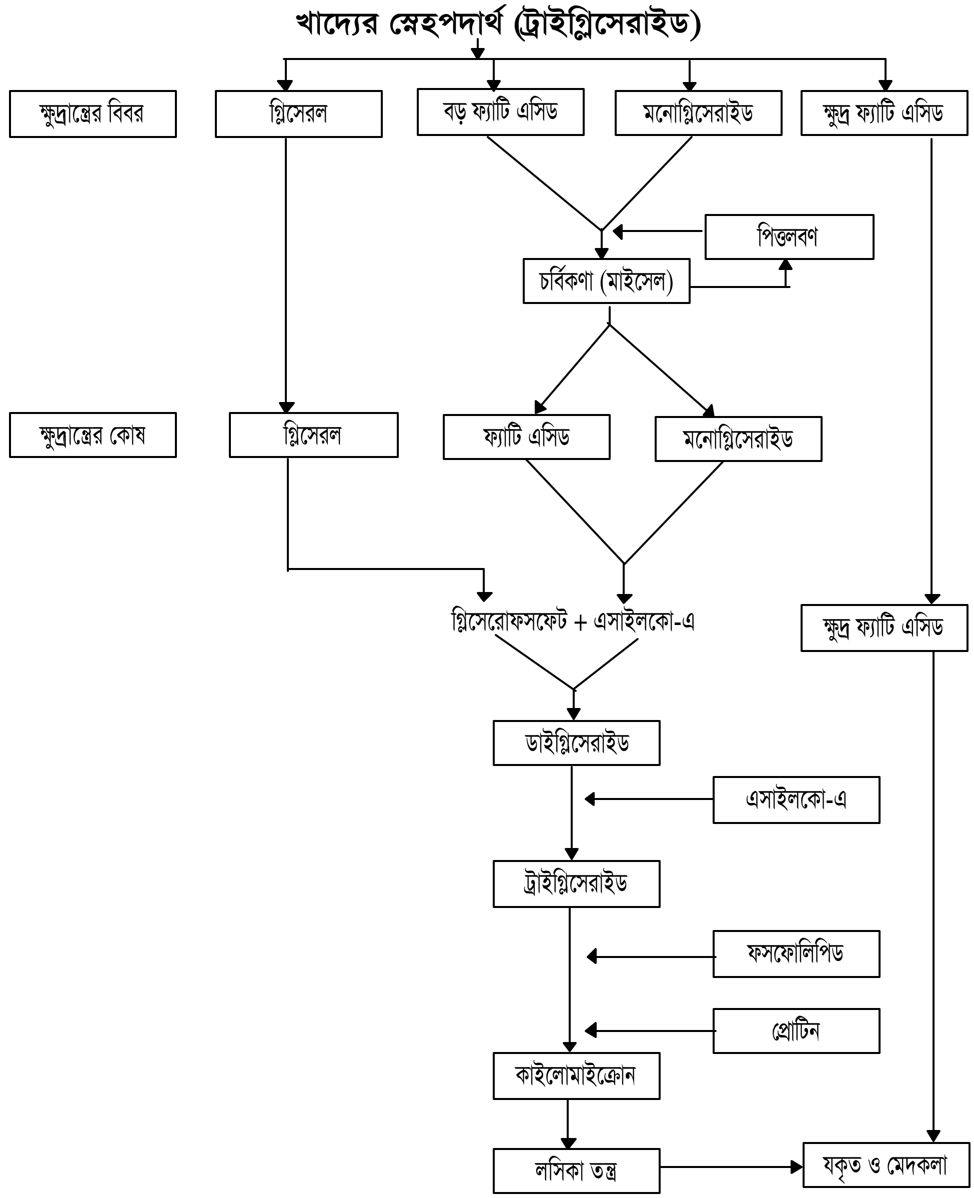

অন্যান্য খাদ্য উপাদানের মধ্যে ভিটামিন, লবণ ও পানির শোষণ পরিপাক তন্ত্রে সংঘটিত হয়। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন A,D,E,K স্নেহের উপস্থিতিতে শোষিত হয়। স্নেহের শোষণ ব্যহত হলে, এগুলোর শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। খনিজ উপাদানের মধ্যে ক্যালসিয়াম ও লৌহের শোষণ অম্লীয় পরিবেশে বেশি হয়। প্রোটিন, ল্যাকটোজ ক্যালসিয়ামের শোষণে সাহায্য করে। ভিটামিন সি, ফলিক এসিড লৌহের শোষণে সাহায্য করে। পানি প্রধানত ক্ষুদ্রান্ত্র হতে শোষিত হয় এবং পানির শোষণমাত্রা লবণের উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

খাদ্যের অপাচ্য অংশ যেমন খাদ্যাংশ সেলুলোজ বৃহদান্ত্রে প্রবেশ করে এবং মল তৈরি করে।

সারাংশ

পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান যেমন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ ভেঙ্গে একশর্করা, এ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, গ্লিসেরল উৎপন্ন হয়। একশর্করা সহজ ব্যাপন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই হতে রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে। এ্যামাইনো এসিড সক্রিয় পদ্ধতিতেও কিছুটা ATP ও সোডিয়াম সহযোগে শোষিত হয়। স্নেহের শোষণ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। পিত্তলবণ ও ফ্যাটিএসিড একত্রে মাইসেল তৈরি করে। এই মাইসেল ক্ষুদ্রান্ত্রের কোষে, গ্লিসেরোফসফেট, ডাইগ্লিসেরাইড, প্রোটনের সাথে যুক্ত হয়ে কাইলোমাইক্রন নামক স্নেহকণা তৈরি করে। এই স্নেহকণা লসিকা তন্ত্রের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্র হতে ভিটামিন, লবণ ও পানি শোষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি স্নেহের শোষণের সাথে জড়িত?
ক. কাইলোমাইক্রন খ. ল্যাকটোজ
গ. এ্যামাইলেজ ঘ. পেপসিন

২। গ্লুকোজের শোষণে সোডিয়াম আয়ণ ও নিচের কোনটির প্রয়োজন হয়?
ক. ফসফোরাস খ. ATP
গ. পানি ঘ. ভিটামিন

৩। প্রোটিনের ক্ষুদ্রতম শোষণযোগ্য অণুগুলো কোনটি?
ক. কার্বন খ. এ্যামোনিয়া
গ. এসিড ঘ. এ্যামাইনো এসিড

৪। কোন খাদ্য উপাদানের শোষণ লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে হয়?
ক. পানি খ. শর্করা
গ. গ্লুকোজ ঘ. স্নেহ

৫। ক্ষুদ্রান্ত্রের বিবরে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসেরল পিত্তলবণ যুক্ত হয়ে কোন স্নেহকণা তৈরি করে?
ক. ফাইল খ. মাইসেল
গ. মালটোজ ঘ. সুক্রোজ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানবদেহে শর্করা ও প্রোটিনের শোষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিন।
২। স্নেহের শোষণ কোথায় এবং কীভাবে হয় লিখুন।
৩। সংক্ষেপে লিখুন -
মাইসেল, ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষণ, গ্লুকোজের শোষণ।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ৬

অনুশীলনী- ৬.১ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ক
অনুশীলনী- ৬.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ ৬। খ
অনুশীলনী- ৬.৩ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ঘ ৪। খ
অনুশীলনী- ৬.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক
অনুশীলনী- ৬.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ
অনুশীলনী- ৬.৬ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। খ

ইউনিট ৭

অপুষ্টিজনিত ব্যাধি

ভূমিকা

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ খাদ্য সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। শিক্ষিত সমাজেও খাদ্য জ্ঞান অনেকাংশে সীমিত। অনেকে আবার পারিবারিক কতগুলো ধারা এবং কুসংস্কারজনিত কারণে অপুষ্টিতে ভোগে অর্থাৎ আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি জ্ঞান নেই বললেই চলে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করে থাকি তার একটি কাজ হচ্ছে দেহের পুষ্টি সাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন এবং অপর কাজটি হচ্ছে দেহকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করে সুস্থ ও সবল রাখা। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান এই কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে। তাই দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণ মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের অগ্নিমূল্যের কারণেও সম্পূর্ণ প্রোটিনযুক্ত খাবার থেকে বঞ্চিত হয়। যে কোন কারণেই হোক না কেন দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা না হলে অথবা যা খাওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদানের অভাব থেকে গেলে কিছুদিনের মধ্যেই ঐ পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত বিভিন্ন লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাব হলে শরীরে যে রোগ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তাদেরকে খাদ্যের অভাবজনিত রোগ বা অপুষ্টিজনিত রোগ বলে। প্রোটিন ক্যালরির অপুষ্টিজনিত ব্যাধি ম্যারাসমাস ও কোয়াসিয়রকর, ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত ব্যাধি, রাতকানা এবং আয়োডিনের অভাবজনিত ব্যধি গলগন্ড ইত্যাদি। আমাদের দেশের পুষ্টি উপাদানের গ্রহণ জরীপে দেখা গেছে প্রধানত প্রোটিন ক্যালরি, ভিটামিন 'এ' ভিটামিন বি, আয়োডিন ও লৌহের অপুষ্টিজনিত রোগগুলোই বেশি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১-৬ বছরের শিশুরাই অপুষ্টিজনিত রোগে অধিক ভোগে। আমাদের দেশের অধিকাংশ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরাও পুষ্টিজ্ঞানের অভাবে অথবা দারিদ্রতার কারণেও রক্তস্বল্পতা এবং ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগে ভোগে। প্রোটিন ও ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের অভাবই সাধারণত অপুষ্টিজনিত রোগগুলোর সিংহভাগ দখল করে আছে। বর্তমানে জিঙ্ক, আয়োডিন প্রভৃতি মাইক্রো-উপাদানগুলোর অপুষ্টিতে ভুগে প্রায় সকল বয়সের লোকই রোগাক্রান্ত হচ্ছে। খুব সামান্য পরিমাণে যদিও মাইক্রো উপাদানের প্রয়োজন হয় কিন্তু এ প্রয়োজনটুকু স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য। ভিটামিন 'বি' এর অভাবে মুখে ঘা, জিভে ঘা ইত্যাদি রোগগুলোও খুবই লক্ষণীয়। মা এবং শিশুরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপুষ্টির শিকার হয়।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটকে নয়টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

- পাঠ- ৭.১ ঃ খাদ্যের অভাবজনিত রোগ
- পাঠ- ৭.২ ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অভাবজনিত রোগের কারণসমূহ
- পাঠ- ৭.৩ ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অভাবজনিত রোগসমূহ
- পাঠ- ৭.৪ ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টি রোগের জটিলতা প্রতিকার ও প্রতিরোধ
- পাঠ- ৭.৫ ঃ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ
- পাঠ- ৭.৬ ঃ পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন- সি
- পাঠ- ৭.৭ ঃ ভিটামিন 'বি' এর অভাবজনিত রোগ (থায়ামিন বি$_১$, রিবোফ্লাভিন বি$_২$ এবং নায়াসিন)
- পাঠ- ৭.৮ ঃ ভিটামিন এ এর অভাবজনিত রোগ
- পাঠ- ৭.৯ ঃ ভিটামিন 'ডি' এর অভাবজনিত রোগ

পাঠ- ৭.১ ঃ খাদ্যের অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্য ও পুষ্টির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- সুষম খাদ্যের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন
- অভাবজনিত রোগের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন
- পুষ্টি ও অপুষ্টির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

আমরা সবাই চাই সুন্দর স্বাস্থ্যজ্জ্বল জীবন। এর জন্যে প্রয়োজন শরীরের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত সুষম খাবার গ্রহণ করা। সুষম খাবার আমরা তাকেই বলি; যে খাবারে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণে সকল প্রকার (ছয়টি) খাদ্য উপাদান বিদ্যমান থাকে। স্বাস্থ্যের ভিত্তি পুষ্টি, শরীর সুস্থ রাখতে সঠিক পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসুস্থ দেহে সুষ্ঠু চিন্তার বিকাশ ঘটে না। এই বাধা অতিক্রমের সেতু পুষ্টি। সুতরাং পুষ্টি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক, মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, কাজের ক্ষমতা এবং শারীরিক সুস্থতার জন্যে যে কয়টি মৌলিক চাহিদা রয়েছে তার মধ্যে খাদ্য অন্যতম। দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করে দেহকে সুস্থ ও কাজের উপযোগী রাখার জন্য যে সব উপাদান প্রয়োজন, সে সব উপাদান বিশিষ্ট বস্তুই খাদ্য। চাল, গম, আলু, শাক সব্জি, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও তেল ইত্যাদি খাদ্য দিয়েই দেহের পুষ্টির কাজ চলে।

পুষ্টি একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তু খাওয়ার পরে পরিপাক হয়ে ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত হয়। এসব সরল উপাদান দেহ রক্তসঞ্চালনের মাধ্যমে শোষণ করে নেয়। শোষণের পরে খাদ্যের উপাদান দেহের সমুদয় অঙ্গের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুর্নগঠন ও দেহের বৃদ্ধি জন্য নতুন কোষ তৈরি করে তাপ সৃষ্টি করে। খাদ্য দেহে রোগ প্রতিরোধ করে দেহকে সুস্থ রাখে। দেহে এসব কাজই পুষ্টি প্রক্রিয়ার অর্ন্তগত। শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে, তার বেড়ে উঠার জন্য যে পুষ্টির প্রয়োজন তা যোগান হয় মায়ের খাদ্য থেকে। শিশুর জন্মের পরেও মায়ের বুকের দুধই তিন থেকে প্রায় ছয়মাস অবধি শিশুর শরীরের পুষ্টি যোগায়। তাই মায়ের খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি উপাদানগুলো থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই পুষ্টি উপাদানগুলো হচ্ছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি বা ফ্যাট, খনিজ লবণ, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ও পানি। সকল বয়সেই উপরের উল্লিখিত পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণে প্রত্যহ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদানের দীর্ঘদিন ধরে অভাব হলে শরীরের বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যণাদি প্রকাশ পায়। এই ধরনের অবস্থাকে অপুষ্টি বলে। যেমন এনিমিয়া, গয়টার ইত্যাদি। এছাড়াও কোন পুষ্টি উপাদানের আধিক্যের কারণে বা অসমতার (imbalance) কারণেও অপুষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ অতিপুষ্টি (over nutrition) এবং কমপুষ্টি ও (undernutrition) অপুষ্টির অর্ন্তগত। সুতরাং বলা যায় পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে কিংবা আধিক্য ঘটলে (বেশি হলে) অথবা পুষ্টি উপাদানের অসমতার কারণে শরীরে যে লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তাকেই অপুষ্টি (malnutrition) বলে। অর্থাৎ খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান উভয়ের অপর্যাপ্ততার কারণেই অপুষ্টি হয়ে থাকে।

অতিপুষ্টি (Overnutrition) ঃ দেহের প্রয়োজনের চাইতে বেশি খাদ্য গ্রহণের ফলে অতিপুষ্টি হয়ে থাকে। প্রয়োজনের চাইতে খাদ্য বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে ওজন বৃদ্ধি পায় এবং নানাবিধ শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয় যা কিছু অতিপুষ্টির একটি অশুভ লক্ষণ এবং খাদ্য ও পুষ্টির ভাষায় এটিও অপুষ্টিরই একটি লক্ষণ মাত্র।

কমপুষ্টি (Undernutrition) ঃ কম পরিমাণে খাদ্য গ্রহণের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে খাদ্যের গুণগত মান ঠিক থাকলে ও পরিমাণ ঠিক থাকে না। খাদ্য হতে পর্যাপ্ত ক্যালরি পাওয়া যায় না অর্থাৎ কম খাদ্য গ্রহণের ফলে খাদ্যে ক্যালরির ঘাটতি থাকে। শুধু ক্যালরি নয় খাদ্যের ঘাটতির ফলে অন্যান্য উপাদান যেমন প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদিরও অভাব শরীরে দেখা দিতে পারে। এভাবেই দেহে কমপুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেজন্য কমপুষ্টির (Undernutrition) অভাবজনিত রোগসমূহ প্রকাশ পায়। আমরা একনজরে এসব অপুষ্টির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাগুলো দেখি।

অপুষ্টি (Malnutrition)- খাদ্যের গুনগত ও পরিমাণগত মান নিম্ন
অতিপুষ্টি (Overnutrition)- প্রয়োজনের চাইতে বেশি পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ
কমপুষ্টি (Underutrition)- প্রয়োজনের চাইতে কম পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ

অর্থাৎ খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলোর প্রত্যেকটি যখন শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে উপস্থিত থাকবে এবং খাদ্য হতে দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালরি সরবরাহ হবে তখনই দেহের পুষ্টির মান স্বাভাবিক থাকবে। এদের যে কোন অসমতার কারণে, আধিক্যের কারণে অথবা অভাবের কারণে অপুষ্টি দেখা দিবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপুষ্টির এবং অভাবজনিত রোগের কারণগুলো কি কি! এক নজরে–

অপুষ্টি ও অভাবজনিত রোগ	
	❑ অপর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ
	❑ পুষ্টি উপাদানের অভাব (গুণগত মান নিম্ন)
	❑ প্রয়োজনের চাইতে বেশি খাদ্য গ্রহণ
	❑ প্রয়োজনের চাইতে কম খাদ্য গ্রহণ

সারাংশ

পুষ্টিকর খাদ্যের প্রভাবে এবং অভাবে আমাদের দেশের শিশু, গর্ভবতী মা, প্রসূতি এবং অনেক লোক নানা রকম রোগে ভোগে। অতিপুষ্টির ফলে যেমন দেহের অতিবৃদ্ধি হয়ে কুফল দেখা দেয় তেমনি কমপুষ্টির ফলেও আমাদের দেহে নানান রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। খাদ্যে পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাব হলে শরীরে সে লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তাদেরকে খাদ্যের অভাবজনিত রোগ বা অপুষ্টি জনিত রোগ বলে, এনিমিয়া, গয়টার আরো নানান রোগ। অপুষ্টির সাথে অভাবজানিত ব্যাধিগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খাদ্য ও পুষ্টি জ্ঞান কাদের নেই?
ক. অধিকাংশ জনসাধারণ খ. শিক্ষিত জনসাধারণ
গ. অশিক্ষিত জনসাধারণ ঘ. সকলেরই

২। সম্পূর্ণ প্রোটিনযুক্ত খাবার থেকে কারা বেশি বঞ্চিত?
ক. ধনী জনগণ খ. অশিক্ষিত জনগণ
গ. দরিদ্র জনগণ ঘ. শিক্ষিত জনগণ

৩। পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে তাকে কি বলে?
ক. অপুষ্টি অথবা অভাবজনিত রোগ খ. ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ
গ. প্রোটিনের অভাবজনিত রোগ ঘ. খাদ্য উপাদানের অভাবজনিত রোগ

৪। সুষম খাদ্যের কয়টি উপাদান বিদ্যমান থাকে?
ক. চারটি উপাদান খ. পাঁচটি উপাদান
গ. ছয়টি উপাদান ঘ. সাতটি উপাদান

৫। পুষ্টি কি?
ক. একটি উপাদান খ. একটি প্রক্রিয়া
গ. একটি সুস্বাস্থ্যের উপকরণ ঘ. একটি রাসায়নিক পদার্থ

৬। এক বা একাধিক উপাদানের দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারণে কি হয়?
ক. দেহে ক্ষয় সাধিত হয়
খ. দেহে বৃদ্ধি ব্যহত হয়
গ. দেহে ঐ সকল উপাদানের অভাব জনিত লক্ষণাদি প্রকাশ পায়
ঘ. দেহের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ হ্রাস পায়

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য ও পুষ্টি বলতে কি বোঝায় উদাহরণসহ লিখুন।
২. অপুষ্টি কাকে বলে, অপুষ্টি কত প্রকার ও কি কি লিখুন?
৩. অভাবজনিত রোগের সাথে অপুষ্টির সম্পর্ক কি লিখুন।

পাঠ- ৭.২ ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অভাবজনিত রোগের কারণসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রোটিন-ক্যালরির অপুষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- কোন দেশে প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টি বেশি হয়, সে সম্পর্কে অবহিত হবেন
- প্রোটিন ক্যালরির অপুষ্টিজনিত কারণগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১-৬ বছরের শিশুদের খাদ্যে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ ক্যালরি করে ঘাটতি পড়ে। উদ্ভিজ প্রোটিনের পরিমাণের ঘাটতি কম হলেও উন্নতমানের প্রোটিনের ঘাটতি আছে অনেক। উদ্ভিদ শ্রেণীর প্রোটিন থেকে সম্পূর্ণ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ সম্ভব নয়। এই প্রোটিন ও ক্যালরির অভাবে ১-৬ বছরের দ্ররিদ্র শিশুদের মধ্যেই প্রোটিন-ক্যালরি অভাবজনিত দুটি রোগ-কোয়াশিওরকর ও ম্যারাস্মাস্ দেখা যায়। ইংরেজিতে বলা হয় PCM (Protein Calorie Malnutrition) বা PEM (Protein Energy Malnutrition) বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহে শিশু পুষ্টির ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় ও ব্যাপক সমস্যা হল প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত অপুষ্টি বা PEM। বাংলাদেশে অনুর্ধ ৫ বছরের শিশুদের অধিকাংশই (প্রায় ৯৪%) কোন না কোন মাত্রায় অভাবজনিত রোগে ভুগছে। মারাত্মক অপুষ্টির শিকার হচ্ছে প্রায় ২৪% ভাগ শিশু।

প্রোটিন-ক্যালরি অভাবজনিত রোগের কারণগুলো চারভাগে ভাগ করতে পারি। শিশুর খাদ্যাভাস, সংক্রমণ, আর্থসামাজিক অবস্থা ও অন্যান্য কারণসমূহ ।

(ক) শিশুর খাদ্যাভাস সংক্রান্ত

১. **বুকের দুধ ঃ** অনেক মায়ের নিজের অসুস্থতার কারণে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে না। আবার অনেকে শহরে বসবাস করেও অশিক্ষার কারণে বুকের দুধ দেয় না। শিশুকে উপযোগী গুঁড়ো দুধ (Infant formula) দিয়ে থাকেন। বুকের দুধ না খাওয়ানোর প্রবণতা শিশুর পুষ্টিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। ফলে শিশুরা প্রোটিনের অভাবজনিত রোগে ভুগছে।

২. **বোতলের দুধ ঃ** শিশুদের বোতলে দুধ খাওয়ানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নানা ধরনের দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে। বোতলের মাধ্যমে সহজেই সংক্রমণ ঘটে। এতে শিশুদের ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও ডায়রিয়া হতে পারে এবং হয়েও থাকে। এর ফলে শিশুর অপুষ্টি সহজে সেরে ওঠে না।

৩. **পরিপূরক খাবার ঃ** ছয়মাস বয়সে শিশুকে বাড়তি খাবার (পরিপূরক খাবার) দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পরিপূরক খাবার দিতে দেরি হয় অথবা দুধের পরিমাণ বয়স অনুপাতে একেবারেই কমিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে দুধের বদলে শুধু অন্যান্য খাবারগুলো প্রয়োজন মিটাতে পারে না। ফলে শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে। পরিপূরক খাবার হচ্ছে সেই খাবার যা নাকি ছয় মাস বয়স হতেই মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির জন্য চাহিদা অনুযায়ী অবশ্যই দিতে হবে। নতুবা শিশু প্রোটিন-ক্যালরির অপুষ্টির শিকার হবে।

(খ) সংক্রমণ

হাম, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ঘনঘন ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগের কারণে শিশুর দৈহিক ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষুধা কমে যায়। এসব অসুখের সময়ে যথাশ্রীঘ সম্ভব রোগের উপশম না হলে অথবা রোগের ভোগের দিন বেশি হলে এবং শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার না খেলে প্রোটিন ক্যালরির অপুষ্টিতে শিশু সহজেই আক্রান্ত হবে।

(গ) আর্থসামাজিক কারণ

১. **দারিদ্রতা ঃ** দারিদ্রতার কারণে শিশু ও গর্ভাবস্থায় মা পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার পায় না। ফলে মা ও শিশু উভয়ই অপুষ্টির শিকার হয়।

২. **শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কার ঃ** শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কারের কারণে শিশুকে সঠিক বয়সে সঠিক খাবার দেওয়া হয় না। যেমন- জন্মের পর শালদুধ না দিয়ে শিশুকে চিনি, পানি, মধু ইত্যাদি দেওয়া হয়, অসুস্থ অবস্থায় শিশুর খাবার বন্ধ করে দেয়া হয় বা খাবার বেছে চলা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে সন্তানকে কম খেতে দেওয়া হয়। এসব কারণেও শিশুরা অপুষ্টির শিকার হয়।

ঘ) অন্যান্য কারণসমূহ

১. ঘন ঘন সন্তান প্রসব এর ফলে মা নিজে পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং পুষ্টিহীন মায়ের সন্তানের জন্মকালীন ওজনও কম হয়।

২. কম জন্মওজনের শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। অল্পতেই অসুখে আক্রান্ত হয় এবং এদের মধ্যে অপুষ্টিতে আক্রান্ত হবার প্রবণতা বেশি থাকে।

৩. অল্প বয়সে মা হলে তাদের সন্তানদের অপুষ্টির ঝুঁকি বেশি থাকে।

সারাংশ

সাধারণত ১-৬ বছর বয়সের শিশুরাই প্রোটিন ক্যালরির অভাবজনিত রোগে ভোগে কারণ তাদের খাদ্যে প্রায় ৩০০ ক্যালির ঘাটতি থাকে। প্রোটিন ক্যালরির মারাত্মক অভাবজনিত রোগ দুটি। একটি ম্যারাসমাস অপরটি হচ্ছে কোয়াশিয়রকর। দরিদ্র শিশুরাই বেশিরভাগ এই অভাবজনিত রোগের শিকার হয়। পৃথিবীর দরিদ্রমত দেশগুলোতে এই রোগকে PEM অথবা PCM এই নামে চিহ্নিত করা হয়। PCM (Protein Colorie Malnutrition) অথবা PEM (Protein Enegy Malnutrition) প্রধানত চারটি কারণে এই রোগগুলো হতে পারে (১) শিশুর খাদ্যাভাস, (২) সংক্রমণ, (৩) আর্থসামাজিক অবস্থা এবং (৪) অন্যান্য কারণসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন বয়সের শিশুরদের খাদ্যে প্রায় ৩০০ ক্যালরি ঘাটতি পড়ে?

ক. ৪-৬ বছরের খ. ৪-৭ বছরের

গ. ১-৬ বছরের ঘ. ৩-৬ বছরের

২। কোন দেশে PCM অথবা PEM ব্যাপক সমস্যা?

ক. ধনী দেশগুলোতে খ. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে

গ. উন্নত দেশগুলোতে ঘ. অনুন্নত দেশগুলোতে

৩। মারাত্মক অপুষ্টির শিকার হচ্ছে কত শতাংশ শিশু?

ক. ৪০% শিশু খ. ৮০% শিশু

গ. ২৪% শিশু ঘ. ৯৪% শিশু

৪। প্রধানত প্রোটিন ক্যালরি অভাবজনিত রোগের কয়টি কারণ?

ক. দুটি খ. তিনটি

গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৫। শিশুকে গুঁড়ো দুধ খাওয়ালে শিশু কোন ধরনের অভাবজনিত রোগে ভোগে?

ক. প্রোটিনের অভাবজনিত রোগে ভোগে খ. ক্যালরির অভাবজনিত রোগে ভোগে

গ. ভিটামিনের অভাবজনিত রোগে ভোগে ঘ. খনিজলবণের অভাবজনিত রোগে ভোগে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রোটিন ক্যালরির অভাবজনিত রোগের কারণ কয়টি? যে কোন একটি কারণ সম্পর্কে লিখুন।

২। সংক্রমণ কীভাবে প্রোটিন ক্যালরির অভাবজনিত রোগের কারণ ঘটায় লিখুন।

৩। শিশুরদের খাদ্যাভাসের কারণে কীভাবে প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টির শিকার হয়? বর্ণনা করুন।

৪। প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টির জন্য অন্যান্য কারণগুলো কি কি?

পাঠ- ৭.৩ ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রোটিনের উৎস সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- ক্যালরির প্রধান প্রধান উৎসগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রোটিন-ক্যালরির মারাত্মক ঘাটতিজনিত অপুষ্টি ব্যধিগুলোর নাম এবং লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- কোয়াশিয়রকর ও ম্যারাসমাস এ দুটি মারাত্মক প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টি ব্যাধির তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন

প্রোটিন ক্যালরি অভাবজনিত রোগ

তাপশক্তির উৎস হচ্ছে ক্যালরি এবং শরীর গঠন, বর্ধন ও রক্ষার জন্য প্রধান পুষ্টি উপাদান হচ্ছে প্রোটিন। শরীরের গঠন ও বর্ধন স্বাভাবিক রাখা সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকার জন্য পর্যাপ্ত প্রোটিন ও ক্যালরি অত্যাবশ্যক। প্রোটিনের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, বাদাম, ডাল ইত্যাদি এবং ক্যালরির উৎস হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটজাতীয় খাদ্য; যেমন- ভাত, রুটি, আলু, ডাল, তেল, ঘি, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। এসব খাবার কোন কারণে অনেক দিন পর্যন্ত একাধারে গ্রহণ করতে না পারলে মারাত্মক অপুষ্টির সৃষ্টি হয়। দুর্ভিক্ষ এবং বন্যা প্লাবিত অবস্থায় এসব রোগ হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

মারাত্মক প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত অপুষ্টিকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
ক) ম্যারাসমাস (হাড্ডিসার)।
খ) কোয়াশিয়রকর (গা-ফোলা)।

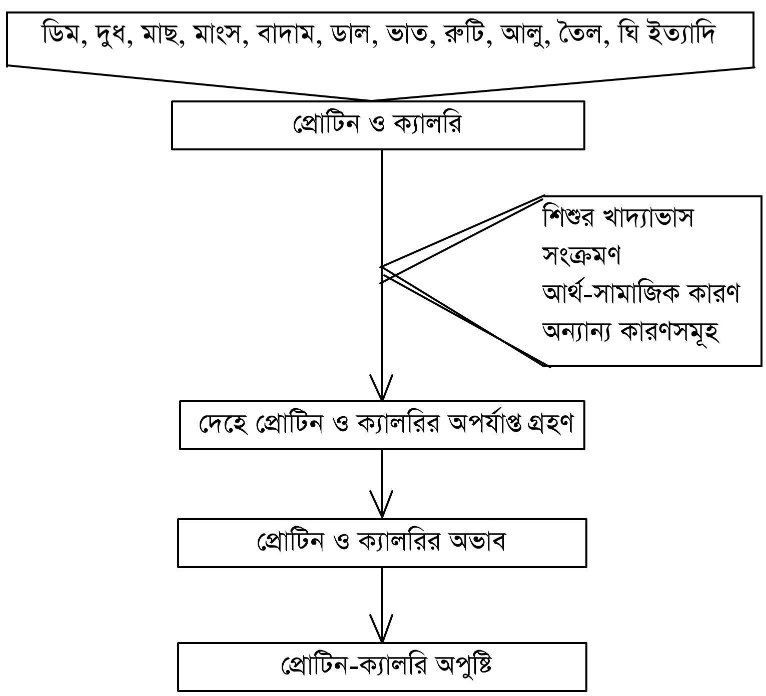

রেখাচিত্র ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টি

ম্যারাসমাস

খাদ্যে প্রোটিনের সাথে মোট ক্যালরির অভাব হলে যে উপসর্গ দেখা যায় তাকে ম্যারাসমাস বা হাড্ডিসার রোগ বলে। সাধারণত জীবনের প্রথম ২ বছরে বেশি দেখা যায় কিন্তু এটা যে কোন বয়সেই দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের সময়। বন্যাপ্লাবিত স্থানে দীর্ঘদিন খাবারের ও পরিবেশ দূষণের কারণেও ম্যারাসমাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

কারণ

১. খাদ্যের অপর্যাপ্ততাই এর প্রধান কারণ। মায়ের দুধ কমে খেলে শিশুকে যদি অন্য দুধ বা অন্যান্য পরিপূরক খাদ্য না দেওয়া হয় তবে দেহে প্রোটিন ও ক্যালরি উভয়েরই অভাব ঘটে।
২. এছাড়া ডায়রিয়া, আমাশয়, হাম, হুপিংকফ, কৃমি প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে এবং এসময় প্রয়োজন মত খাদ্য ব্যবস্থা না করতে পারলে দেহ ক্রমাগত শীর্ণ হতে থাকবে ও শেষ পর্যায়ে ম্যারাসমাস দেখা দিবে।
৩. অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও বোতল ফিডিং করানোর জন্য বার বার পেটের রোগে আক্রান্ত হলে ম্যারাসমাস দেখা দিতে দিতে পারে।

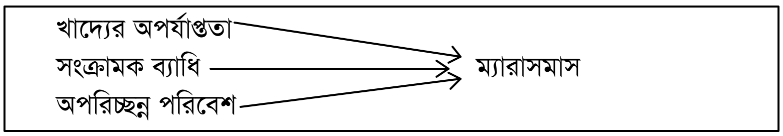

লক্ষণ

১. বয়সের তুলনায় শিশুর ওজন শতকরা ৬০ ভাগের নিচে নেমে যায়।
২. শরীরের সঞ্চিত চর্বি জাতীয় পদার্থ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মাংসপেশী শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায়। এই জন্য হাত পা সরু দেখায়। দেহ কংকালসার দেখায়। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আসে। মুখাবয়ব চিন্তাক্লিষ্ট বৃদ্ধের মত দেখায়।
৩. দেহের চামড়া ঢিলা হয়ে যায় ও কুঁচকে যায়।
৪. মাথার চুল পাতলা হয়ে যায়। অনেক সময় চুল উঠে যায়।
৫. শিশুকে অস্থির ও দুর্দশাগ্রস্থ দেখায়।

চিত্র ঃ ম্যারাসমাসে আক্রান্ত শিশু

৬. শিশুর পেট বাইরের দিক হতে বড় দেখায়। কারণ পেটের পেশীর দেওয়াল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দুর্বল হয়। পেটকে অনেকটা ঘটি বা পাত্রের মত দেখায়। এই অবস্থাকে "Pot belly" বলে।
৭. ক্ষুধা থাকে।

কোয়াশিয়রকর

১৯৩৩ সালে সিস্‌লি উইলিয়ামস্ সর্ব প্রথম লক্ষ্য করেন যে, কোন কোন এমাইনো এসিড বা প্রোটিনের অভাবই কোয়াশিয়রকর বা গা-ফোলা রোগের কারণ। ঘানার রাজধানী আক্রা ও এর আশেপাশের অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় অধিবাসীগণ এই রোগের নামকরণ করেছিল "কোয়াশিয়রকর" কোয়াশিয়রকর শব্দটির দেশজ অর্থ হল "নতুন শিশুটি জন্মাবার পরে তার আগের শিশুটির মধ্যে যে রোগ দেখা যায়"। সাধারণত ১ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে এর চাইতে বেশি বয়সের শিশুদের ও বয়স্কদেরও কোয়াশিয়রকর হতে পারে।

কারণ

১. মা বার বার গর্ভবতী হলে কোলের শিশুকে বুকের দুধ থেকে সরিয়ে নিয়ে কর্বোহাইড্রেট খাদ্যে অভ্যস্থ করলে, শিশুর খাদ্যে পর্যাপ্ত প্রোটিনের অভাব হয়, ফলে কোয়াশিয়রকর দেখা দেয়।
২. শিশু অন্ত্রের প্রদাহ, হাম ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হলে এবং এই অসুস্থতার সময় পুষ্টিকর খাদ্য হতে বঞ্চিত করলে শিশুর দেহে প্রোটিনের ঘাটতি হবে এবং কোয়াশিয়রকর দেখা দিবে।

লক্ষণ

১. শিশুর স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি ব্যহত হয়। যদিও শরীরে চর্বি ও পানি জমায় ওজন কমে যাচ্ছে কিনা তা সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু নিয়মিত ওজন নিলে দেখা যাবে যে, শরীরের ওজন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।
২. মাংসপেশী শীর্ণ হয়। শিশুর শরীরে পানি জমায় শীর্ণকায় অবস্থাটি সহজে ধরা যায় না। শুধু বুক ও বাহু দেখে হাড্ডিসার বুঝা যায়।
৩. শরীরের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে হাত, পায়ে ও মুখে পানি জমে।
৪. ত্বকের বাইরের আবরণ পাতলা দেখায়। ত্বক ফেটে যেতে পারে ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যে সব জায়গায় অহরহ ঘষা লাগে সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যেমনঃ পা ও হাতের কুনুই ইত্যাদি।
৫. পেশীর ক্ষয় হয় কিন্তু ত্বকের নিচে চর্বি থাকায় বোঝা যায় না। বিশেষ করে গালে চর্বি জমে মুখে গোল হওয়ায় মুখকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে অর্থাৎ Moonface বলা হয়। এই Moonface এর কারণ চর্বি জমার পাশাপাশি মুখে পানি জমা হওয়া।
৬. চুল পাতলা ও সরু হয়, চুল পড়ে কমে যায়। চুলের রং পরিবর্তিত হয়ে বাদামি বা ধূসর হয়।
৭. যকৃতের আকার বৃদ্ধি পায়।
৮. ক্ষুধামন্দা দেখা যায়।
৯. শিশুকে উদাসীন ও দুর্দশাগ্রস্থ দেখায় এবং কোন কিছুর ব্যাপারেই উৎসাহ বোধ করে না।

চিত্র ঃ কোয়াশিয়রকরে আক্রান্ত শিশু

ম্যারাসমাস (হাড্ডিসার) ও কোয়াসিয়রকর (গো-ফোলা) রোগের পার্থক্য

বিষয়সমূহ	হাড্ডিসার (ম্যারাসমাস)	গা-ফোলা (কোয়াশিয়রকর)
১) কারণ	প্রোটিন ও ক্যালরির অভাবে হয়ে থাকে।	প্রোটিনের অভাবে হয়ে থাকে।
২) রোগীর বয়স	প্রধানত ১-২ বছর বয়সে বেশি হয়।	১-৬ বছর বয়সে বেশি দেখা যায়।
৩) শিশুর ওজন	বয়সের তুলনায় ওজন শতকরা ৬০ ভাগের নিচে নেমে যায়।	শিশুর ওজন কমে যায় কিন্তু বয়সের তুলনায় ওজন শতকরা ৬০ ভাগের উপরে থাকে।
৪) শোথ (পানি জমা) বা গা-ফোলা	থাকে না।	হাত, পা ও মুখে পানি জমে। কোন কোন সময় সমস্ত শরীর ফুলে যায়।
৫) মাংসপেশী	মাংসপেশী শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায়। হাত, পা এই জন্য সরু দেখায়, দেহ কঙ্কালসার দেখায়।	মাংসপেশী শীর্ণ হয়। কিন্তু পানিতে জমা হওয়ার কারণে শীর্ণকায় অবস্থাটি অনেক ক্ষেত্রে ধরা যায় না।
৬) ত্বকের পরিবর্তন	ত্বকের বহিরাবরণ সাধারণত পরিবর্তন হয় না। তবে চামড়া ঢিলা হয়ে ভাঁজ পড়ে।	ত্বকের বহিরাবরণ পাতলা দেখায়। ত্বক ফেটে যেতে পারে এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
৭) ক্ষুধা/রুচি	সাধারণত ক্ষুধার্ত (খাবারে রুচি) থাকে।	সাধারণত খাবারে অরুচি থাকে।
৮) মুখাবয়ব	চিন্তাক্লিষ্ট বৃদ্ধের মত দেখায়।	গোলাকার বা চাঁদের মত দেখায়।
৯) যকৃতের আকার	বৃদ্ধি পায় না।	বৃদ্ধি পায়।
১০) চর্বির বিপাক	চর্বির ক্ষয় হয় বেশি। দেহে চর্বির লেশমাত্র থাকে না।	মুখে ও যকৃতে চর্বি জমা হয়।
১১) মানসিক পরিবর্তন	শিশু সাধারণত অস্থির থাকে।	শিশু সাধারণত উদাসীন থাকে এবং কোন ব্যাপারেই উৎসাহ প্রকাশ করে না।
১২) দেহের বৃদ্ধি	ব্যহত হয়। সহজেই বোঝা যায়।	ব্যহত হয়, তবে শরীরে পানি জমায় সহজে বোঝা যায় না। নিয়মিত ওজন নিলে ধীরে ধীরে বোঝা যায়।

সারাংশ

প্রোটিন-ক্যালরির মারাত্মক অপুষ্টিজনিত ব্যাধির নাম যথাক্রমে কোয়াশিয়রকর এবং ম্যারাসমাস। খাদ্যে প্রোটিনের সাথে ক্যালরির দীর্ঘদিনের অভাব হলে ম্যারাসমাস রোগ হয়। খাদ্যে শুধু প্রোটিনের দীর্ঘদিন অভাব হলে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়। ম্যারাসমাস সাধারণত ১-২ বছরের শিশুরা সহজে আক্রান্ত হয়। কোয়াশিয়রকার ১-৬ বছরের শিশুরা সহজে আক্রান্ত হয়। ম্যারাসমাসের শিশুরা হাড্ডিসার হয়। কোয়াশিয়রকরের শিশুদের গা ফোলা ফোলা দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রোটিনের প্রধান খাদ্য উৎস কোন্‌টি?

ক. ভাত ও আলু খ. ডিম ও মাংস
গ. শাক ও সব্‌জি ঘ. ডাল ও গম

২। ক্যালরির প্রধান খাদ্য উৎস কোন্‌টি?

ক. শাক-সবজি খ. মাছ ও দুধ
গ. তৈল ও ঘি ঘ. ডাল ও চাল

৩। প্রোটিনের মারাত্মক অভাবজনিত রোগ কি?

ক. রক্তশূন্যতা
খ. ম্যারাসমাস
গ. মাথাব্যাথা
ঘ. কোয়াশিয়রকর

৪। প্রোটিন ক্যালরির মারাত্মক অভাবজনিত রোগ কি?
ক. বেরি বেরি
খ. গা-ফোলা
গ. ম্যারাসমাস
ঘ. কোয়াশিয়রকর

৫। ম্যারাসমাস রোগে শিশুর ওজন কত ভাগ কমে?
ক. শতকরা ৪০ ভাগের নিচে
খ. শতকরা ৬০ ভাগের নিচে
গ. শতকরা ৫০ ভাগের নিচে
ঘ. শতকরা ২০ ভাগের নিচে

৬। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ম্যারাসমাস লক্ষণ	কোয়ালিয়রকর লক্ষণ
১। শোথ (পানি জমা) থাকে না	১। ... ...
২।	২। সাধারণত খাবারে অরুচি থাকে।
৩। যকৃতের আকার বৃদ্ধি পায় না	৩। ... ...

৭। কোয়াশিয়রকর রোগে শিশুকে কেমন দেখায়?
ক. উৎফুল্ল
খ. বৃদ্ধের ন্যায় মুখ-মন্ডল
গ. উদাসীন, দুর্দশাগ্রস্থ ও উৎসাহহীন
ঘ. অস্থির ও চঞ্চল

৮। ম্যারাসমাস রোগে শিশুর নিচের কোনটি হয়?
ক. ক্ষুধার্ত
খ. ক্ষুধামন্দা
গ. বৃহৎ যকৃত
ঘ. ক্ষতযুক্ত চামড়া

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টিজনিত মারাত্মক ব্যাধিগুলো কি কি উল্লেখ করুন। যে কোন একটি রোগের লক্ষণগুলো বর্ণনা দিন।

২. ম্যারাসমাস এবং কোয়াশিয়রকর রোগের তুলনামূলক একটি চার্ট তৈরি করুন।

পাঠ- ৭.৪ ঃ প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টি রোগের জটিলতা প্রতিকার এবং প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত অপুষ্টি ব্যাধির জটিলতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- এ রোগগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন
- প্রোটিন ক্যালরি ঘাটতিজনিত রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে সচেতন হবেন

বিষয়বস্তু

যে কোন অভাবজনিত রোগের পূর্বে এবং পরে বহু রকমের জটিলতায় লোকে ভোগে। রোগ হলে পরে রোগের জটিলতাই অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে কোন রোগের জটিলতা চরম আকার ধারণ করার পূর্বে যথেষ্ট সচেতন হলে রোগের পর ভোগান্তি কমে গিয়ে রোগী সহজে সুস্থ হয়ে যায়। রোগের জটিলতা বাড়তে যাতে না পারে সেজন্য অতি তাড়াতাড়ি প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হয়। রোগ হলে রোগের প্রতিকার করতে হয়। যদি আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্য সচেতন হই তবে প্রত্যেক অভাবজনিত রোগের প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। রোগের প্রতিকারের থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই জোরদার করা উচিত। তাই আমরা এ পাঠে প্রোটিন ক্যালরির অভাবজনিত রোগের জটিলতা, প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত অপুষ্টি রোগের জটিলতা

১. **শরীরের তাপমাত্রা খুব কমে যাওয়া ঃ** মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর শরীরের তাপমাত্রা ৩৫.৫° সেঃ এর নিচে নেমে গেলে শিশুর জন্য মারাত্মক অবস্থা এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। এই অবস্থাকে হাইপোথারমিয়া বলে। এই সময় শিশুকে মায়ের কোলে গরম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রেখে শিশুর শরীরের তাপ বজায় রাখতে হয়।

২. **হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ খুব কমে যাওয়া) ঃ** কখনও কখনও মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে মারাত্মকভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে অথবা মৃত্যুও হতে পারে। হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কারণে হাইপোথারমিয়া হতে পারে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খুব বেশি কমে গেলে শিশুর খিঁচুনি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে শিশুকে গ্লুকোজ পানি খেতে দিতে হবে অথবা শিরায় ডেক্সট্রোজ দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. **মারাত্মক ডায়রিয়া ও পানি স্বল্পতা ঃ** অপুষ্টিতে আক্রান্ত রোগীদের প্রায়ই পাতলা পায়খানা হয়। সাধারণত ৩-৫ দিনের মধ্যে পায়খানা স্বাভাবিক হয়। পানিস্বল্পতা রোধের জন্য খাবার স্যালাইন দিতে হবে।

৪. **রক্তস্বল্পতা ঃ** ম্যারাসমাস ও কোয়াসিয়রকর রোগী মারাত্মক রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারে। মারাত্মক রক্তস্বল্পতায় রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে।

৫. **অন্যান্য সংক্রমণ ঃ** অপুষ্ট রোগীর যক্ষ্মা, কানের প্রদাহ, শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ, মূত্রতন্ত্রের প্রদাহ এগুলো হতে পারে। এছাড়া কৃমির সংক্রমণ আমাদের দেশের খুবই সাধারণ ঘটনা।

৬. **ভিটামিন এ 'র অভাব ঃ** ভিটামিন এ'র মারাত্মক অভাবে চোখের মনিতে (Cornea) ক্ষত হয়। ক্ষত হলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসার বিলম্বের কারণে চোখের মনি ফুটো হয়ে চোখের ভিতরে পদার্থগুলো বের হয়ে শিশু চিরতরে অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত রোগের প্রতিকার

মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর অপুষ্টি প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) খাদ্য ব্যবস্থাপনা।
খ) নিয়মিত ভিটামিন প্রদান।
গ) অন্যান্য রোগের চিকিৎসা।
ঘ) অন্যান্য ব্যবস্থাদি।

ক) খাদ্য ব্যবস্থাপনা

১. যেহেতু আক্রান্ত শিশু অরুচিতে ভোগে এবং হজম শক্তি হ্রাস পায়। সেহেতু প্রথম দিকে অল্প পরিমাণে বার বার খাবার দিতে হবে। পরবর্তীতে খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

২. ক্যালরিসমৃদ্ধ ও পুষ্টিকর খাবার প্রদান করতে হবে। প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন প্রতিকেজি শরীরের ওজনের জন্য ১১০-১২০ ক্যালরি এবং দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে প্রতিদিন প্রতিকেজি শরীরের ওজনের জন্য ১৫০-২০০ ক্যালরি সরবরাহ করতে হবে।
৩. খাদ্যে উচ্চমূল্যের প্রোটিন সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদিন প্রতিকেজি শরীরের ওজনের জন্য ৩-৪ গ্রাম প্রোটিন দিতে হবে।
৪. পর্যাপ্ত পুষ্টির সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভাত, রুটি, গুড়, চিনি, ডাল, তেল, ডিম, মাছ, মাংস, দুধ, শাক-সবজি ইত্যাদি থেকে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে। সব সময় খাদ্যের সহজপাচ্যতা, মূল্য, খাদ্য ক্যালরি, প্রোটিন ও সহজে হজম হয় ইত্যাদি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৫. শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
৬. গা-ফোলা রোগীর খাবারে লবণ দেওয়া যাবে না।
৭. শিশু যখন একটু সুস্থ হয়ে খেতে চাইবে তখন শাক-সবজি, পাকা কলা, পেঁপে ইত্যাদি দিতে হবে। অসুস্থতা বেশি হলে চাল, ডাল, তেল দিয়ে নরম করে খিঁচুড়ি রান্না করে বার বার অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে।

খ) নিয়মিত ভিটামিন প্রদান

পুষ্টিহীন শিশুরা প্রায় সবাই ভিটামিনের অভাবে ভোগে। তাই অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি নিয়মিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স Tablet দিতে হবে।

গ) অন্যান্য রোগের চিকিৎসা

১. **সংক্রমণ ঃ** রোগের ধরন নির্ণয় করে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে।
২. **অন্যান্য অপুষ্টির চিকিৎসা ঃ** ভিটামিন এ'র অভাব, রক্তস্বল্পতা, ঠোঁটের কোনায় ঘা ইত্যাদি অপুষ্টির লক্ষণ থাকলে তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা করতে হবে।

ঘ) অন্যান্য ব্যবস্থাদি

১. পানিশূন্যতা থাকলে শিশুকে পরিমাণ মত খাবার স্যালাইন দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে অতিরিক্ত খাবার স্যালাইন যেন না খায়।
২. মাকে শিশু খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।
৩. নিয়মিত শিশুকে পরীক্ষা করতে হবে। ওজন নিতে হবে।
৪. টিকা দেওয়া না থাকলে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত রোগের প্রতিরোধ

পুষ্টিহীনতার কারণগুলো চিহ্নিত করে তার নিরিখে প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিরোধ কার্যক্রমগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) স্বাস্থ্য কার্যক্রম এবং (খ) অন্যান্য কার্যক্রম।

ক) স্বাস্থ্য কার্যক্রম

১. শিশুর জন্মের সাথে সাথে বুকের দুধ দেওয়া, শালদুধ খাওয়ানো, ৫ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এবং অন্য খাবারের পাশাপাশি কমপক্ষে দু বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াতে মাকে উদ্বুদ্ধ করা।
২. ৫ মাস পূর্ণ হাবার পর সঠিকভাবে বাড়তি খাবার শিশুকে দিতে হবে।
৩. নিয়মিত শিশুর ওজন নিতে হবে এবং গ্রোথ চার্ট সংরক্ষণ করতে হবে।
৪. শিশুর বিভিন্ন বয়সের খাবার, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়ের খাবার সম্পর্কে মায়েদের শিক্ষাদান করা।
৫. শিশুকে দেড়মাস বয়স থেকে সময়মত সবগুলো টিকা দেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।
৬. স্যালাইন তৈরি শিখানো এবং ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুকে খাবার স্যালাইন দিতে উদ্বুদ্ধ করা।
৭. শিশু অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি রোগের চিকিৎসা করা।
৮. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। দুই সন্তানের জন্মের ব্যবধান যেন কমপক্ষে ৩ বছর হয় সেই ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই সচেতন করা।
৯. গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
১০. পুষ্টিহীন শিশু চিহ্নিত করার ব্যাপারে মায়েদের শিক্ষা দান করা।

খ) অন্যান্য কার্যক্রম

১. শিক্ষার প্রসার ঘটানো, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসারের ব্যাবস্থা করা।
২. আয় বৃদ্ধি প্রকল্প গ্রহণ করা; যেমন ঃ হাঁস-মুরগি পালন, শাক-সব্‌জির বাগান করা ইত্যাদি ব্যাপারে উৎসাহিত করা। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও উপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতা করা।
৩. বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৪. উন্নত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫. অপুষ্টির ব্যাপকতার পরিমান ও অপুষ্টি প্রতিরোধ সম্বন্ধে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৬. অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করা।
৭. ছেলে মেয়ের মধ্যে ভেদাভেদ, পরিবারে খাদ্য পরিবেশনের বৈষম্য, অশিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক আচরণ তৈরি করা। জনসাধারণকে শিক্ষিত ও কুসংস্কার মুক্ত করে তোলা। জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলাই হবে অপুষ্টি প্রতিরোধের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ।

সারাংশ

প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত অপুষ্টি রোগের জটিলতা বহু। শরীরের তাপমাত্রা খুবই কমে যায়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অনেক কমে যায়। মারাত্মক ডায়রিয়া ও পানি স্বল্পতা দেখা দেয়। অনেক ভিটামিনের অভাবজনিত রোগগুলোও সঙ্গ নেয়।

জটিলতা যাতে বাড়তে না পারে সেজন্য প্রতিকার ব্যবস্থা সাথে সাথেই নিতে হবে। পর্যাপ্ত ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়মিত ভিটামিন প্রদান ও আনুষঙ্গিক রোগের নিরাময়ের জন্য সত্ত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ। রোগ যাতে না হতে পারে সেজন্য পূর্ব থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাথে সাথে অন্যান্য পুষ্টি জ্ঞানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রতিকার কি?
ক. রোগের পূর্বে সর্তকতা অবলম্বন | খ. রোগ হলে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ
গ. রোগ হলে সেবা করা | ঘ. সঠিক পথ্য প্রদান করা

২। প্রতিরোধ ব্যবস্থা কখন শুরু হয়?
ক. রোগ হবার পর | খ. রোগ শুরু হলে
গ. রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে | ঘ. রোগ ভাল হওয়ার পর

৩। কত তাপমাত্রা শিশুর মৃত্যুর কারণ হতে পারে?
ক. ৬০.৫° সেঃ এর নিচে | খ. ৫০.৫° সিঃ এর নিচে
গ. ৪০.৫° সেঃ এর নিচে | ঘ. ৩৫.৫° সেঃ এর নিচে

৪। হাইপোগ্লাইসেমিয়া কি?
ক. রক্তে লৌহের মাত্রা কমে যাওয়া | খ. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়া
গ. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ খুব কমে যাওয়া | ঘ. রক্তে পানির মাত্রা কমে যাওয়া

৫। প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টিতে কি হয়?
ক. বমি বমি ভাব হয় | খ. বেরিবেরি হয়
গ. ঘুম ঘুম ভাব হয় | ঘ. খুব ঘাম হয়

৬। প্রোটিন-ক্যালরির অভাব হলে প্রতিদিন প্রতিকেজি শরীরের ওজনের জন্য কত গ্রাম প্রোটিন দিতে হবে?
ক. ৩-৪ গ্রাম প্রোটিন | খ. ১-২ গ্রাম প্রোটিন
গ. ২-৩ গ্রাম প্রোটিন | ঘ. ০-১ গ্রাম প্রোটিন

৭। গা-ফোলা রোগীর খাবারে কি দেয়া যাবে না?

ক. চিনি খ. লবণ
গ. পানি ঘ. টক

৮। রোগীকে বার বার কি পরিমাণে খাওয়া দিতে হবে?

ক. বেশি বেশি করে খ. অল্প অল্প করে
গ. খুব সামান্য পরিমাণে ঘ. প্রচুর পরিমানে

৯। প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত রোগে প্রতিরোধ কার্যক্রম কয়টি?

ক. পাঁচটি খ. চারটি
গ. তিনটি ঘ. দুটি

১০। শিশুকে কখন টিকা শুরু করতে হবে?

ক. ১ বছর বয়সে খ. ৬ মাস বয়সে
গ. তিন মাস বয়সে ঘ. দেড় মাস বয়সে

১১। গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের জন্য কি নিশ্চিত করতে হবে?

ক. স্বাস্থ্য সেবা খ. ওষুধ সেবন
গ. শুধু মানসিক সেবা ঘ. ভ্রমণ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত অপুষ্টি রোগের জটিলতা কি কি ব্যাখ্যা করুন।
২. প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতিজনিত রোগের প্রতিকার কীভাবে গ্রহণ করবেন- আলোচনা করুন।
৩. প্রোটিন-ক্যালরির অপুষ্টিজনিত ব্যাধির প্রতিরোধ ব্যবস্থা কোন কোন কার্যক্রমের মাধ্যমে গড়ে তুলবেন - আলোচনা করুন।

পাঠ- ৭.৫ ঃ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভিটামিনের আবিষ্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- ভিটামিনের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের রোগগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবেন
- ভিটামিনের সাধারণ উৎসগুলোর খাদ্যের নাম বর্ণনা করতে পারবেন

পূর্বের পাঠগুলোতে আমরা প্রোটিন ও ক্যালরির অপুষ্টিজনিত রোগগুলোর সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করেছি। এ পাঠে আমরা ভিটামিনের অভাবজনিত রোগগুলো জানার পূর্বে ভিটামিনের আবিষ্কার ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানব।

ভিটামিন আমাদের খাদ্য উপাদানের মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান। এ উপাদান আমরা সহজলভ্য খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে পেয়ে থাকি। শুধু পুষ্টিজ্ঞানের অভাবে আমরা সঠিকভাবে স্বল্প ব্যয়ে খাদ্যগুলো সংগ্রহ করে খেতে পারি না, অথচ ভিটামিনের অভাবে মারাত্মক রোগব্যাধি দেখা যায় যা কিনা, বহুমূল্যের খাদ্য উপাদানে উপশম হয় না বরং আরো ক্ষতি হয়।

মাত্র একশত বছর পূর্বে টাকাকী লুনিন, আইকম্যান, হপকিন্স প্রমূখ বিজ্ঞানীগণ মানুষের দেহে কয়েকটি ব্যাধির কারণ খুঁজতে গিয়ে ভিটামিন নামক উপাদান আবিষ্কার করেন। বেরিবেরি ও স্কার্ভি নামক রোগকে কেন্দ্র করেই খাদ্যের অন্যতম উপাদান ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাপানে সৈন্যরা দীর্ঘদিন ধরে কলেছাঁটা চাল খেয়ে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়। জাপানের বিজ্ঞানী টাকাকী খাদ্যে কিছু পরিবর্তন করে রোগ ভাল করেন। ১৮৮৭ সালে ওলন্দাজ ডাক্তার আইকম্যান বেরি-বেরি রোগের স্নায়ু প্রদাহ থেকে মুরগীর বাচ্চাকে নিরাময় করেন। তিনি আছাঁটা চালের উপরিভাগের আস্তরণ থেকে এমন এক পদার্থ বের করেন যা খেলে বেরিবেরি রোগ ভাল হয়, ১৮৮০ সালে লুনিন দেখেন তাজা ও টাটকা খাবার না খেলে ইদুর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ১৯১২ সালে হপকিন্স গবেষণা করে টাটকা তাজা শাকসবজি দিয়ে ইদুরকে রোগ এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। ১৯২৯ সালে হপকিন্স এ গবেষণায় নোবেল প্রাইজ পেলেন। ১৯১৩ সালে আমেরিকায় অসবোর্ন ও মেন্ডেল ডিমের কুসুমে মাখন এবং অন্যান্য স্নেহপদার্থে এমন কিছু পেলেন যা প্রাণী দেহকে সুস্থ সবল রাখে। এভাবে বিজ্ঞানীরা ক্রমে ক্রমে খাদ্যে জীবন রক্ষাকারী রোগ প্রতিরোধক পদার্থের সন্ধান পেলেন। এদের নাম দিলেন 'ভিটামিন'।

ভিটামিন এক প্রকার জৈব, রাসায়নিক পদার্থ - যা খাদ্যে অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে উপস্থিত থেকে জীবদেহকে সুস্থ সবল রাখে এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি গড়ে তোলে। বেশ কয়েকদিন ধরে প্রাণীদেহে যে কোন ভিটামিনের অভাব ঘটলে শরীর অসুস্থ হয়, এমনকি এর অভাবজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুও ঘটে।

ভিটামিনের নামকরণ হয়েছে ইংরেজি বর্ণমালা এ. বি. সি. ডি. ই ও কে দিয়ে। গবেষণাগারে ভিটামিন সনাক্ত করা হয়েছিল প্রকৃতি বা ধর্ম ও গুণ অনুসারে। এটি জৈব প্রকৃতির যৌগিক পদার্থ, কিছু কিছু ভিটামিন স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয়। আবার কিছু কিছু ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয়। দ্রবণ ক্ষমতার অনুসারে ভিটামিনকে দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়:

১. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন - ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স।
২. স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন - ভিটামিন এ. ডি, ই ও কে।

এ পর্যন্ত ১৪টি ভিটামিন গবেষণাগারে বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যরূপে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সেগুলো হল - পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যথা-

১. ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স-
থায়ামিন (ভিটামিন- বি$_১$)
রাইবোফ্লেভিন (ভিটামিন বি$_২$)
পেন্টোথেনিক এসিড
নায়াসিন
ভিটামিন বি$_৬$

বায়োটিন
ফোলাসিন
ভিটামিন- বি$_{১২}$
কোলিন
ভিটামিন- সি

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন- যথা-
ভিটামিন- এ
ভিটামিন- ডি
ভিটামিন- ই - এবং
ভিটামিন- কে।

ভিটামিনের উৎস

গাছের পাতায় যখন গ্লুকোজ তৈরি হয় সেই সাথে ভিটামিনও তৈরি হয়। গাছের সবুজ পাতা, কচিডগা, হলুদ ও সবুজ বর্ণের সবজি, ফল এবং বীচিজাতীয় অংশে ভিটামিন থাকে; যেমন- চাল, গম, ডাল বাদাম সরিষা ইত্যাদিতে কোন কোন অংশে প্রচুর ভিটামিন থাকে।

জীবজন্তু গাছের লতা, পাতা, ফল বীচি ইত্যাদি খেয়ে ভিটামিন সংগ্রহ করে। প্রাণীদেহের যকৃতে অনেক ভিটামিন জমা থাকে। ডিম ও দুধে অনেক ভিটামিন থাকে।

সাধারণত: উদ্ভিদ জগতে টাটকা শাক-সব্জি ও ফলমূলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন পাওয়া যায়।

সারাংশ
ভিটামিন একটি জৈব যৌগ রাসায়নিক পদার্থ। এটি খাদ্য উপাদানের একটি অন্যতম উপাদান, ভিটামিন সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও দেহের সুস্থতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। দ্রবণ ক্ষমতার উপর একে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। টাকাকী, লুনিন, হপকিন্স আইকম্যান অসবোর্ন মেন্ডেল অনেকেই এই ভিটামিনগুলো আবিষ্কার করেন, তাজা শাকসবজি ও ফলমূলে প্রচুর ভিটামিন থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কত বছর পূর্বে ভিটামিন আবিষ্কার হয়?
ক. দুশত বছর পূর্বে খ. মাত্র একশত বছর পূর্বে
গ. তিনশত বছর পূর্বে ঘ. চারশত বছর পূর্বে

২। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাদের বেরিবেরি রোগ হয়?
ক. ইউরোপের সৈন্যদের খ. জার্মানি সৈন্যদের
গ. জাপানের সৈন্যদের ঘ. মার্কিন সৈন্যদের

৩। বেরিবেরি নিরাময়ের খাদ্য উপাদানটি কোথায় পাওয়া যায়?
ক. আছাঁটা চালের ভিতরের অংশে খ. আছাঁটা চালের উপরের আস্তরণে
গ. কলের ছাঁটা চালের উপরের অংশে ঘ. কলের ছাঁটা চালের ভিতরের অংশে

৪। ভিটামিন কি ধরনের পদার্থ?
ক. জৈব রাসায়নিক পদার্থ খ. অজৈব রাসায়নিক পদার্থ
গ. সাধারণ যৌগিক পদার্থ ঘ. রাসায়নিক পদার্থ

৫। ভিটামিন শরীরে কি পারিমাণ প্রয়োজন হয়?
ক. প্রচুর পরিমাণে খ. সামান্য পরিমাণে
গ. মোটামুটি পরিমাণে ঘ. কিছু পরিমাণে

৬। ভিটামিন দেহে কি গড়ে তোলে?

ক. এক উদম্য উৎসাহ
খ. জীবনী শক্তি
গ. রোগ প্রতিরোধক শক্তি
ঘ. বৃদ্ধিকারক শক্তি

৭। শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুন

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন	স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন
ভিটামিন- সি ভিটামিন … … … …	ভিটামিন- এ ভিটামিন … … … … ভিটামিন- ই ভিটামিন- কে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভিটামিন কাকে বলে? ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগ করুন।
২. ভিটামিন আবিষ্কারের ইতিহাস লিখুন।
৩. ভিটামিনের উৎস লিখুন।

পাঠ- ৭.৬ ঃ ভিটামিন সি-এর অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভিটামিন 'সি' এর অভাবজনিত রোগের নাম বর্ণনা করতে পারবেন
- কি কি কারণে ভিটামিন 'সি' এর অভাব দেখা যায় তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ভিটামিন 'সি' এর উৎসগুলোর নাম বলতে পারবেন
- ভিটামিন 'সি' এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণগুলো নির্ণয় করতে পারবেন
- ভিটামিন 'সি' এর অভাবজনিত রোগে প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন

ভিটামিন সি'এর অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন- সি একটি পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন দীর্ঘদিন ধরে ভিটামিন সি'এর অভাবের ফলে যে রোগ দেখা যায় তার নাম স্কার্ভি (Scurvy)। যে কোন ব্যক্তি যদি ২-৩ মাস ধরে কোন প্রকার তাজা বা টাটকা শাক-সবজি ও ফল খাওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে তার স্কার্ভি দেখা দিবে। যে কোন বয়সেই ভিটামিন সি এর অভাবে স্কার্ভি রোগ দেখা দিতে পারে। তবে কিশোর বয়সে, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের মধ্যে স্কার্ভি বেশি দেখা যায়।

যে যে কারণে খাদ্যে ভিটামিন সি এর অভাব দেখা যায়ঃ

১. টাটকা ফল ও সবজি প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় না থাকলে কিছু দিনের মধ্যেই ভিটামিন সি'এর অভাব দেখা দিবে।
২. শহরের বাসিন্দারা টাটকা শাক-সবজি ও ফলমুল পায় না তাদের মধ্যেও স্কার্ভি দেখা দিতে পারে।
৩. যারা টিনের মধ্যে সংরক্ষিত খাবার খেয়ে থাকেন এবং টাটকা খাবার একেবারেই বর্জন করেন তাদের মধ্যেই ভিটামিন সি'এর অভাব দেখা দিতে পারে।
৪. বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যারা কাঁচা ও টাটকা ফল বা খাবার খেতে পারেন না তাদেরও ভিটামিন সি'এর অভাব হতে পারে।

লক্ষণ

১. দাঁতের গোড়া ফুলে স্পঞ্জের মত হয়ে যাওয়া ও সেখান থেকে রক্তপড়া ও দাঁত নড়বড় করা স্কার্ভির প্রধান লক্ষণ। এইক্ষেত্রে দাঁত নড়ে যেতে এবং শেষ পর্যন্ত দাঁত পড়েও যেতে পারে।
২. হাত-পায়ের গিঁটে ব্যাথা হয়।
৩. অল্পতেই ত্বকের নিচে রক্ত ক্ষরণ হয়ে কালাশিরা পড়ে এবং শরীরে কোন ক্ষত হলে সহজে সারতে চায় না।
৪. ভিটামিন সি'এর অভাব হলে এনিমিয়া হয় এবং শরীরে পানি জমে ফুলে যায়।
৫. শিশুদের স্কার্ভি হলে তাদের পায়ের হাঁটুতে ব্যথা হওয়ায় চুপচাপ পা গুটিয়ে শুয়ে থাকতে পছন্দ করে। এসব শিশুদের কোলে নিলেই কান্নাকাটি করে। এই সব শিশুদের মেজাজ খুব খিটখিটে হয়ে যায়।
৬. স্কার্ভিতে আক্রান্ত হলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায় এর ফলে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। মারাত্মক স্কার্ভির কারণে মৃত্যুও হতে পারে।

প্রতিকার

১. আকস্মিক মৃত্যুর আশংকা থাকায় দেরি না করে কৃত্রিম এসকরবিক এসিড পর্যাপ্ত মাত্রায় প্রদান করতে হবে।
২. তাজা শাক-সবজি ও ফল বিশেষ করে টকজাতীয় ফল (যেমন- লেবু, আমলকি, পেয়ারা, জাম্বুরা ইত্যাদি) পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে।
৩. যতদূর সম্ভব বিধিসম্মত পদ্ধতিতে শাক-সবজি সম্বলিত সহজলভ্য ও পর্যাপ্ত খাদ্য রোগীর রুচি অনুযায়ী সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এর নিরাময় যেমন দ্রুত এবং তেমনি সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হওয়াও সম্ভব।

প্রতিরোধ

স্কার্ভি প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১. প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে টাটকা শাক-সবজিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং প্রতিদিনই কিছু পরিমাণে টকজাতীয় ফল যেমন (লেবু, বাতাবিলেবু, আমড়া, কাঁচা পেয়ারা, আমলকি ইত্যাদি) মৌসুমী ফল খাওয়া ভাল। এতে করে ভিটামিন সি'এর অভাব জনিত রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

২. যাদের স্কার্ভি হওয়ার ঝুঁকি আছে তাদের ভিটামিন সি'এর পরিপূরক দিতে হবে।
৩. ২ বছরের নিচের বয়সের শিশুরা যারা বোতলে দুধ খায় তাদেরকে প্রতিদিন কিছু পরিমাণে ফলের রস খাওয়ালে তাদের চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে।
৪. যারা টিনে সংরক্ষিত খাদ্য গ্রহণ কারণে যেমন- অভিযাত্রী দল, অনুর্বর এলাকায় কর্মরত সৈন্যদল তাদের জন্য স্কার্ভির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এই সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম এসকরবিক এসিড সেবন করতে হবে।

সারাংশ
ভিটামিন সি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। এ ভিটামিন এর ২-৩ মাস পর্যন্ত একাধারে অভাব হলে দেহে স্কার্ভি নামক রোগ দেখা দেয়। বেশির ভাগ কিশোর বয়সে এবং গর্ভবতী মায়েদের এ রোগ বেশি হয়। স্কার্ভি রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রচুর পরিমাণে তাজা শাক-সবজি এবং টকজাতীয় ফলমূল খেতে দিতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারে পরামর্শ নিতে হবে। মারাত্মক আকার ধারণ করলে রোগীর অবস্থা খুবই আশংকাজনক হতে পারে। এ রোগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলে অনেক ভাল থাকা যায়। প্রত্যক খাবারে পর্যাপ্ত টাটকা শাক-সবজি এবং ফলমূল গ্রহণে এ রোগের আর্বিভাব ঘটবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভিটামিন 'সি' কিসে দ্রবীভূত নয়?

ক. চর্বিতে	খ. মধুতে
গ. পানিতে	ঘ. এসিডে

২। ভিটামিন 'সি' এর অভাবে কি রোগ হয়?

ক. বেরিবেরি	খ. হাঁটুব্যাথা
গ. রাতকানা	ঘ. স্কার্ভি

৩। কোন কোন বয়সে স্কার্ভি রোগ বেশি হয়?

ক. কিশোর, গর্ভবতী ও স্তনদাত্রী মায়ের	খ. শিশুকালে ও বৃদ্ধ বয়সে
গ. কিশোরে ও যৌবনে	ঘ. নবজাতক অবস্থায়

৪। কোন কোন খাবার না খেলে ভিটামিন সি এর অভাব দেখা যায়। শূন্যস্থানে লিখুন।

(ক) মাছ, মাংস, ঘি, মাখন, দুধ ও ডিম, আটা শাক সবজি, গম, আলু, টক জাতীয় ফল মূল, টিনজাত খাদ্য বস্তু।	শূন্যস্থান পূরণ করুন। …

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

অল্পতেই ____________ নিচে রক্তক্ষরণ হয়ে ____________ পড়ে
এবং ____________ কোন ক্ষত ____________ সহজে ____________ চায় না।

৬। এক বাক্যে উত্তর দিন।

অভিযাত্রী দল অনুর্বর এলাকায় কর্তব্যরত সৈন্যদলের জন্য ভিটামিন 'সি' কিভাবে সরবরাহ করতে হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভিটামিন 'সি'র অভাব জনিত রোগের নাম কি? এ রোগের লক্ষণগুলো লিখুন।
২. স্কার্ভি রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন।
৩. ভিটামিন 'সি' এর উৎসগুলো লিখুন।

পাঠ- ৭.৭ ঃ ভিটামিন ‘বি’ এর অভাবজনিত রোগ (থায়ামিন বি১, রিবোফ্লভিন বি২ এবং নায়াসিন)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এর ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লভিন) এবং নায়াসিনের অভাবজনিত রোগগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- ভিটামিন বি১ ভিটামিন বি২ এবং নায়াসিনের অভাবজনিত রোগের লক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভিটামিন বি১ ভিটামিন বি২ এবং নায়াসিনের অভাবজনিত রোগগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এর মধ্যে অনেকগুলো ভিটামিনের নাম অর্ন্তভুক্ত আছে। পূর্বের পাঠে আমরা সেগুলোর নাম শ্রেণীকরণের সময় উল্লেখ করেছি। এই পাঠে আমরা শুধু ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লভিন) এবং নায়াসিন সম্পর্কে আলোচনা করব।

বি-কমপ্লেক্স ভিটামিনগুলো যেহেতু পানিতে দ্রবণীয় সেহেতু এগুলো রান্না করার সময় বিশেষভাবে সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। এ সমস্ত ভিটামিনযুক্ত খাবারগুলো রান্নার পূর্বে বেশি পানিতে ধুয়ে পানি ফেলে দিলে ভিটামিন অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যাবে। বেশি পানিতে ঢাকনাহীন অবস্থায় রান্না করলেও ভিটামিন অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এসকল ব্যবস্থা গ্রহণে সচেতন হতে হবে।

ভিটামিন বি’এর অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন বি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর মধ্যে অন্যতম। বেশ কয়েকটি ভিটামিনের সমন্বয়ে বি-কমপ্লেক্স গঠিত। এই ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। বি-কমপ্লেক্স এর অভাবজনিত রোগগুলোর মধ্যে বেরিবেরি, মুখে ও ঠোঁটের কোনায় ঘা, পেলেগ্রা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই রোগগুলো যথাক্রমে বি১, বি২ ও নায়াসিনের অভাবে হয়ে থাকে। নিচে এদের সমন্বয়ে আলোচনা করা হল।

ক) থায়ামিনের অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন বি১ বা থায়ামিনের অভাবে বেরিবেরি নামক রোগ দেখা দেয়। বেরিবেরি শব্দটি সিংহলী ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ “আমি পারি না”, এই কথার তাৎপর্য এই যে, রোগী এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তারপক্ষে কোন কাজ করাই সম্ভব হয় না।

যে যে কারণে থায়ামিনের অভাব দেখা যায়

১. যারা দীর্ঘদিন ধরে কালেছাটা চাল গ্রহণ করে এবং অন্যান্য খাদ্য কম পরিমাণে গ্রহণ করে তাদের মধ্যে থায়ামিনের ঘাটতি দেখা যায়।
২. সংক্রমণ, কঠিন দৈহিক শ্রম কিম্বা গর্ভাবস্থায় বা স্তন্যদানকালে শরীরের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই সকল অবস্থায় যদি খাদ্যের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে থায়ামিন সরবরাহ করা না হয় তাহলে বেরিবেরি রোগের প্রকাশ তরান্বিত হয়।
৩. স্তন্যদাত্রী মায়ের খাদ্যে থায়ামিনের ঘাটতি থাকলে মায়ের দুধেও থায়ামিনের অভাব থাকবে ফলে মায়ের দুধপানকারী শিশুর মধ্যেও অভাব দেখা দিবে।

লক্ষণ

দু প্রকারের বেরিবেরি দেখা যায়- সিক্ত বা ভিজা বেরিবেরি ও শুষ্ক বেরিবেরি।

১. পা অবশ হলে চলার শক্তি রহিত হয়। অন্যান্য পেশীর দুর্বলতা থাকে।
২. হৃদপিন্ডের কাজে বিঘ্ন ঘটে ও স্নায়ুর প্রদাহ দেখা দেয়। স্নায়ুর ক্রটির কারণে পেশীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যায়।
৩. ক্ষুধামন্দা ও হজমের গোলমাল হয়।
৪. ওজন হ্রাস পায়।
৫. বুক ধরফর করে ও মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

৬. শরীরের বিভিন্ন অংশে পানি জমে ফুলে ওঠে। বিশেষ করে পায়ে পানি জমে ফুলে এমন হয় যে, টিপলে সে জায়গাটা বসে যায়। এই ক্ষেত্রে মুখেও পানি জমতে পারে। শুষ্ক বেরিবেরিতে পায়ে পানি জমে না ও পা ফোলে না। তবে সিক্ত বেরিবেরির অন্যান্য লক্ষণগুলো বিদ্যমান থাকে।

যে কোন বয়সেই এই বেরিবেরি রোগ হতে পারে। যে সব অঞ্চলে বয়স্ক লোকের মধ্যে বেরিবেরি প্রাদুর্ভাব বেশি, সেখানে শিশুদের মধ্যেও এই রোগ দেখা দেয়। মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভরশীল নবজাতকের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম মাস বয়সের মধ্যে এই রোগ দেখা দিয়ে থাকে। মায়ের দেহে থায়ামিনের ঘাটতিই বুকের দুধের মধ্যে থায়ামিনের ঘাটতির কারণ এবং এর ফলে দুধের উপর নির্ভরশীল শিশুর মধ্যে বেরিবেরি দেখা দিতে পারে। শিশুর বেরিবেরি হলে যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়, তা হলঃ

১. শিশু অস্থির থাকে ও কান্নাকাটি করে।
২. প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং মুখের ফোলা ভাব লক্ষ্যণীয়।
৩. এরপর শিশুর হঠাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে ফলে শিশু নীল হয়ে যায় ও ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুবরণও করতে পারে।

তবে ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী রোগে ক্ষুধামন্দ্য, বমি, উদারময় ও অন্যান্য অপুষ্টির লক্ষণ থাকতে পারে।

প্রতিকার

১. রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথেই চিকিৎসা শুরু করতে হবে। থায়ামিন পরিপূরক হিসেবে নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবন করতে হবে।
২. প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রাকৃতিক উৎস হতে থায়ামিনসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
৩. কোন জটিলতা দেখা দিলে বা সংক্রমণ থাকলে চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

প্রতিরোধ

১. অতি-ছাঁটা আতপ চালের পরিবর্তে অল্প-ছাঁটা ও আংশিক সিদ্ধ চাল খাওয়ার অভ্যাস করলে থায়ামিনের অভাব প্রতিরোধ করা যাবে।
২. প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি অন্যান্য থায়ামিন সমৃদ্ধখাদ্য; যেমন- দুধ, ডিম, মাছ বা মাংস, ডাল ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে থায়ামিনের অভাব হবে না।
৩. স্তন্যদাত্রী মায়ের খাদ্যে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থায়ামিন থাকে সেজন্য মাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন বোধে কৃত্রিম থায়ামিন পরিপূরক হিসেবে দিতে হবে।
৪. এছাড়াও উন্নততর শিক্ষাদান, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন ও যথেষ্ট সংখ্যক মাতৃ এবং শিশুস্বাস্থ্য সদন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব।

খ. রিবোফ্লাভিনের অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণসমূহ

দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যে রিবোফ্লাভিনের ঘাটতি দেখা দিলে রিবোফ্লাভিনের অভাবজনিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। খাদ্যের মধ্যে বি$_২$ বা রিবোফ্লাভিন নামক ভিটামিনের অভাবে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

১. ঠোঁটের দুই কোনায় ঘা হয় (angular stomatitis)
২. জিহ্বা চকচকে ও ম্যাজেন্ডা বর্ণ ধারণ করে ও ফুলে যায় (Glossitis)
৩. মুখের ভিতরে ঘা হয় (Cheilosis)
৪. নাকের দুপাশে তৈলাক্ত গুটির মত দেখা দেয় (Vesolabial Scborrhoca)

খাদ্যে রিবোফ্লাভিনের অভাবের কারণ

১. খাদ্যে ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ডাল ও শাক সব্জির অনুপস্থিতি বা প্রয়োজনের চাইতে দীর্ঘদিন ধরে কম খাওয়ার ফলে রিবোফ্লাভিনের অভাব দেখা যায়।
২. সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর বা শরীরের চাহিদা অন্য যে কোন কারণে বৃদ্ধি পেলে এবং চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা না হলেও অভাবজনিত লক্ষণাদি দেখা দিবে।

প্রতিকার

১. প্রতিদিন খাদ্যের তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, ডিম, মাংস বা মাছ ডাল, শাক-সবজি রাখতে হবে।
২. কৃত্রিম রিবোফ্লাভিন গ্রহণ করতে পারলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। কৃত্রিম রিবোফ্লাভিন গ্রহণ করলে মূত্রের রং হলদে হতে পারে।

প্রতিরোধ

১. শাক-সবজি রান্নার সময় কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে পানিতে দ্রবণীয় এই ভিটামিনটি নষ্ট হয়ে না যায়। শাক-সবজি সিদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত পানি দেওয়ার ফলে যেটুকু নষ্ট হয়, তাছাড়া প্রচলিত রন্ধন প্রক্রিয়ায় এই ভিটামিন নষ্ট হয় না। এসব বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। গৃহিণীদের সবজি রান্নায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে।
২. চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনে পরিপূরক সেবন করতে হবে।

গ. নায়াসিনের অভাবজনিত রোগ

নায়াসিনের অভাবযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে পেলেগ্রার আর্বিভাব ঘটতে পারে।

কারণ

১. যে সব দরিদ্র কৃষক ভূট্টার উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে থাকে তাদের মধ্যে পুষ্টি ঘাটতি স্থানিক রোগ হিসেবে পেলেগ্রার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্যিত হয়। ভূট্টার অধিকাংশ পরিমাণ নায়াসিন সংযুক্ত অবস্থায় (বাউন্ড ফর্মে) নায়াসিটিন রূপে উপস্থিত থাকার ফলে দেহে সদ্ব্যবহার করতে পারে না ফলে নায়াসিনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়।
২. দীর্ঘস্থায়ী মাদকাসক্তির জটিলতা বা উপসর্গ রূপে এই রোগের আবির্ভাব ঘটতে পারে।
৩. কিডনীর নিষ্ক্রিয়তায় আক্রান্ত যেসব রোগী এমন স্বল্প প্রোটিন খাদ্যের উপর র্নিভরশীল, যা ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স সম্পৃক্ত নয়, তাদের মধ্যেও পেলেগ্রা হতে পারে।
৪. পরিপাকতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী রোগের কারণে বিশোষণ না হলে বা বিশোষণ বৈকল্যের সৃষ্টি হলে পেলেগ্রার উৎপত্তি হতে পারে।

লক্ষণ

পেলেগ্রাতে আক্রান্ত রোগীর ওজন হ্রাস পায় ও দেহে পুষ্টি স্বল্পতার সাধারণ লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ঋতুবন্ধতা দেখা দিতে পারে। ইংরেজিতে পেলেগ্রার লক্ষণাদিকে ৩টি ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং একে তিনটি চিহ্নিত ব্যাধি রূপে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

৩টি D (ডি) অর্থাৎ
১. ডারমাটাইটিস (ত্বক প্রদাহ)
২. ডায়রিয়া (উদরাময়)
৩. ডেমেনশিয়া (মানসিক বৈকল্য)

অর্থাৎ পেলেগ্রাতে প্রধানত ত্বক, পরিপাক তন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়।

১. **ত্বক ঃ** দেহের যে সমস্ত স্থানে সূর্যের আলো পড়ে, বিশেষ করে হাতের পৃষ্ঠ, ঘাড়, বাহু, মুখমন্ডল ইত্যাদি স্থানে লালচে রঙের ফুঁসকুড়ি দেখা দেয়। আক্রান্ত চামড়া প্রথমে লাল ও সামান্য ফোলা দেখায় এবং সেই সংগে চুলকানি ও জ্বালা অনুভূত হতে থাকে। এরপর আক্রান্ত অংশ বাদামি বা কালচে বর্ণ ধারণ করে। যে সব ব্যক্তি ঘরের বাইরে যান না তাদের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ছাড়াই কখনো কখনো পেলেগ্রা রোগের প্রকাশ ঘটতে পারে। পেলেগ্রার এই রূপটির নাম "পেলেগ্রা সাইন পেলেগ্রা" অর্থাৎ পেলেগ্রা হীন পেলেগ্রা।
২. **পরিপাকতন্ত্র ঃ** ডায়রিয়া প্রাধান্য উপস্থিত থাকলেও সদাসর্বদা দেখা দেয় না। ক্ষুধামান্দ্য, বমির ভাব, শ্বাসকষ্ট, অজীর্ণতা, হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অভাব দেখা দিতে পারে। জিহ্বা লাল হয়ে ফুলে যায় ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। ডায়রিয়ার সাথে মলে রক্ত ও মিউকাস মিশ্রিত থাকে।
৩. **স্নায়ুতন্ত্র ঃ** মৃদু পর্যায়ের আক্রমণের প্রধান লক্ষণ হল দুর্বলতা, উদ্বেগ, বিষন্নতা, বিরক্তি প্রবণতা এবং মনোযোগের অভাব। গুরুতর আক্রমণের একিউট অবস্থায় মানসিক বিপর্যয়ের প্রধান নিদর্শন প্রলাপ এবং দীর্ঘস্থায়ী অবস্থায় ডেমেনসিয়া (চিত্ত ভ্রম) দেখা দেয়।

প্রতিকার

১. দ্রুত উপশমের জন্য নিকোটিনামাইড দেয়া যেতে পারে এবং এর সাথে প্রোটিনসমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্যের সম্পূরক সরবরাহ করা উচিত।
২. মদ্যপান নিষিদ্ধ করতে হবে।
৩. ডায়রিয়ার কারণে ইলেকট্রোলাইটের গোলযোগ দেখা দিলে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
৪. সংক্রমণের উপস্থিতিতে যথাযথ চিকিৎসা নিতে হবে।

প্রতিরোধ

১. নির্দিষ্ট খাদ্যশস্য যেমন ভুট্টার উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে অন্যান্য খাদ্যের উৎপাদন ও গ্রহণ বাড়াতে হবে।
২. দুধ, ডিম ও মাংস ইত্যাদি উচ্চমূল্যের প্রোটিন সমৃদ্ধ আহারের যোগান নিশ্চিত করতে হবে।
৩. পেলেগ্রায় আক্রান্ত রোগীর পরিবারবর্গের জন্য ঈষ্ট-নির্যাস গ্রহণে ব্যবস্থাপত্র চিকিৎসকের পক্ষে থেকে প্রদান করা।
৪. কোন কারণে শরীরের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে খাদ্য হতে যাতে সরবরাহ বৃদ্ধি পায় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিপূরক হিসেবে কৃত্রিম নায়াসিন সেবন করতে হবে।

সারাংশ

ভিটামিন বি$_{১}$ ভিটামিন বি$_{২}$ এবং নায়াসিন পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের মধ্যে অন্যতম। ভিটামিন বি১ এর অভাবে বেরিবেরি নামক রোগ হয়। ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লেভিন) এর অভাবে মুখের ঘা ঠোঁটের কোনে ঘা এবং জিহ্বা চকচকে হয়ে যায়। নায়াসিনের অভাবে পেলেগ্রা নামক রোগ হয়। বেশ কিছুদিন একাধারে এসব ভিটামিনযুক্ত খাবারের অভাবেই রোগগুলো দেখা দেয় নানা ধরনের লক্ষণ নিয়ে। এসব রোগে অনেক দিন ধরে ভোগলে মৃত্যুও ঘটে যায়। তাই যথাসম্ভব পর্যাপ্ত পরিমাণে এসব ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং প্রয়োজনে ডাক্তারে পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে অর্থাৎ যখন অভাব মারাত্মক আকারে দেখা দিবে তখন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি ভিটামিনযুক্ত টেবলেট খেয়ে অভাব কাটিয়ে শরীরকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সগুলো পানিতে ধুলে কি হয়?
ক. অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায় খ. ভাল থাকে
গ. একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় ঘ. মোটেই নষ্ট হয় না

২। ভিটামিন বি$_{১}$ এর রাসায়নিক নাম কি?
ক. রিবোফ্লাভিন খ. থায়ামিন
গ. নায়াসিন ঘ. এসকরবিক এসিড

৩। ভিটামিন বি$_{২}$ এর রাসায়নিক নাম কি?
ক. থায়ামিন খ. নায়াসিন
গ. রিবোফ্লভিন ঘ. এসিটিক এসিড

৪। বি$_{১}$ (থায়ামিন) এর অভাবে কি রোগ হয়?
ক. মুখে ঘা খ. ঠোঁটের দুই কোনে ঘা
গ. বেরিবেরি ঘ. পেলেগ্রা

৫। নায়াসিনের অভাব হলে কি রোগ হয়?
ক. স্কার্ভি খ. বেরিবেরি
গ. পেলেগ্রা ঘ. হাঁটু ব্যথা

৬। কোন রোগে শরীরের বিভিন্ন অংশে পানি জমে ফুলে ওঠে?
ক. মুখে ঘা খ. পেলেগ্রা
গ. বেরিবেরি ঘ. রাতকানা

৭। পেলেগ্রা রোগের লক্ষণ কোনটি?
ক. মানসিক অবসাদ দেখা দেয় খ. মাদকাশক্তির জটিলতা দেখা দেয়

গ. নাকের দুই পাশে গুটি দেখা দেয় ঘ. ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ হয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১. থায়ামিনের (বি$_১$) অভাবজনিত রোগের কারণ ও লক্ষণগুলো বিস্তারিত লিখুন।
২. রিবোফ্লাভিন (বি$_২$) অভাবজনিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
৩. নায়াসিনের অভাব কি প্রকারে দৈহিক জটিলতা দেখা দেয় এবং এদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে নেবেন আলোচনা করুন।

পাঠ– ৭.৮ ঃ ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবের কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন
- ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে চোখের কি কি রোগ হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন
- রাতকানা রোগ সম্পর্কে অবহিত হবেন
- ‘এ’ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের প্রতিকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ‘এ’ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারবেন

আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু ও মাতা ভিটামিন ‘এ’ অভাবজনিত রোগে ভুগে জীবনের সমস্ত সচলতা ও সজীবতা হারিয়ে ফেলে। এক কথায় জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই জন্মের শুরুতেই শিশুকে ও গর্ভবস্থায় মাকে ভিটামিন ‘এ’ যুক্ত খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে দিতে হবে। ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবার আমাদের দেশে সহজে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়।

‘এ’ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যে ভিটামিন ‘এ’ এর ঘাটতি থাকলে ধীরে ধীরে চোখের রোগ দেখা যায়। আমাদের দেশে প্রতিবছর হাজার হাজার শিশু ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবের কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়ঃ

১. ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাদ্য কম গ্রহণ।
২. তেল গ্রহণ কম হওয়ায় ভিটামিন ‘এ’ এর শোষণ ব্যহত হয় এবং পরিণামে অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।
৩. কোলেস্ট্রাম বর্জন করা অর্থাৎ শিশু জন্মের পর মায়ের শাল দুধের (প্রথম বুকের দুধ) কোলেস্ট্রাম না দেওয়ায় শিশুর ভিটামিনের ঘাটতি দেখা যায়।
৪. বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের কারণে; যেমন- ডায়রিয়া, হাম ইত্যাদি রোগে ভিটামিন ‘এ’ এর চাহিদা বেড়ে যায় কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ না হওয়ায় অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।
৫. সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার; যেমন- শিশুদের শাক পাতা ও রঙিন সবজি খেতে না দেওয়া ইত্যাদি কারণে ধীরে ধীরে শিশুর মধ্যে অভাবজনিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

এ ভিটামিনের অভাবে চোখের যে রোগগুলো দেখা যায় তা নিচে দেওয়া হল ঃ

১. রাতকানা (Night blindness)
২. জেরোপথ্যালমিয়া (Xeropthalmia)
৩. বিটট্স্ স্পট (Bitot`s sports)
৪. ক্যারাটোম্যালেশিয়া (Keratomalacia)

১। রাতকানা (Night blindness)

রাতকানা হল ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবের প্রথম লক্ষণ। ‘এ’ ভিটামিনের মৃদু অভাবে প্রথমে রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগে দিনের বেলায় দেখতে অসুবিধা হয় না কিন্তু সন্ধ্যা হলে অল্প আলোতে বা অন্ধকারে দেখার অসুবিধা ঘটে এবং তীব্র আলো হতে অন্ধকারে আসলে চোখে ধাঁ ধাঁ লাগে অর্থাৎ স্বাভাবিকে ফিরে আসতে সময় লাগে। সুস্থ চোখ দিয়ে দিনের বেলায় যেমন ভাল দেখা যায় তেমনি রাতের বেলায়ও ভালভাবে দেখতে পারা যায়। আমাদের চোখের রেটিনায় রড নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। এই রঞ্জক পদার্থের সংশ্লেষণে ভিটামিন ‘এ’ এর প্রয়োজন। রাতকানা রোগে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবের ফলে রডপসিনের সংশ্লেষণ কমে যায় এবং স্বল্প আলোতে দেখবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। রাতকানায় আক্রান্ত শিশু দিনের বেলায় প্রচুর আলো থাকায় সে ভালভাবে দেখতে পায়, কিন্তু রাতের বেলায় বা অন্ধকার ঘরে আদৌ দেখতে পায় না।

খাদ্যে ভিটামিন এ’ এর অভাব → রক্তে এ ভিটামিনের মাত্রা কমে যায়

↓

রডপসিনের সংশ্লেষণ হ্রাস পায়

↓

রাতকানা রোগ হয়

২। জেরোপথ্যালমিয়া (Xeropthalmia) ঃ এই লক্ষণ চোখের কর্নিয়া এবং কনজাংটিভা এই দু অংশে দেখা দিতে পারে।

ক) কনজাংটিভাল জেরোসিস (Conjunctival xerosis) ঃ এ ক্ষেত্রে কনজাংটিভা শুষ্ক ও পুরু হয়ে যায়। চোখের চকচকে ও সুন্দর ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। চোখের সাদা অংশ একটি আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। এটাকে কনজাংটিভা বলে। কনজাংটিভা স্বচ্ছ থাকার কারণেই এর ভিতর দিয়ে চোখের সাদা অংশটুকু দেখতে পাওয়া যায়। তাই গোটা অংশ সাদা দেখা যায়। চোখের পাতা দুটো পিটপিট করে চোখের পানি দিয়ে ‘কনজাংটিভা’ ও ‘কর্ণিয়াকে’ মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে। ভিটামিন এ’এর অভাবে চোখের পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি থাকে না। ভিটামিন এ এর অভাবের কারণে চোখের পানি পাতলা হয় এবং তৈলাক্ত প্রকৃতির হয় না। ফলে কনজাংটিভা এবং কর্ণিয়ার মাঝে সে পানি থাকতে পারে না। এতে করে কনজাংটিভা শুকিয়ে যায়। ফলে চোখের সাদা অংশ মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে না। কনজাংটিভার শুষ্কতাই জেরোপথালমিয়ার (শুষ্কচোখ) প্রথম চিহ্ন।

খ) কর্ণিয়াল জেরোসিস (Corneal xerosis) ঃ একটি সুস্থ কর্ণিয়া স্বচ্ছ থাকে, যাতে করে এর মধ্যে দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে। এটা অবশ্যই মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকতে হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ ভিটামিন এ’এর অভাবে ভুগলে এবং তার চিকিৎসা করা না হলে চোখের কর্ণিয়ার শুষ্কতা দেখা যায় যাকে কর্ণিয়াল জেরোসিস বলে। কর্ণিয়ার শুষ্কতা বিস্তৃত হলে কর্ণিয়া বিবর্ণ, ঝাপসা ও নিস্প্রভ দেখায়। এই অবস্থায় চিকিৎসা করা না হলে রোগী অন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি ভিটামিন এ’এর অভাবে ভোগা একজন শিশু হাম বা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় তাহলে তার কর্ণিয়া আরও তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং রোগী অন্ধ হয়ে যায়।

৩। বিটট্স্ স্পট (Bitot`s sports) ঃ ফ্রান্সের ডাঃ বিটট্ জেরোথালমিয়ার এই বিশেষ চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। কনজাংটিভা শুষ্ক থাকে বলেই চোখের সাদা অংশের বিভিন্ন দিকে আবরণ তৈরি হয়। এগুলো সাবান গোলা পানির ফেনিল বুদবুদের মত উজ্জ্বল সাদা ‘প্লাক’ যা ত্রিভুজাকৃতি বিশিষ্ট। শিশুদের ভিটামিন এ’এর অভাব হলে এই ধরনের বিটট্স্ স্পট দেখা যায়।

৪। কেরাটোম্যালেশিয়া (Keratomalacia) (কর্ণিয়ার নরম ভাব বা ঘা) ঃ চোখের কর্ণিয়ার স্বাভাবিক সজীব আবরক কলা নষ্ট হয়ে তার স্থলে শুষ্ক স্তরযুক্ত কেরাটিন সম্পৃক্ত আবরক কলা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় কর্ণিয়ার চিকিৎসা করা না হলে, কর্ণিয়াতে খুব তাড়াতাড়ি ঘা তৈরি হয়। এ ঘা বড় হলে চোখ নরম হয়ে যায়। অল্প ঘা হয়ে যাওয়া অবস্থায় ভিটামিন ‘এ’ দিয়ে যদি শুরুতেই চিকিৎসা করা হয় তবে এটা সেরে যাবে এবং ছোট একটা দাগ থাকবে। ঘা যদি বড় হয় এবং চোখ নরম হয়ে যায় তবে চোখে দাগের বিস্তৃতি ঘটবে এবং রোগী অন্ধ হয়ে যাবে। তাই অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করার পূর্বেই সময়মত প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

চিত্র ঃ

প্রতিকার

১. অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব চিকিৎসার জন্য ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল (VAC) শিশুকে নির্ধারিত ডোজে দিতে হবে। ক্যাপসুল প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট তালিকা রয়েছে এবং ক্যাপসুলের শক্তি সব সময় ২০০,০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট থাকা উচিত।

জোরোপথ্যালমিয়ার লক্ষণ ও চিহ্ন দেখা গেলে চিকিৎসার জন্য ৩টি করে ক্যাপসুল রোগীকে দিতে হবে। প্রথম দিন একটি ক্যাপসুল দিতে হবে। দ্বিতীয় দিন আরো একটি ক্যাপসুল দিতে হবে এবং ২ সপ্তহের মাথায় শেষ ক্যাপসুলটি দিতে হবে। শুধুমাত্র ৩টি মাত্রাই (তিনটি ক্যাপসুল) দিতে হবে। এর চেয়ে বেশি মাত্রা সেবন করলে এতে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। ভিটামিন এ' ক্যাপসুল নিরাপদ, যদি এটাকে নিচে উল্লেখিত নির্দেশমত সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসার তালিকা নিম্নরূপ ঃ

বয়স	দিন	ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল (২,০০,০০০ আই ইউ)
১ বছরের নিচে	প্রথম দিন	৪ ফোঁটা অর্থাৎ ১,০০,০০০ আই, ইউ বা সলিউশন দিতে হবে।
	দ্বিতীয় দিন	৪ ফোঁটা অর্থাৎ ১,০০,০০০ আই, ইউ বা সলিউশন দিতে হবে।
	চৌদ্দ দিনের মাথায়	১টা ক্যাপসুল বা সলিউশন দিতে হবে।
৪ বছরের উপরে	প্রথম দিন	১টি ২,০০,০০০ আই, ইউ ক্যাপসুল বা সলিউশন দিতে হবে।
	দ্বিতীয় দিন	১টি ২,০০,০০০ আই, ইউ ক্যাপসুল বা সলিউশন দিতে হবে।
	চৌদ্দ দিনের মাথায়	১টি ২,০০,০০০ আই, ইউ ক্যাপসুল বা সলিউশন দিতে হবে।

কর্ণিয়ার শুষ্কতা বা ঘা আক্রান্ত শিশুকে একটি ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দিতে হবে এবং নিকটস্থ চিকিৎসক বা চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে। শিশুদের অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের লক্ষণ ও চিহ্ন মারাত্বক অপুষ্টি, হাম, ডায়রিয়া এবং নিউমোনিয়ার পর দেখা দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী পর পর দুদিন ২টি ডোজ এবং ১৪ দিন পর আর একটি ডোজ দিতে হবে।

২. শিশুর খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ও রঙিন শাক-সবজি ও ফলমূল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. কডলিভার ওয়েল, মাখন বা ঘি ইত্যাদি খাদ্য প্রতিদিনে খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।

প্রতিরোধ

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১. শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এই জন্য পারিবারিক সবজির বাগান তৈরির ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।
২. হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পুষে ডিম, মাংস এবং দুধের জোগান বাড়াতে হবে। এতে করে ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে।
৩. প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় শাক-সবজি ও রঙিণ ফলমূলের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং শাক-সবজি তেল দিয়ে রান্না করে খেতে হবে। এতে করে চর্বিতে দ্রবণীয় ক্যারটিন শোষণ সম্ভব হবে এবং ভিটামিন এ'এর চাহিদা মিটবে।
৪. অন্ধত্ব প্রতিরোধের জন্য শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল দিতে হবে যার ক্ষমতা হবে ২,০০,০০০ আই, ইউ। ক্যাপসুল প্রতি ৬ মাসে ১ বার দিতে হবে। ১টি গ্রীষ্মকালে এবং অপরটি শীতকালে।

প্রতিরোধের জন্য তালিকাটি নিম্নরূপঃ
ভিটামিন এ

- ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে ১,০০,০০০ (৪ ফোঁটা) আই, ইউ দিতে হবে।
- ১-৬ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে ২,০০,০০০ আই, ইউ দিতে হবে।

৫. শিশুকে জন্মের পর কোলেস্ট্রাম (মায়ের বুকের প্রথম দুধ) দিতে হবে।
৬. ৫ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ এবং ২ বছর পর্যন্ত পরিপূরক খাদ্যের পাশাপাশি শিশুকে বুকের দুধ দিতে হবে।
৭. মাকে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে শিশুর উপযোগী ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি ও পরিবেশন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে। যেমন ঃ

ক) মিষ্টি আলু এবং গাজর একসাথে চটকিয়ে শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। অথবা একসাথে হালুয়া তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে।

খ) ক্যারটিন সমৃদ্ধ সবজি ও ফল উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

গ) খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি শিখতে হবে এবং প্রয়োজনে এর ব্যবহার করার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে।

৮. সন্তান সম্ভব্য মাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ'সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৯. গণমাধ্যমগুলোতে ভিটামিন এ'এর অভাবজনিত কুফল ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে সহজেই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

সারাংশ

'এ' ভিটামিনের অভাবে চোখের অসুখগুলোই প্রধানত প্রকট হয়ে ওঠে; যেমন- রাতকানা, জেরোপথ্যালমিয়া, বিটট্স্ স্পট ও ক্যারাটোম্যালেশিয়া। এসব রোগের চিকিৎসার জন্য ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল (VAC) শিশুকে নির্ধারিত ডোজে দিতে হবে। ভিটামিন 'এ' অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধের জন্য, শাক-সব্জির উৎপাদান বাড়িয়ে সেগুলো গ্রহণে খাদ্য ব্যবস্থা দিতে হবে। হাঁস-মুরগির ডিম, এবং দুধের জোগান বাড়াতে হবে। এতে করে খাদ্যে ভিটামিন 'এ' চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে। এ ছাড়াও পরিপুরক খাবারে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিশুকে অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সন্তান সম্ভবা মাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করতে হবে। গনমাধ্যমে ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাদ্য গ্রহণে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আমাদের দেশে কারা 'এ' ভিটামিনের অভাবে ভোগে বেশি?

ক. কিশোরেরা খ. যুবকেরা
গ. শিশু ও সন্তান সম্ভবা মায়েরা ঘ. বয়স্করা

২। রাতকানা রোগের লক্ষণ কোনটি?

ক. দিনে চোখে দেখে না খ. আলোতে দেখতে পায় না
গ. অন্ধকারে দেখতে পায় না ঘ. রাতের বেলায় অন্ধকার ঘরে আদৌ দেখতে পায় না।

৩। কীসের অভাবে ক্যারাটোম্যালেশিয়া রোগ হয়?

ক. 'ডি' ভিটামিনের খ. বি, ভিটামিন
গ. 'এ' ভিটামিন ঘ. সি-ভিটামিন

৪। নিচের শূন্যস্থানটি সঠিক উত্তরের সাহায্যে পূরণ করুন।

খাদ্যে ভিটামিন 'এ' এর অভাবে → রক্তে 'এ' ভিটামিনের মাত্রা কমে যায়
↓
রডপসিনের সংশ্লেষন হ্রাস পায়
↓
... ...

৫। জেরোপথ্যালমিয়া রোগের প্রথম চিহ্ন কি?

ক. কনজাংটিভার শুষ্কতা খ. কর্নিয়ার মসৃণতা
গ. চোখের সাদা অংশ লাল হওয়া ঘ. চোখের সাদা অংশের মসৃণতা

৬। কর্নিয়াল জেরোসিস কোন ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ?

ক. 'সি' ভিটামিন খ. 'বি১২' ভিটামিন
গ. 'এ' ভিটামিন ঘ. 'ডি' ভিটামিন

৭। কর্নিয়াল জেরোসিস রোগের লক্ষণ কি?
ক. চোখের পাতা ঝুলে যায়
খ. চোখের সাদা অংশ মসৃণতা হারায়
গ. চোখের কর্নিয়ার শুষ্কতা দেখা দেয়
ঘ. চোখের পানিতে তৈলাক্ত ভাব থাকে না

৮। ভিটামিন 'এ' অভাব পূরণে কি করতে হবে?
ক. বেশি বেশি খাবার খেতে হবে
খ. বেশি বেশি দুধ মাছ ও মাংস খেতে হবে
গ. ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ বাড়াতে হবে
ঘ. ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে

৯। অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধে কি করতে হবে?
ক. লেখাপড়া শেখাতে হবে
খ. বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে
গ. শাক-সবজি, হাঁস-মুরগি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যের চাহিদা মিটাতে হবে
ঘ. চোখের অপারেশান বিনা মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে।

১০। ১-৬ বছরের শিশুকে ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধে কত আই ইউ ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দিতে হবে?
ক. ২,০০,০০০ আই, ইউ ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দিতে হবে
খ. ৩০,০০,০০০ আই, ইউ ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দিতে হবে
গ. ৪০,০০,০০০ আই, ইউ ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দিতে হবে
ঘ. ৫০,০০,০০০ আই, ইউ ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দিতে হবে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত রোগগুলোর নাম উল্লেখ করে যে কোন একটির লক্ষণ ও প্রতিকার লিখুন।
২. রাতকানা রোগ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
৩. বিটটস স্পট এবং কেরাটোম্যালেসিয়া সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ- ৭.৯ ঃ ভিটামিন ডি-এর অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভিটামিন 'ডি' এর উৎস সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- ভিটামিন 'ডি' এর অভাবজনিত রোগ-এর লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- ভিটামিন 'ডি' এর অভাবজনিত রোগে প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন

শীত প্রধান দেশগুলো এবং উত্তর গোলার্ধের দেশগুলো থেকে আমাদের দেশে সূর্যের আলোর পর্যাপ্ততা অনেক বেশি। আর এই সূর্যের আলো যে রশ্মি ছড়ায় সে রশ্মি ভিটামিন 'ডি' তৈরির অফুরন্ত প্রাকৃতিক উৎস। ত্বকের উপরিভাগে এবং নিচে প্রাক-ভিটামিন- ৭ ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল সূর্যরশ্মির সাহায্যে ভিটামিন 'ডি' তৈরি করে।

এ ছাড়াও খাদ্যের মধ্যে থেকে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়; যেমন- ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন তৈলাক্ত মাছ। কড, শার্ক এবং হ্যালিবাট মাছের তেল ভিটামিন 'ডি' এর অতি উৎকৃষ্ট উৎস। এসব তেল শিশুদের ১ ফোঁটা অথবা ২ ফোঁটা খুব সাবধানে খাওয়াতে হয়। এসব তেল শিশুদের গায়ে মেখে ও রোদে দিয়ে গোসল দিলে ভাল হয়।

তবে অতিরিক্ত ভিটামিন 'ডি' সেবনে কুফল অনেক; যেমন- খাওয়াতে অরুচি হয়, বমিবমি ভাব হয়, ডায়রিয়াও হতে পারে। এসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে রিকেট ও অষ্টিওম্যালেসিয়া এই দু ধরনের হাড়ের রোগ দেখা যায়। শিশুদের মধ্যে রিকেট ও বড়দের অষ্টিওম্যালেশিয়া দেখা যায়।

চত্র ঃ রিকেটে আক্রান্ত শিশু

ভিটামিন 'ডি' এর অভাবের কারণ

১. শিশুর জন্ম ওজন খুব কম হলে সেসব শিশুর শরীরে খুব কম পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' সঞ্চিত থাকে। ফলে ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে রিকেট রোগ দেখা দিতে পারে।
২. মায়ের শরীরে ভিটামিন 'ডি' এর অভাব হলে শিশুও অভাবগ্রস্থ হবে। এ সব মায়ের শিশুরা জন্মের সময় কম সঞ্চয় নিয়ে জন্মাবে এবং পরবর্তীতে অভাব দেখা দিবে।
৩. মায়ের যদি ভিটামিন 'ডি' এর অভাব থাকে এবং মা যদি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান তাহলে তার দুধেও ডি-ভিটামিনের ঘাটতি থাকবে এবং শিশুর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দিবে।
৪. যেসব শিশুরা সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত, শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় অল্প পরিসর স্থানে বাস করে বা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে দিনের বেশি সময় কাটাতে বাধ্য হয় তাদের মধ্যে রিকেট হবার আশঙ্কা বেশি থাকে।
৫. যেসব মা বাড়ির বাইরে কাজে যান এবং বাচ্চাদের সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন, তারাও সূর্যের আলো হতে বঞ্চিত হয় এবং পরিনামে রিকেট দেখা দিতে পারে।
৬. যেসব মহিলা সারা শরীর কাপড় দিয়ে আবৃত করে রাখেন এবং বাড়ির বাইরে একবারেই আসেন না। এসব পর্দানশীল মহিলারা যদি একেবারেই সূর্যের আলোর সংস্পর্শে না আসেন তাহলে তাদের অষ্টিওম্যলেশিয়া দেখা দিতে পারে।

৭. বৃদ্ধ বা অথর্ব ব্যক্তি যারা চলাফেরা করতে পারেন না এবং বাড়ির বাইরে আসতে পারেন না সারাদিনই ঘরের মধ্যে থাকতে হয় এবং অপর্যাপ্ত মানের খাদ্য গ্রহণ করেন তাদের মধ্যেও হাড়ের রোগ দেখা দিতে পারে।
৮. এছাড়া বিপাকজনিত ত্রুটির কারণেও রিকেট বা অষ্টিওম্যালেশিয়া দেখা দিতে পারে।

রিকেট (Rickets)

রিকেট সাধারণত বর্ধনরত শিশুদের মধ্যে এবং বয়সন্ধিক্ষণে বালিকাদের (কিশোরীদের) মধ্যে দেখা যায়।

দ্রুত দেহ বর্ধনের সময় শিশুর হাড়গুলো বাড়তে থাকে এবং সেখানে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস নামক খনিজ পদার্থগুলো লবণ আকারে থিতিয়ে সঞ্চিত হয়ে হাড়কে শক্ত ও মজবুত করে। ভিটামিন ডি অন্ত্র থেকে খাদ্যের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের শোষণে সহায়তা করে এবং রক্ত থেকে সরিয়ে এগুলোকে লবণ রূপে অস্থিতে সঞ্চিত হওয়ার পদ্ধতিতে সহায়তা করে। সুতরাং সুস্থ ও মজবুত অস্থি গঠনের জন্য ভিটামিন ডি এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর অভাব হলে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের স্বাভাবিক কার্যাবলী ব্যহত হয় ও রিকেট দেখা দেয়।

লক্ষণ

১. রিকেট হলে অস্থি খুব নরম ও হালকা হয়, ফলে গায়ের লম্বা হাড়ের উপর যখন দেহের ভার পড়ে তখন ঐ হাড় বেঁকে অনেকটা ধনুকের মত দেখায়।
২. বুকের পাঁজরগুলো গিট সম্পন্ন ও চাপা হওয়ায় বুকটা সরু হয় এবং পেটটাকে বড় দেখায়।
৩. হাতের কব্জি, পায়ের গোড়ালি ও হাঁটু বেশ মোটা হয়ে যায়।
৪. মাথার খুলি বড় হয়ে যায়।
৫. শিশুর বার বার শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ঘটে।
৬. পেশীর দুর্বলতা দেখা যায়। শিশু দেরিতে হাঁটতে শিখে।
৭. রিকেটে আক্রান্ত শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয়।
৮. শিশুকে অস্থির ও বিবর্ণ দেখায়।

কিশোরীদের ভিটামিন ডি'এর অভাবে পিঠে ও পায়ে ব্যথা হয়। কিশোরীদের মারাত্মক রিকেটের কারণে পেলভিসের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে এর ফলে পরবর্তীতে সন্তান জন্মদানকালে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

অষ্টিওম্যালেশিয়া (Osteomalacia)

অষ্টিওম্যালেশিয়ার অর্থ হচ্ছে হাড় নরম হয়ে যাওয়া। বয়স্ক মহিলাদের ভিটামিন ডি এর অভাবে এই রোগ হয়ে থাকে। ভিটামিন ডি'এর অভাবে ক্যালসিয়ামের কার্যাবলী বিঘ্নিত হয় বলে এই রোগ দেখা যায়। পুরুষের অপেক্ষা মহিলাদের এই রোগ বেশি হয়।

লক্ষণ

১. অস্থি খুব নরম, ঝাঁঝরা ও সহজে ভঙ্গুর প্রকৃতির হয়। হাত, পা, মেরুদন্ডের হাঁড়, কোমর ইত্যাদির হাড়ের গঠনে এরকম ত্রুটি ঘটায় এই সমস্ত জায়গায় ব্যথা হয়।
২. পেশির দুর্বলতা দেখা দেয়।
৩. পেলভিসের আকারের পরিবর্তন ঘটে যার ফলে সন্তান প্রসবকালে সমস্যা দেখা দেয়।
৪. হাড় সহজেই ভেঙ্গে যায়। বিশেষ করে বৃদ্ধ বা অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়।

প্রতিকার

১. শিশুকে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট করে সূর্যের আলোতে রাখতে হবে এভাবে কমপক্ষে ১ মাস রাখতে হবে প্রয়োজনে আরও বেশি দিন সূর্যালোকে শিশুকে রাখতে হবে। এজন্য সকালে বা বিকালের সূর্যালোকটা খুব তীব্র না হওয়ায় এ সময়কার রোদটা শিশুর জন্য উপযোগী হবে।
২. বয়স ও রোগের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে রিকেট ও অষ্টিওম্যালেশিয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিকারের জন্য দিনে ২৫-১২৫ মাইক্রোগ্রাম (১০০০-৫০০০ আই, ইউ) পর্যন্ত ভিটামিন ডি প্রদান করা দরকার।
৩. দুধ, ডিম, মাখন বা মার্জারিন সম্বলিত উত্তম খাদ্য পরিবেশন করতে হবে।

৪. শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ বা অন্যান্য সংক্রমণ থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

প্রতিরোধ

১. প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকা উচিত তাহলে রিকেট ও অষ্টিওম্যালেশিয়া প্রতিরোধ সম্ভব হবে।
২. বৃদ্ধ ও যারা অথর্ব ব্যক্তি তাদেরকে প্রতিদিন যাতে কিছুক্ষণের জন্যও সূর্যালোকে রাখা যায় সে দিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মনোযোগী হতে হবে।
৩. সূর্যের আলোর অবাধ সান্নিধ্যে পশু খামারজাত খাদ্যদ্রবাদি এবং মাছের যকৃতের তেলসমৃদ্ধ খাদ্য, খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে এ সব রোগের প্রতিরোধ সম্ভব।

সারাংশ

ভিটামিন 'ডি' এর প্রধান উৎস সূর্যরশ্মি। ত্বকের নিচে ও উপরিভাগে প্রাক ভিটামিন ৭ ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল সূর্যরশ্মির সাহায্যে ভিটামিন 'ডি' তৈরি করে। এ ছাড়াও খাদ্যের মধ্যে ডিমের কুসুম, মাছের তেল ইত্যাদি থেকে ভিটামিন পাওয়া যায়। ভিটামিন 'ডি' অতিরিক্ত সেবনের যথেষ্ট কুফলও আছে। তাই পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ আবশ্যক। পরিমিত পরিমাণে না পেলে অভাবজনিত রোগ হিসেবে শিশুদের মধ্যে রিকেট এবং বড়দের মধ্যে অষ্টিওম্যালেসিয়া নামক রোগ হয়। এসব রোগ প্রতিকারের জন্য রোগের মাত্রা অনুসারে ভিটামিন 'ডি' দিনে ২৫-১২৫ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত প্রদান করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রাক ভিটামিন ৭-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল সূর্যরশ্মির সাহায্যে কি তৈরি করে?
ক. ভিটামিন 'এ' খ. ভিটামিন 'ডি'
গ. প্রোটিন ঘ. ফ্যাটি এসিড

২। ভিটামিন 'ডি' এর অভাবজনিত রোগগুলো কি কি?
ক. বেরি বেরি ও হাঁটু ব্যাথা খ. মুখে ঘা ও ঠোঁটের কোনে গুটি
গ. রিকেট ও অষ্টিওম্যালেসিয়া ঘ. রাতকানা ও জেরোপথ্যলামিয়া

৩। শিশুরা রিকেটে আক্রান্ত হয় কি কারণে?
ক. অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে, সূর্যালোকবিহীন ঘরে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকলে
খ. বাইরে বাইরে সারাদিন ঘুরে বেড়ালে
গ. মাটি ও গাছপালাবিহীন এলাকায় বসবাস করলে
ঘ. দালান কোঠায় বড় বড় বাড়িতে বসবাস করলে

৪। রিকেট হলে কি হয়?
ক. ওজন অত্যধিক হ্রাস পায় খ. অস্থি খুব নরম ও হালকা হয়ে হাঁড় থেকে যায়
গ. হাঁড়ের ভিতরে রক্ত জমা হয় ঘ. অত্যাধিক ওজন বেড়ে যায়

৫। অষ্টিওম্যালেশিয়া কাদের হয়?
ক. শিশুদের খ. কিশোরদের
গ. বৃদ্ধলোকের ঘ. বড়দের

৬। অষ্টিওম্যালেশিয়া রোগে নিচের কোন অবস্থাটি হতে পারে?
ক. হাড় সহজেই ভেঙ্গে যায় খ. হাত মজবুত হয়
গ. হাড় খুব লম্বা হয়ে যায় ঘ. হাড়ের দৈর্ঘ্য কমে যায়

৭। প্রতিদিন শিশুকে রিকেট প্রতিকারের জন্য কমপক্ষে কত মিনিট সূর্যের আলোতে রাখা উচিৎ?
ক. ৩০ মিনিট করে সূর্যের আলোকে রাখতে হবে খ. ২০ মিনিট করে সূর্যের আলোতে রাখতে হবে
গ. ৪০ মিনিট করে সূর্যের আলোতে রাখতে হবে ঘ. ৫০ মিনিট করে সূর্যের আলোতে রাখতে হবে

৮। রিকেট প্রতিরোধ কল্পে শিশুকে কত মিনিট সূর্যালোকে রাখতে হবে?

ক. ২০ মিনিট কমপক্ষে খ. ১০ মিনিট কমপক্ষে

গ. ৩০ মিনিট কমপক্ষে ঘ. ৪০ মিনিট কমপক্ষে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভিটামিন 'ডি' কীভাবে সূর্যরশ্মি থেকে দেহে তৈরি হয় এবং ভিটামিন ডি -এর খাদ্য উৎসগুলো লিখুন।

২। রিকেটের লক্ষণ ও প্রতিকার লিখুন।

৩। অষ্টিওম্যালেশিয়ার লক্ষণ ও প্রতিরোধ লিখুন।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ৭

অনুশীলনী- ৭.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ ৬। গ

অনুশীলনী- ৭.২ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। গ ৫। ক

অনুশীলনী- ৭.৩ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ ৫। খ ৬। চার্ট থেকে পাওয়া যাবে ৭। গ ৮। ক

অনুশীলনী- ৭.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ক ৬। ক ৭। খ ৮। খ ৯। ঘ ১০। ঘ ১১। ক

অনুশীলনী- ৭.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। খ ৬। গ ৭। ভিটামিন- বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন- ডি

অনুশীলনী- ৭.৬ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক ৪। শাক সবজি ও টক জাতীয় ফলমূল

৫। ত্বকের, কালশিরা, কোন, হলে, সারতে ৬। কৃত্রিম এসকরবিক এসিড সেবন করতে হবে

অনুশীলনী- ৭.৭ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। গ ৫। গ ৬। গ ৭। ঘ

অনুশীলনী- ৭.৮ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। রাতকানা রোগ ৫। ক ৬। গ ৭। গ ৮। গ ৯। গ ১০। ক

অনুশীলনী- ৭.৯ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। খ ৫। খ ৬। ক ৭। ক ৮। খ

ইউনিট ৮

খনিজলবণের অভাবজনিত রোগ, দেহের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের কুফল ও বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টি সমস্যা

ভূমিকা

পূর্বের ইউনিটে অপুষ্টিজনিত ব্যাধি হিসেবে প্রোটিন-ক্যালরির অপুষ্টি এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিনসমূহের অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ইউনিটে আমরা খাবার লবণের অভাবজনিত কয়েকটি রোগ, দেহে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের কুফল এবং বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টিজনিত সার্বিক সমস্যাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করব।

খনিজলবণগুলোর সমতার উপর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ও আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ এমনকি হৃৎপিন্ডের সংকোচন প্রসারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খাবার লবণগুলোর সুনির্দিষ্ট উপস্থিতির পরিমাণের উপর দেহের অনেক কাজকর্ম নির্ভর করে, সুস্থ থাকার জন্য খনিজলবণের সমতা বজায় রাখা আবশ্যক। এদের অভাবে শৈশবে, কৈশোরে গর্ভাবস্থায় এবং বৃদ্ধ বয়সে অনেক অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়।

খাদ্য শুধু খেলেই হবে না। পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ না করলে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। খাদ্য গ্রহণের অভাবে যেমন শরীর অসুস্থ হয় তেমনি অতিরিক্ত মাত্রায় কোন খাদ্য গ্রহণও প্রায় সব বয়সে দেহে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এতে অত্যধিক ওজন বাড়ে, উচ্চ রক্তচাপ বাড়ে, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য শারীরিক জটিলতাও দেখা যায়। তাই সব বয়সেই খাদ্যের পরিমিত মাত্রা ঠিক রেখে সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশের শিশুরা নানা ধরনের অপুষ্টি সমস্যার শিকার হয়। বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টিজনিত ব্যাধি শুধু তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না পরবর্তীতে এগুলো জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ অসুস্থ শিশু কখনও সুস্থ চিন্তা ও মন মানসিকতার অধিকারী হতে পারে না। সুস্থ শিশুই সুস্থ নাগরিক হতে পারে। অসুস্থ শিশু সুস্থ নাগরিকের কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে না। তাই অসুস্থ শিশুর ভাগ যতই বেশি হবে ততই দেশ পঙ্গু হয়ে পড়বে। এ কথা অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না, তাই অভাবজনিত ও অপুষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বস্তরে সর্বপ্রকার সচেতনতা ও সহযোগীতা প্রদান একান্তভাবে কাম্য।

পুষ্টি বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশদ আলোচনার জন্য এই ইউনিটকে ছয়টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ- ৮.১ ঃ ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগ
পাঠ- ৮.২ ঃ লৌহের অভাবজনিত রোগ
পাঠ- ৮.৩ ঃ আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ
পাঠ- ৮.৪ ঃ ফসফরাসের অভাব জনিত রোগ
পাঠ- ৮.৫ ঃ দেহের অতিরিক্ত ওজনের কুফল (হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ এবং ডায়াবেটিক)
পাঠ- ৮.৬ ঃ বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টি সমস্যা ও দূরীকরণের উপায়সমূহ

পাঠ- ৮.১ ঃ ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ক্যালসিয়ামের উৎসগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- দৈনিক ক্যালসিয়ামের চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হবেন
- ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন

দেহের গঠনের বিভিন্ন উপাদনগুলোর মধ্যে শতকরা প্রায় ৪% ভাগ অজৈব বা খনিজপদার্থ বিদ্যমান। কোন খাদ্যবস্ত পোড়ালে যে সাদা ছাই অবশিষ্ট থাকে সেইগুলো খনিজপদার্থ। সবুজ শাকসবজি, ডাল শুকনো ফল, দুধ ও ডিম খনিজ পদার্থের উৎকৃষ্ট উৎস। খনিজপদার্থগুলো দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এগুলো খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। খনিজ পদার্থগুলোর কাজকর্ম চলে পরস্পরের ঘনিষ্ট সহযোগিতায়। উদাহরণ স্বরূপ ফসফরাস ক্যালসিয়ামের সাথে একযোগে হাড় ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে। দেহের ৯৯% ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড় গঠনে সহাযতা করে। বাকি ১% ক্যালসিয়াম রক্তরস, পেশী ও বিভিন্ন গ্রন্থিতে থাকে। শৈশবে, কৈশরে, গর্ভাবস্থায় এবং প্রসূতি অবস্থায় দেহ যখন গঠন ও বৃদ্ধির কাজ করে তখন প্রতিদিনের ও প্রতিবারের খাদ্যে পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ থাকা দরকার। বিশেষত খাদ্যে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের উপস্থিতি অপরিহার্য। এই উপাদানগুলোর অভাব হলে একদিকে যেমন দেহ গঠন ব্যহত হয় অন্যদিকে তেমনি নানারকম অসুস্থতা ঘটতে পারে।

খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণই দেহে সর্বাধিক। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহে প্রায় ১০০০-১২০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস হল দুধ ও দুধের তৈরি খাবার, সবুজ শাক, কাঁটাসহ ছোট মাছ, শুঁটকি মাছ, ডাল, সয়াবিন ইত্যাদি।

চিত্র ঃ ক্যালসিয়ামের উৎস

কারণ

বিভিন্ন কারণে দেহে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। যেমনঃ

১) খাদ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্যালসিয়ামবহুল খাদ্যের অনুপস্থিতির কারণে অভাব দেখা দিতে পারে।

২) শরীরে ভিটামিন 'ডি'এর অভাব হলে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কারণ ক্যালসিয়ামের শোষণ ও হাড়ে সঞ্চিত হওয়ার জন্য ভিটামিন 'ডি'এর প্রয়োজন হয়।

৩) খাদ্যের ফসফরাসের পরিমাণের উপর ক্যালসিয়ামের বিশোষণ নির্ভর করে। ক্যালসিয়ামের অনুপাত ফসফরাসের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি হলে শোষণে বিঘ্ন ঘটে ও অভাবজনিত লক্ষণ হিসেবে রিকেট দেখা দেয়।

৪) দেহের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে যেমন: শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মাতার খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্যের সরবরাহ না করলে ঘাটতি দেখা দেয়।

৫) খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত সাইটিক এ্যাসিড ও অক্সালিক এ্যাসিড এর কারণে ক্যালসিয়ামের শোষণ ব্যহত হয় এবং অভাবজনিত লক্ষ্যণাদি দেখা দিতে পারে।

ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

শিশুদের অভাবজনিত লক্ষণ

শৈশবকালে দেহের অস্থি ও দাঁত গঠনের জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন খুব বেশি। অস্থিতে ক্যালসিয়াম সঞ্চিত থাকে। রক্তরসের ক্যালসিয়াম কমে গেলে হাড়ের ক্যালসিয়াম অপসৃত হয়ে রক্তরসে আসে। বহুদিন ধরে আহারে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে এভাবে অস্থির ক্যালসিয়াম অপসৃত হয়ে (১) অস্থি দুর্বল ও সরু হয়ে যায়। (২) আকৃতি খর্ব হয়। (৩) অস্থি বিকৃতি দেখা যায়। (৪) দাঁতের গঠন মজবুত হয় না। (৫) রক্তরসে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কম থাকলে স্নায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। খিচুনী রোগ হয়, ফলে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়।

প্রাপ্ত বয়স্কদের অভাবজনিত লক্ষণ

বয়স্ক ও বৃদ্ধ লোকদের খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব থাকলে তাদের অস্থিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় এবং অস্টিওপোরোসিস (Osteoporosis) নামক রোগ দেখা দেয় এই রোগে রক্তরসে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ঠিক থাকে তবে অস্থির ক্যালসিয়াম অপসৃত হতে থাকে। ফলে ঃ

১) অস্থি পাতলা, ঝাঁঝরা ও ভঙ্গুর হয়ে যায়।

২) অতি অল্প আঘাতে অস্থি ফেটে যায়, দেহ গঠন দুর্বল হয়। মেরুদন্ডের হাঁড়ে ফাটল ধরে পেছনে ও পায়ে ব্যথার সঞ্চার হতে পারে। যারা শৈশব হতে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত দুধ ও দুধের তৈরি খাবার হতে বঞ্চিত তাদেরই বার্ধক্যে অস্টিওপোরোসিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রতিকার

১) সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। খাদ্যে প্রায় ১ থেকে ১.৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম দৈনিক সরবরাহ করতে হবে। এছাড়াও ৪০০-৮০০ আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন ডি সরবরাহ করতে হবে।

২) প্রয়োজনে হাঁড়ের নিরাময়মূলক ব্যায়ামের চর্চা করতে হবে।

প্রতিরোধ

১) শৈশব হতে প্রাপ্তবয়স পর্যন্ত প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় দুধ বা দুধের তৈরি খাদ্য রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে।

২) চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদান কালে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়ামের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ ক্যালসিয়ামের পাশাপাশি ভিটামিন ডি ও ফসফরাসের চাহিদাও মিটাতে হবে।

৪) প্রতিদিন কিছু সময় সূর্যালোক শরীরে লাগাতে হবে।

৫) ক্যালসিয়ামের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য গবাদি পশু পালনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে করে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৬) শাক-সবজির চাষাবাদ বাড়ানোর লক্ষ্যে গৃহস্থালীর বাগান প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭) ছোট মাছ ও শুঁটকি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহণ ও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এতে করে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছের গ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

সারাংশ

মানব দেহে খনিজ লবণের ভাগ শতকরা ৪% রয়েছে। দেহের ৯৯% ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁত গঠনে সহাযতা করে। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' এর সহযোগিতায় দেহের কাঠামো গঠনে সহায়তা করে। ক্যালসিয়ামের অভাবে, দেহের আকৃতি ছোট হয়। হাঁত ও দাঁত গঠন দুর্বল হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিকৃত গঠনও হয়। সুষম খাদ্যের মধ্যে দৈনিক ১-১.৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ৪০০-৮০০ আই.ইউ. (আর্ন্তজাতিক একক) ভিটামিন 'ডি' সরবরাহ করে এই রোগের প্রতিকার করতে হবে। শৈশব থেকে প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় দুধ, ডিম, মাছ, মাংস পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করে এই রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানবদেহে শতকরা কত ভাগ খনিজ লবণ রয়েছে?

ক. ১০% খ. ২০%
গ. ৩০% ঘ. ৪%

২। দেহের ক্যালসিয়ামের কত ভাগ দেহ গঠনের কাজে লাগে?

ক. ৯৯% খ. ৪০%
গ. ৬০% ঘ. ৯০%

৩। রক্তরসে, পেশীতে এবং বিভিন্ন গ্রন্থিতে ক্যালসিয়াম কি পরিমাণে থাকে?

ক. ১০% খ. ২০%
গ. ৯০% ঘ. ১%

৪। ক্যালসিয়ামের সাথে কাজ করে কোনটি?

ক. লৌহ ও ভিটামিন খ. ক্লোরিন ও ফ্লোরিন
গ. ফসফরাস ও ভিটামিন 'ডি' ঘ. ভিটামিন 'এ' ও বি$_{১}$

৫। বয়স্কদের ক্যালসিয়ামের অভাবে কি হয়?

ক. অতি অল্প আঘাতে অস্থি ফেটে যায় খ. অস্থি বাঁকা থাকে
গ. অস্থিতে রস জন্মে ঘ. অস্থিতে রক্তকমে যায়

৬। ক্যালসিয়ামের ভাল উৎস হল-

ক. পেঁপে খ. পাকাকলা
গ. পেয়ারা ঘ. ডিমের কুসুম ও দুধ

৭। ক্যালসিয়াম কাকে ছাড়া কাজ করতে পারে না?

ক. ভিটামিন 'ডি' ও ফসফরাস খ. ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'ডি'
গ. ভিটামিন বি$_{১}$ ও ভিটামিন বি$_{২}$ ঘ. ক্লোরিন ও জিঙ্ক

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক্যালসিয়ামের উৎসগুলো কি কি চিত্রসহ লিখুন।
২। ক্যালসিয়ামের অভাব হওয়ার কারণগুলো কি কি লিখুন।
৩। ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণগুলো কি কি এবং প্রতিকার লিখুন।

পাঠ- ৮.২ ঃ লৌহের অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- লৌহজাতীয় খনিজ লবণের উৎস সম্পর্কে অবহিত হবেন
- লৌহজাতীয় খনিজ লবণের অভাবে দেহে কি কি রোগ হয় বর্ণনা করতে পারবেন
- লৌহের অভাবজনিত লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- লৌহের অভাবজনিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবেন

লৌহ

মানব দেহে লোহার পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের তুলনায় অতি অল্প। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, জীবিত প্রাণী কোষে শ্বসনের জন্য লোহা অপরিহার্য। রক্তের ৯৮% লোহা হিমোগ্লোবিনে থাকে এই হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে দৈনিক প্রায় ১১ মিলিগ্রাম লৌহের প্রয়োজন।

একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে ৪-৫ গ্রাম লৌহ থাকে। খাদ্যের মধ্যে ডিম, মাংস, কলিজা, ডাল, বাদাম শুকনা ফল যেমন- কিসমিস, খেজুর ইত্যাদি লৌহের উৎকৃষ্ট উৎস। এছাড়াও আস্ত খাদ্যশস্য এবং সবুজ পাতাবহুল শাকে যথেষ্ট লৌহ আছে। খাদ্যে লৌহের অভাব হলে এনিমিয়া হয়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে দেহে অক্সিজেন পরিবহনে বিঘ্ন ঘটে এই অবস্থাকে এনিমিয়া বলে। সাধারণত মহিলাদের মধ্যে এনিমিয়া বেশি দেখা যায়। শিশুদের কৃমি হলেও এনিমিয়া দেখা দিতে পারে।

চিত্র ঃ লৌহের উৎস

লৌহের অভাবের কারণ

১) খাদ্যে দীর্ঘদিন ধরে লৌহের ঘাটতি থাকলে দেহেও লৌহের অভাব দেখা দিবে।
২) দেহের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে; যেমন- বর্ধন কালে অথবা গর্ভাবস্থায় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে লৌহসমৃদ্ধ খাদ্যের সরবরাহ করা না হয় তাহলে অভাব দেখা দিবে।
৩) মাসিকের সময় অথবা প্রসবকালে অথবা অন্য কোন কারণে অধিক রক্তক্ষরণ হলে এনিমিয়া হতে পারে।
৪) ঘন ঘন সন্তান ধারণের ফলে লৌহের অভাব দেখা দিতে পারে।
৫) পেটের কৃমির সংক্রমণ হলে এনিমিয়া হতে পারে।
৬) প্রতিনিয়ত রান্না ঘরের গরমে ঘাম হওয়ার দরুণ দেহে লৌহের অভাব ঘটতে পারে।
৭) পেটের গোলযোগে লৌহ শোষণে অসমর্থ হলে অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
৮) ৫ মাস বয়সের পর শিশুদের শুধুমাত্র দুধ খাওয়ালে শিশুর এনিমিয়া দেখা দেয়।

অর্থাৎ সাধারণভাবে বলা যায় যে লৌহের গৃহীত পরিমাণের চাইতে শরীরে খরচ বেশি হলে দেহে লৌহের অভাবজনিত এনিমিয়া দেখা দিবে।

লৌহের গৃহীত পরিমাণের চেয়ে খরচের পরিমাণ বেশি
↓
দেহে মোট লৌহের পরিমাণহ্রাস
↓
সঞ্চিত লৌহের ব্যবহার বৃদ্ধি
↓
লৌহের সঞ্চয়হ্রাস ও ধীরে ধীরে অভাব বৃদ্ধি
↓
পর্যাপ্ত পরিমাণে হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণ বিঘ্নিত হয়
↓
রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণহ্রাস
↓
এনিমিয়া

লক্ষণ

১) গায়ের রং ফ্যাকাশে দেখায়।
২) ঠোঁট, জিহ্বায় ঝিল্লি, হাতের তালু ও নখ ফ্যাকাশে দেখায়।
৩) চোখের পাতার ভিতরের দিক (Conjunctiva) ফ্যাকাশে দেখায়।
৪) শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়।
৫) মাথা ঘোরে ও অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত বোধ হয়।
৬) রক্তের ঘনত্ব কমে যাওয়ায় শোথ দেখা দিতে পারে ফলে হাত পা ফুলে যায়।
৭) রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে শ্বাস ও নাড়ীর গতি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়।
৮) রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণহ্রাস পায়। তীব্র রক্তসল্পতার কারণে হৃদপিন্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এনিমিয়াতে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা

রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা নিচের মাত্রার চাইতে কমে গেলে এনিমিয়া নির্দেশ করবে ঃ

বয়স	হিমোগ্লোবিনের মাত্রা (গ্রাম/১০০ এমএল)
৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সের শিশু	১১
৬ থেকে ১৪ বছরের শিশু	১২
পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ	১৩
পূর্ণবয়স্ক মহিলা	১২
মহিলা (গর্ভবর্তী)	১১

প্রতিকার

১) এনিমিয়া প্রতিকারের জন্য লৌহ জাতীয় খাদ্য; যেমন- সবুজ শাক-সবজি, কচু শাক, সীমের বীচি, ডাল, কলিজা এবং সব রকমের খাবার খেতে হবে।
২) প্রয়োজনে ফেরাস সালফেট ট্যবলেট নির্ধারিত মাত্রায় সেবন করতে হবে।
৩) মারাত্মক রক্তসল্পতায় রোগীকে রক্ত দিতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
৪) প্রয়োজন অনুসারে অর্থাৎ রক্তস্বল্পতা সেরে না উঠা পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং বিশ্রাম নিতে হবে।

প্ররিরোধ

১) সুষম খাদ্য গ্রহণ রক্তসল্পতা প্রতিরোধের সবচেয়ে ভাল উপায়। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় লৌহ জাতীয় পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্য; যেমন- সবুজ পাতাযুক্ত শাক, ডাল, গুড় থাকতে হবে। সম্ভব হলে কলিজা, ডিম, মাংস খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।

২) গর্ভবতী মায়েদের সুষম খাদ্যের পাশাপাশি আয়রণ বড়ি দিতে হবে এবং বিশেষ করে লৌহযুক্ত খাবার বেশি দিতে হবে। কারণ মায়ের শরীরে ল�ৌহের যে সঞ্চয় গড়ে উঠে তা শিশুর দেহে সঞ্চালিত হয়।
৩) শিশুদের জন্মের পর শালদুধসহ প্রথম ৫ মাস কেবলমাত্র বুকের দুধ অবশ্যই দিতে হবে।
৪) পাঁচ মাস পূর্ণ হবার পর লৌহসমৃদ্ধ বাড়তি খাবার দিতে হবে।
৫) কৃমি থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।
৬) বাড়ির আশে পাশে বাগান করে শাক-সবজি লাগানো শিখতে হবে।
৭) শাক-সব্জি ধুয়ে কেটে রান্না করতে হবে যাতে লৌহের অপচয় কম হয়।
৮) হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলে প্রাণিজ উৎস হতে চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে।
৯) গৃহকর্তাকে লৌহসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ দিতে হবে এবং সরকার ও এনজিও এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণা এবং সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে লৌহের চাহিদা মিটাতে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।
১০) ঘন ঘন সন্তান ধারণ রোধে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। দুটি সন্তানের মধ্যে কমপক্ষে ২ বৎসর বিরতি দিতে হবে।

সারাংশ

লৌহ খনিজ লবণের মধ্যে অন্যতম একটি খাদ্য উৎপাদন হিসেবে মানবদেহে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। লৌহের অভাবে দেহে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এর রূপ মারাত্মক হলে মানুষ মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। লৌহের অভাবজনিত রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য লৌহজাতীয় খাদ্য উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। লৌহের অভাবজনিত রোগ এনিমিয়া ছোট বাচ্চাদের এবং গর্ভবর্তী মায়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। তবে যে কোন বয়সেই এ রোগ লৌহ জাতীয় উপাদানের অভাবে দেখা যেতে পারে। সেজন্য সুষম খাদ্যের মধ্যে লৌহের উৎসসমৃদ্ধ খাদ্যের প্রাধান্য থাকা ভাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের তুলনায় মানবদেহে লোহার পরিমাণ কত?
ক. অনেক বেশি খ. তুলনামূলকভাবে কম
গ. অতি অল্প ঘ. তুলনামূলকভাবে বেশি

২। রক্তের ৯৮% লোহা কোথায় থাকে?
ক. শ্বেতকণিকায় খ. হিমোগ্লোবিনে
গ. অণুচক্রিকায় ঘ. রক্তনালীতে

৩। হিমোগ্লোবিন তৈরিতে কত মিলিগ্রাম দৈনিক লোহার পরিমাণ প্রয়োজন?
ক. ১২ মিলিগ্রাম খ. ১৪ মিলিগ্রাম
গ. ১১ মিলিগ্রাম ঘ. ১৫ মিলিগ্রাম

৪। দেহে এনিমিয়া কখন দেখা দিবে?
ক. দেহে গৃহীত লৌহের পরিমাণের চেয়ে খরচের পরিমাণ বেশি হলে
খ. দেহে লৌহের পরিমাণ বেশি হলে
গ. দেহে লৌহ জাতীয় খাদ্য অন্য উপাদানের চেয়ে বেশি হলে
ঘ. দেহে ক্ষয় বৃদ্ধি পেলে

৫। এনিমিয়ার লক্ষণ কি?
ক. দাঁত ভঙ্গুর হয় খ. হাড় পাতলা হয়
গ. ঠোঁট, জিহ্বা, হাতের তালু ও নখ ফ্যাকাশে দেখায় ঘ. ঠোঁটে ও মুখে ঘা হয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১. লৌহজাতীয় খনিজ উপাদানের উৎস কি কি লিখুন।
২. লৌহজাতীয় খনিজ লবণের অভাবে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় লিখুন।
৩. লৌহের অভাব হলে কি রোগ হয় এবং তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ- ৮.৩ ঃ আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- আয়োডিনের উৎস সম্পর্কে অবহিত হবেন
- আয়োডিনের অভাবজনিত রোগের কারণ ও রোগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- আয়োডিনের অভাবজনিত লক্ষণগুলো চিহ্নিত করে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন
- আয়োডিনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন

আয়োডিন

খাদ্যের উপাদানের মধ্যে আয়োডিন একটি মাইক্রোউপাদান। বর্তমান বিশ্বে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সিংহভাগ গবেষণা ও সমস্যা আয়োডিন অভাবজনিত রোগ নিয়েই করা হচ্ছে। থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাইরকিস হরমোন তৈরিতে দেহের ৬৫% আয়োডিন কাজ করে।

আয়োডিনের অভাবজনিত লক্ষণ

মানবদেহে আয়োডিনের পরিমাণ ১২-১৫ মিলিগ্রাম। দেহের ৬৫% আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাকে। একজন মানুষের আয়োডিনের চাহিদা খুবই সামান্য। দৈনিক প্রায় ১৫০ মাইক্রোগ্রাম। সারাজীবনে প্রায় ৩-৪ গ্রাম আয়োডিন প্রয়োজন যা ১ চা চামচ এরও কম। এই সামান্য পরিমান আয়োডিনই শরীরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। তাই দেহে আয়োডিনের ঘাটতি হলে নানা প্রকার সমস্যা দেখা যায়। সমস্যাগুলোকে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা (Iodine Deficiency Disorder) বা IDD বলা হয়।

থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য আয়োডিন প্রয়োজন। থাইরয়েড গ্লান্ডের মাধ্যমে এই থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়। থাইরয়েড হরমোন রক্তের মাধ্যমে চলাচল করে দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেহ বিশেষ করে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ও তা কার্যকর রাখা এবং শরীরের তাপ ও শক্তির প্রয়োজন মেটানোর জন্য আয়োডিন অপরিহার্য।

যখন মানবদেহে যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন থাকে না তখন সে প্রয়োজনীয় থাইরয়েড হরমোন তৈরি করতে পারে না এবং আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা দেখা দেয়। আয়োডিনের অভাবে যে সমস্যাগুলো দেখা যায় তা হল ঃ

১) গলগন্ড।

২) হাইপোথাইরডিজম (থাইরয়েড গ্রন্থির কর্মক্ষমতা হ্রাস)।

৩) ক্রেটিনিজম (হাবাগোবা ও বামনত্ব)।

৪) প্রজনন সমস্যা।

৫) শিশু মৃত্যু।

৬) বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব।

গলগন্ড

থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এর আকার স্বাভাবিক আকারের চাইতে বড় হয়ে গেলে তাকে গলগন্ড বলা হয়ে থাকে। আয়োডিনের অভাবে এই লক্ষণটিই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যখন আমাদের রক্তে কোন কারণে আয়োডিনের অভাব ঘটে তখন থাইরয়েড গ্রন্থি আয়োডিন সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা চালায় ফলে গ্রন্থিটা ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে এবং গলগন্ডে পরিণত হয়। প্রথম অবস্থায় এটা বেশ ছোট থাকে এবং চোখে পড়ে না। কিন্তু আয়োডিনের অভাব চলতে থাকলে ঘ্যাগ আরও বড় হয়ে গলায় ঝুলে পড়ে।

গলগন্ড রোগের সাথে সম্পর্কিত

হাইপোথাইরডিজম (থাইরয়েড গ্রন্থির কর্মক্ষমতা হ্রাস)

হাইপোথায়রডিজম এর অর্থ হল দেহে থাইরয়েড হরমনের অভাব। এর উপসর্গগুলো হলো আলসেমি, নিদ্রাহীনতা, শুকনো চামড়া, ঠান্ডা সহ্য করতে না পারা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য। খুব ছোট শিশুরা এর ফলে মানসিক প্রতিবন্ধিতে পরিণত হয়। এই ক্ষতি কোন ভাবেই পূরণ করা যায় না।

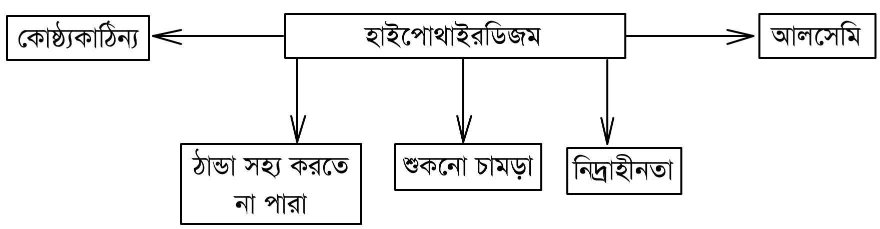

ক্রিটিনিজম (হাবাগোবা ও বামনত্ব)

হাবাগোবাদের মারাত্বক শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতা থাকে। আয়োডিনের অভাবে বামন হয়ে থাকে এবং এর সাথে বোবা কালা হতে পারে। যখন একজন গর্ভবতী মা আয়োডিনের অভাবে ভোগেন তখন তিনি হাবাগোবা সন্তানের জন্ম দেন। ভ্রূণের বৃদ্ধির বিশেষ পর্যায়ে গর্ভস্থ ভ্রূণ যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন না পেলে শিশুর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের এই অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে।

প্রজনন সমস্যা

যে সব মহিলাদের আয়োডিনের ঘাটতি আছে তাদের অন্যান্য মহিলাদের চাইতে গর্ভপাত বেশি হয় ও মৃত শিশুর জন্ম হয়।

শিশুমৃত্যু

আয়োডিনের অভাবে শিশু মৃত্যু হয়। আয়োডিনের অভাবগ্রস্থ শিশুরা অন্যান্য শিশুদের চাইতে বেশি অপুষ্টি সমস্যায় ভোগে এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। এই সব শিশুদের মধ্যে মৃত্যু হারও বেশি।

বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব

মায়ের আয়োডিনের অভাব হলে সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নিতে পারে। বিভিন্ন ধরনের দৈহিক ক্রুটি যেমন হাত পা স্বাভাবিকের চাইতে ছোট হওয়া। কোন অংগ বিকৃত হওয়া বা অসম্পূর্ণ থাকা ইত্যাদি ক্রুটি আয়োডিনের অভাবেই হয়ে থাকে।

কারণ

১) প্রকৃতিতে আয়োডিনের প্রধান উৎস সমুদ্রের পানি। সূর্যকিরণে আয়োডিন বাষ্পিভূত হয়ে বৃষ্টির পানির সাথে মিশে মাটিকে সমৃদ্ধ করে। মাটিতে ও পানিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আয়োডিন থাকলেই উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজাত খাবারে প্রয়োজনীয় পরিমাণে আয়েডিন পাওয়া যায়। পরিবেশগত কারণে মাটিতে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দিলে ঐ মাটিতে জন্মানো বিভিন্ন শাক-সবজি ফলমূল, এমনকি ঐ এলাকার মাছ-মাংসেও আয়োডিনের অভাব দেখা দেয়। মাটিতে আয়োডিনের অভাব দেখা দেয়। মাটিতে আয়োডিনের ঘাটতির প্রধান কারণ হচ্ছে- হিমপ্রবাহ, প্রবল বৃষ্টি, ঘন ঘন বন্যায় মাটির আয়োডিন হ্রাস পাওয়া। পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে বা ঘন ঘন বন্যা প্লাবিত এলাকা বা চরাঞ্চলে যে সব শস্য জন্মে বা খাদ্যসামগ্রীতে আয়োডিনের পরিমাণ থাকে খুবই কম বা অনেক সময় আদৌ থাকে না। ফলে এ সব অঞ্চলের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত আয়োডিনবিহীন খাবার খেয়ে আয়োডিনের অভাবজনিত বিভিন্ন সমস্যায় নিপতিত হয়।

২) কোন কোন খাদ্যের মধ্যে "গয়ট্রোজেন" থাকে; যেমন- বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলা প্রভৃতি খাদ্যের মধ্যে গয়ট্রোজেন থাকায় এই খাদ্যগুলো বেশি খেলে এগুলো অন্য খাবারের মধ্যে যেটুকু আয়োডিন থাকে তা শরীরে কাজে লাগাতে দেয় না। এ প্রকার খাদ্যকে তাই গয়েট্রোজিনিক খাদ্য বলা হয়। এ খাদ্যগুলো খুব বেশি খাওয়ার কারণে আয়োডিনের অভাব হতে পারে।

প্রতিকার

১) খাবারের মাধ্যমে সরাসরি আয়োডিন গ্রহণ ঃ

খাবারের সাথে পরিমিত মাত্রায় আয়োডিন গ্রহণ করে দেহে আয়োডিনের অভাব পূরণ করা যায়।

২) ইনজেকশন ও খাওয়ার ওষুধ

এক্ষেত্রে লিপিওডল (পপি বীজের তৈল) নামক আয়োডিনযুক্ত একটি তরল তৈলাক্ত ওষুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া মুখ দিয়ে খাওয়ার জন্য আয়োডিনযুক্ত ক্যাপসুলও পাওয়া যায়। এসব ইনজেকশন বা ক্যাপসুল একবার নিলে তার কার্যকরী মেয়াদকাল ৪/৫ বছর স্থায়ী হয়। সাধারণত যেসব এলাকায় গলগন্ড বা আয়োডিনের অভাবজনিত অন্যান্য সমস্যা খুবই প্রকট সেসব এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে এসব ইনজেকশন বা ক্যাপসুল ব্যবহার করার জন্য পুষ্টিবিদ ও ডাক্তারগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ ধরনের চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহে আয়োডিনের চাহিদা মিটিয়ে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা থেকে দেহকে সুস্থ রাখা। গলগন্ড যদি আদি অবস্থায় ধরা পড়ে তাহলে ইনজেকশন বা ক্যাপসুল দিয়ে তা সারানো সম্ভব। কিন্তু গলগন্ড যদি খুব বড় হয় তাহলে তা অস্ত্রোপচার ছাড়া সারানো সম্ভব নয়।

প্রতিরোধ

১) দেশে সার্বজনীন লবণ আয়োডিনযুক্তকরণ অর্থাৎ আয়োডাইজড লবণ উৎপাদন ও গ্রহণ নিশ্চিত করলে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে।

২) আয়োডিনযুক্ত লবণের মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ আর্দ্রতা, সূর্যের আলোর প্রতি আয়োডিন সহজে ক্রিয়াশীল বলে লবণে আয়োডিনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। অর্থাৎ আয়োডিনযুক্ত লবণ সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ ও প্যাকেট করতে হবে এবং উৎপাদক থেকে গ্রহণকারী পর্যন্ত সকল স্তরে নিয়মিতভাবে আয়োডিনের পরিমাণ পরীক্ষা করতে হবে। লবণে আয়োডিনের পরিমাণ পরীক্ষার জন্য খুব সাধারণ আয়োডিন পরীক্ষা কিট ব্যবহার করা যায় অথবা বাড়িতে সহজ পদ্ধতিতেও পরীক্ষা করা যায়। ভাতের সাথে লবণ মিশিয়ে তাতে সামান্য কয়েক ফোঁটা লেবুর রস বা সিরকা দিলে যদি ভাতের রঙ বেগুনি হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে লবণে আয়োডিন আছে।

৩) আয়োডিনযুক্ত লবণের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আয়োডিনযুক্ত লবণ রান্না ও খাবারে ব্যবহার করতে হবে। এই লবণ কাঁচের, মাটির বা প্লাস্টিকের পাত্রে ঢেকে রাখতে হবে। রোদে বা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় রাখলে লবণে আয়োডিনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। লবণ ধুয়ে নিলেও আয়োডিনের পরিমাণ কমে যায়।

৪) সামুদ্রিক মাছে প্রচুর আয়োডিন থাকে। এই ধরনের মাছ বা মাছের তৈরি খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলে আয়োডিনের চাহিদা পূরণ করা যাবে।

সারাংশ

আয়োডিন খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এই প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আয়োডিনের প্রয়োজন মাত্র ১৫০

মাইক্রোগ্রাম, অথচ এটুকুরই অভাবে জীবজগতে মারাত্মক পরিণতি দেখা যায়। আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাইরক্সিন তৈরি করে। আয়োডিনের অভাবে হরমোন তৈরি হতে পারে না ফলে, গলগন্ড, হাইপোথাইরডিজস, ক্রিটিনিজম (হাবাগোবা বা বামনত্ব) প্রজনন সমস্যা, শিশু মৃত্যু, বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব প্রভৃতি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। আয়োডিনের উৎস হচ্ছে সমুদ্র, সমুদ্রের পানির আয়োডিন মাটি ও গাছের শিকড়ে শিকড়ে ছড়িয়ে জীব জগতের যোগান দেয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এর অভাব দেখা দেয়। সেজন্য আয়োডিনের মারাত্মক হুমকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাই আয়োডিনযুক্ত লবণের সার্বজনীন ব্যবহার। এর ব্যবহার ও গ্রহণ সর্বাত্মক উপায়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আয়োডিন কি হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে?

ক. বর্ধন হরমোন | খ. অক্সিটোসিল হরমোন
গ. থাইরক্সিন হরমোন | ঘ. সেক্স হরমোন

২। দৈনিক আয়োডিন গ্রহণের পরিমাণ কত?

ক. ১০০ মাইক্রোগ্রাম | খ. ২০০ মাইক্রোগ্রাম
গ. ১৫০ মাইক্রোগ্রাম | ঘ. ১২০ মাইক্রোগ্রাম

৩। আয়োডিনজনিত সমস্যাগুলোকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে কি বলে?

ক. IDD | খ. IDC
গ. IDB | ঘ. IDDH

নিম্নের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুন

আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যাগুলো হচ্ছে-

১. ... ... গলগন্ড
২. ... ...
৩. ক্রিটিনিজম
৪. ... ...
৫. শিশু মৃত্যু
৬. ... ...

৪। গলগন্ড রোগে থাইরয়েড গ্লান্ড আকার কেমন হয়?

ক. ছোট হয়ে যায় | খ. বড় হয়ে যায়
গ. বিলীন হয়ে যায় | ঘ. লালা হয়ে যায়

৫। আয়োডিনের প্রাকৃতিক প্রধান উৎস কি?

ক. গাছ | খ. প্রাণী
গ. সমুদ্র | ঘ. পুকুর

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আয়োডিনের উৎস সম্পর্কে লিখুন।
২। আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যাগুলো কি কি লিখুন।
৩। আয়োডিনের অভাবজনিত রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ- ৮.৪ ঃ ফসফরাসের অভাবজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ফসফরাসের উৎস সম্পর্কে জানতে পারবেন
- ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ অনুসরণে এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারবেন

ফসফরাস

ফসফরাস একটি খনিজ লবণ, দেহ গঠনে খনিজ লবণগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরেই ফসফরাসের স্থান। দেহে মোট ফসফরাসের ৮০% অস্থি ও দন্তে জমা হয়। বাকি ২০% এর অধিকাংশ তাজা পেশী ও দেহতরলে অবস্থান করে প্রত্যেক প্রকার কোষের কাজে নিয়োজিত থাকে।

মানবদেহে ফসফরাসের পরিমাণ প্রায় ৬০০-৭০০ গ্রাম। মস্তিষ্কে ও স্নায়ুকোষে যথেষ্ট পরিমাণ ফসফোলিপিড বর্তমান। রক্তে ফসফরাসের মাত্রা দেহে পর্যাপ্ত ভিটামিন ‘ডি’ এবং ক্যালসিয়ামের পরিমানের উপর নির্ভর করে।

উৎস

যকৃত, ডিম, পনির, মাছ ও মাংস ভাল উৎস। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে ডাল, সুজি, ঢেকিছাটা সিদ্ধ চাল, শুঁটকি, ভূট্টা, সজনে, ডাটা, ঢেঁড়স, গাজর ও কলা ফসফরাসের উৎস হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

ফসফরাসের অভাবজনিত সমস্যা

দেহে ফসফরাসের অভাব হলে নিম্নলিখিত লক্ষণাদি দেখা যায়-

১) দাঁত ও হাড়ের পুষ্টি সাধনের জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফসফরাসের অভাব হলে দাঁত ও হাড়ের গঠন দুর্বল হয়, নানা প্রকার হাড়ের রোগ ও দাঁতের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দেয়। দাঁত ও হাড়ের পুষ্টি ও গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি -এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২) রক্ত ও অন্যান্য কোষে ক্ষারধর্মী ফসফেট এবং অম্লধর্মী ফসফেট দেহে ক্ষার ও অম্লের সমতা বজায় রাখে। ফসফরাসের অভাবে এই অম্ল ও ক্ষারের সমতা নষ্ট হয়।

৩) দেহে শক্তি সঞ্চয় ও ব্যয়ের জন্য ফসফরাস প্রয়োজন। ফসফরাসের অভাবে শক্তির অভাব দেখা দিতে পারে ফলে দেহের পেশীর দুর্বলতা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও কর্মে অক্ষমতা দেখা দেয়।

৪) দেহের বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

৫) রক্তে ফসফরাস যৌগের পরিমাণ কমলে অস্থি থেকে অজৈব লবণ রক্তে আসে। এতে রক্তে ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পায়। বিপরীতে রক্তে ফসফরাস বাড়লে ক্যালসিয়াম কমে।

কারণ

১) খাদ্যে ক্যালসিয়ামের ও ফরফরাসের উপস্থিতি একটি অপরটির শোষণকে প্রভাবিত করে। খাদ্যে এ দু উপাদানের মধ্যে যে কোন একটির পরিমাণ অপরটির দ্বিগুণের বেশি হলে উভয়েরই শোষণ হ্রাস পায়। ফলে অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

২) খাদ্যে ফসফরাসের অভাব হলে বা দীর্ঘদিন ধরে ফসফরাসের অভাবজনিত খাদ্য গ্রহণ করলে ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণাদি দেখা যাবে।

প্রতিকার

১) ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণাদি প্রতিকারের জন্য খাদ্যে ফসফরাসের পাশাপাশি ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি ইত্যাদির পর্যাপ্ত গ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে।

২) মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, বাদাম, পালং শাক, গাজর, ফুলকপি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস পাওয়া যায়। প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে এ খাদ্যগুলো গ্রহণ করলে ফসফরাসের অভাব পূরণ করা সম্ভব হবে।

প্রতিরোধ

১) সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে প্রত্যেকটি পুষ্টি উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে সে দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রকার উৎস থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত যাতে সঠিক থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২) দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প; যেমন- ফল সবজির বাগান প্রকল্প, হাঁস-মুরগির চাষ প্রকল্প ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। সর্বপরি পুষ্টির অভাবজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক পুষ্টি শিক্ষা ও প্রচারণা করতে হবে।

সারাংশ

দেহ গঠনে ফসফরাস ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি' এর সাথে একযোগে কাজ করে। দেহে ৮০% ফসফরাস হাঁড় ও দন্ত গঠনে এবং বাকি ২০% অন্যান্য কাজে লাগে। যকৃত, ডিম, পনির মাছ মাংস এবং উদ্ভিজ্জ উপাদন হিসেবে ডাল সুজি ভূট্টা, সজনের পাতা ও ডাটা ফসফরাসের উৎস। ফসফরাসের অভাবে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি' হাড় ও দাঁত গঠনে কাজ করতে পারে না ফলে দেহের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। ফসফরাসের অভাবে রক্তে অম্ল ও ক্ষারের সমতা নষ্ট হয়। সুতরাং ফসফরাস জাতীয় খাদ্য উপাদান আমাদের সুষম খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য পাওয়া একান্ত আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ফসফরাস কি?
ক. জ্বলীয় উপাদান খ. খনিজ লবণ
গ. পানীয় ঘ. তরল পদার্থ

২। মানব দেহে ফসফরাসের স্থান কোথায়?
ক. ক্যালসিয়ামের পরে খ. আয়োডিনের পরে
গ. প্রোটিনের পরে ঘ. ভাইটামিনের পরে

৩। হাড় ও দাঁত গঠনে ফসফরাসের শতকরা প্রয়োজন কত?
ক. ২০% খ. ৮০%
গ. ৬০% ঘ. ৯০%

৪। ফসফরাস দেহ তরলে থাকে শতকরা কত ভাগ?
ক. ৮০% খ. ২০%
গ. ৬০% ঘ. ৬৫%

৫। মানবদেহে ফসফরাসের প্রয়োজন কতটুকু?
ক. ৪০০-৫০০ গ্রাম খ. ৫০০-৬০০ গ্রাম
গ. ৬০০-৭০০ গ্রাম ঘ. ৭০০-৮০০ গ্রাম

৬। ফসফরাসের অভাবে দেহে কি হয়?
ক. পানির সমতা নষ্ট হয় খ. অম্ল ও ক্ষারের সমতা নষ্ট হয়
গ. সোডিয়ামের সমতা নষ্ট হয় ঘ. পটাশিয়ামের সমতা নষ্ট হয়

৭। রক্তে ফসফরাস বাড়লে কি হয়?
ক. সোডিয়াম কমে খ. ক্যালসিয়াম কমে
গ. পানি কমে ঘ. অম্ল কমে

৮। ফসফরাসের অভাবজনিত প্রতিকারের জন্য ফসফরাস গ্রহণের সাথে কি করতে হবে?
ক. ভিটামিন 'ডি' ও ক্যালসিয়াম গ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে
খ. ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' গ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে
গ. পটাশিয়াম ও সোডিয়াম গ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে
ঘ. আয়োডিন ও লৌহ গ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণগুলো লিখুন।
২. ফসফরাসের অভাবজনিত রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ- ৮.৫ ঃ দেহের অতিরিক্ত ওজনের কুফল (হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ এবং ডায়াবেটিক)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- দেহে অতিরিক্ত ওজন নির্ণয় করতে পারবেন
- দেহে অতিরিক্ত ওজনের কুফলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতার কারণে কি কি রোগ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- অতিরিক্ত ওজন কমানোর নীতি ও নিয়মবালী অনুসরণ করে স্থূলতা দূরীকরণে সক্ষম হবেন
- অতিরিক্ত ওজনের কুফলগুলোর বিপরীতে প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন

আমাদের দেশে ধনী পরিবারে অর্থ ব্যয়ে যেমন অমিতব্যয়ী তেমনি খাদ্য ক্রয়ে ও ভোজনেও মাত্রা হারিয়ে ফেলে। তবে আমাদের দেশে ধনী পরিবারের সংখ্যা কম বলে অতিরিক্ত ভোজনের ফলে অতিরিক্ত ওজনের সমস্যাও কম। এছাড়াও হরমোনজনিত কারণে ও খাদ্য গ্রহণ ব্যতীত ওজনাধিক্য দেখা দেয়। অবশ্য সে সংখ্যাও নগন্য তবে আমাদের দেশে শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে অনেকেই অকারণে ওজন বৃদ্ধি করেন।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে অন্যতম পুষ্টিগত সমস্যা হল দেহের অতিরিক্ত ওজন বা ওজনাধিক্য। দেহের ওজন বেশি থাকা অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। কারণ দেহের ওজন বেশি হলে স্বাস্থ্য ভাল থাকার পরিবর্তে নানা রকম রোগের প্রকাশ ঘটতে পারে। মোটালোক অল্পতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং প্রায়ই তাদের শীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা যেমন পিঠে ও পায়ে ব্যথা, বাত ও অন্যান্য অসুবিধার কথা বলতে শুনা যায়। সুতরাং অত্যধিক মোটা হওয়া মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী শরীরের ওজন ঠিক রাখতে পারলেই দেহ সুস্থ ও সুন্দর হবে।

দেহে অতিরিক্ত ওজন বা ওজনাধিক্য

কোন ব্যক্তির উচ্চতা অনুযায়ী ও লিঙ্গ অনুযায়ী দেহের ওজন আদর্শ ওজনের চাইতে ১০ ভাগ বেশি হলে সামান্য মোটা বলা যেতে পারে কিন্তু ওজন যদি শতকরা ২০ ভাগের বেশি হয় তবে তাকে রীতিমত মোটা বা স্থুল বলা হবে।

স্থুলতা বা ওজনাধিক্য নির্ণয়

ওজনাধিক্য নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি হল ব্রোকার ইনডেক্স (Broca’s index) অনুযায়ী ওজনাধিক্য নির্ণয়। ব্রোকার ইনডেক্স (Broca’s index) ঃ এই পদ্ধতিতে উচ্চতা সেন্টিমিটারে পরিমাপ করতে হয় এবং উচ্চতা হতে ১০০ বাদ দিলে ব্যক্তির আদর্শ ওজন পাওয়া যায়। অতএব আদর্শ ওজন (কেজি) = উচ্চতা (সেঃমিঃ)- ১০০। কোন ব্যক্তির ওজন তার আদর্শ ওজনের চাইতে ১০% বেশি হলে ওজন বেশি বলে বিবেচিত হবে এবং ২০% বেশি হলে তাকে ওজনাধিক্য বা স্থুল (Obesity) বলা হবে।

উদাহরণ ঃ কোন ব্যক্তির উচ্চতা ১৫০ সেঃমিঃ এবং ওজন ৬০ কেজি।
ঐ ব্যক্তির আদর্শ ওজন = (১৫০-১০০)=৫০ কেজি।

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির বর্তমান ওজন আদর্শ ওজনের চাইতে (৬০-৫০)=১০ কেজি বেশি যা আদর্শ ওজনের চাইতে ২০% বেশি আছে অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি স্থুলকায় বা ওজনাধিক্য। এই পদ্ধতিতে খুব সহজেই যে কোন ব্যক্তির স্থুলতা নির্ণয় করা যায়।

স্থুলতার কারণ

১) প্রয়োজনের চাইতে অধিক ক্যালরি গ্রহণের কারণেই প্রধানত স্থুলতা দেখা দেয়। প্রতিদিন যদি মাত্র ১০০ ক্যালরি বেশি খাওয়া হয় তাহলে একমাসে ৩০০০ ক্যালরি বাড়তি গ্রহণ করা হবে ফলে এই অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে এক মাসে প্রায় ০.৪ কেজি অথবা বছরে ৪.৮ কেজি ওজন বৃদ্ধি পাবে। এই ১০০ ক্যালরি খুব সামান্য খাদ্য থেকে আসে যেমনঃ ১ কাপ ভাত বা ১টা মাঝারি আকারের পাকা কলা বা ২ চা চামচ মাখন বা তেল ইত্যাদি থেকে প্রায় ১০০ ক্যালরি পাওয়া যাবে।

২) পারিবারিক খাদ্যাভাসও ওজন বৃদ্ধির কারণ। যে সমস্ত পরিবারে রান্নায় বেশি তেল/ঘি, চর্বিজাতীয় খাবার ও ভাজা খাওয়ার প্রচলন রয়েছে তাদের মধ্যে স্থুলতা বেশি দেখা যায়।

৩) শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে দিলে এবং খেলাধুলা ছেড়ে দিলে খাদ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। কিন্তু পরিশ্রম ও খেলাধুলা হ্রাসের পাশাপাশি খাদ্য গ্রহণ না কমালে ওজন বৃদ্ধি পাবে।
৪) বংশগত কারণেও মোটা হবার প্রবণতা দেখা যায়। বংশগত বৈশিষ্ট্যের কারণে বাবা মা মোটা হলে তাদের ছেলেমেয়েদেরও প্রায় ক্ষেত্রেই মোটা হতে দেখা যায়।
৫) যারা প্রায়ই সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে যোগদান করে থাকে এবং অধিক ক্যালরিবহুল খাদ্য সবসময় গ্রহণ করেন এবং হাঁটার পরিবর্তে গাড়িতে চড়ায় অভ্যস্থ ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজ একেবারেই করেন না তাদের মধ্যে স্থূলতা দেখা যায়।
৬) বিভিন্ন হরমোনের গোলযোগের কারণেও দেহের ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে; যেমন- থাইরয়েড হরমনের অভাব হলে এবং পিটুইটরির কাজে গোলযোগ দেখা দিলেও দেহে চর্বি জমার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে।
৭) অনেকে যৌবনের খাদ্যাভাস বৃদ্ধ বয়সেও পরিত্যাগ করতে পারেন না। বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত খাদ্যের চাহিদা কমে যায় সুতরাং এই বয়সে যৌবনের খাদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ না করলে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের কারণে দেহ স্থূলকায় হয়ে পড়বে।
৮) যাদের মধ্যে টেলিভিশন ও সিনেমা দেখার ঝোঁক বেশি এবং সেই সাথে অধিক ক্যালরিবহুল খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস আছে তাদের ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

স্থূলতার কুফল

স্থূলতার কারণে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারেঃ

১) হৃদরোগ ঃ ওজন যাদের বেশি থাকে তাদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি থাকে। স্থূলকায় ব্যক্তির রক্তে চর্বির (কোলেস্টেরলের) মাত্রা বেশি থাকার প্রবণতা বেশি। রক্তে চর্বি বেশি থাকলে ধমনীর ভিতরের দেওয়ালে চর্বিযুক্ত বিভিন্ন পদার্থের প্রলেপ পড়ে নালীর দেওয়াল শক্ত ও রক্ত চলাচলের পথ সরু হয়ে যায়। একে এথেরোসক্লেরোসিস বলা হয়। এই অবস্থায় যে কোন সময় রক্ত জমাট বেঁধে ধমনীর পথ বন্ধ হয়ে করোনারী থ্রম্বেসিস বা হার্ট এটাক হতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে স্থূলকায় ব্যক্তিদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিও বেশি।

দেহের ওজন বৃদ্ধি
↓
রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি হয়ে দেহে সম্পৃক্ত চর্বির সঞ্চয় বৃদ্ধি
↓
এথেরোসক্লেরোসিস
↓
করোনারী হৃদরোগ

২) উচ্চরক্তচাপ ঃ স্থূলকায় ব্যক্তির মধ্য উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

৩) ডায়াবেটিস ঃ শরীরের ওজন বেশি বৃদ্ধি পেলে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। শরীরের ওজন বেশি বৃদ্ধি পেলে অনেক সময় ইনসুলিনের উৎপাদন কমে যায় এবং কোষের মধ্যে ইনসুলিন গ্রাহক কোষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় ডায়াবেটিস দেখা দিতে পারে। ওজন বেশি বৃদ্ধি পেলে কোষের মধ্যে ইনসুলিন গ্রাহক কোষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় রক্তের শর্করা বা গ্লুকোজ কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ডায়াবেটিস দেখা দেয়। এই সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে দেহের ওজন কমিয়ে স্বাভাবিকের মধ্যে নিয়ে আসলে এবং শারিরীক পরিশ্রম বৃদ্ধি করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রতিকার

১) স্থূলতা প্রতিকারের জন্য সর্বপ্রথম দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনের চাইতে অধিক ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ ও ক্যালরি খরচের ক্ষমতার অভাবই স্থূলতার কারণ এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে।
২) দেহের ওজন কমানোর জন্য দৈনিক খাদ্য তালিকার পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় ক্যালরির চাইতে প্রত্যেক দিন কিছু কম ক্যালরির খাদ্য গ্রহণ করা। অর্থাৎ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণের নীতি

ক) **ক্যালরি ঃ** ওজন কমানোর জন্য প্রথমেই দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যালরির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। ওজন কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি হতে ৫০০-১০০০ ক্যালরি বাদ দিতে হবে। যদি সপ্তাহে ২ পাউন্ড ওজন হ্রাসের প্রয়োজন হয় তাহলে প্রতিদিন ১০০০ ক্যালরি কম গ্রহণ করতে হবে এবং সপ্তাহে ১ পাউন্ড ওজন হ্রাসের জন্য প্রতিদিন ৫০০ ক্যালরি কম গ্রহণ করতে হবে। সপ্তাহে ১-২ পাউন্ড ওজন কমানোই নিরাপদ। এর থেকে অধিক হারে ওজন কমানোর চেষ্টা করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। ওজন কমানোর জন্য সাধারণত ১০০০-১৫০০ ক্যালরির মধ্যে খাদ্যের শক্তিমান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

খ) **শর্করা ঃ** চিনি, গুড়, মিষ্টি, গ্লুকোজ ইত্যাদি বাদ দিতে হবে। শাক-সবজি, ফল অর্থাৎ আঁশযুক্ত খাদ্য থেকে শর্করার চাহিদা পুরণ করতে হবে। ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি পরিমিত পরিমানে খেতে হবে।

গ) প্রোটিনজাতীয় খাদ্য পরিমাণ কমানো উচিত নয়, প্রোটিন ঠিক রাখতে হবে। তবে চর্বিহীন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে।

ঘ) **ভিটামিন ও খনিজ লবণ ঃ** খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবণের পরিমাণ কোন প্রকারেই কমানো যাবে না। এর অভাব হলে শরীর রুগ্ন ও অসুস্থ হবে। খাদ্যে ক্যালরি হ্রাস করার ফলে যদি ভিটামিন ও খনিজ লবণের অভাব ঘটে তাহলে পরিপূরক গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাক-সবজি ও ফলমূলের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যালরি কমানোর জন্য অনেক সময় ক্ষুধাবোধ হলে ফলমূল, তরিতরকারির সাহায্যেই তা পূরণ করতে হবে।

৩) খাদ্য নির্বাচন করার সময় কিছু কিছু খাবার বাদ দিতে হবে। কোন কোন খাবার বেশি খাওয়া যাবে আবার কোন কোন খাবার পরিমাণ মত খেতে তবে। নিচের ছকে এই খাদ্যের তালিকা দেওয়া হল ঃ

বাদ দিতে হবে	হিসাব করে খেতে হবে	প্রচুর পরিমানে খাওয়া যাবে
চিনি, গুড়, মধু, মিষ্টি, ক্যান্ডি, জ্যাম, জেলি, চকলেট, গ্লুকোজ।	রুটি, ভাত, মূলা ও কন্দ জাতীয় সবজি, আলু, গাজর, বীট, মিষ্টি ফল।	সবুজ শাক-সবজি, টকফল, ক্লিয়ার সুপ, স্বাদের জন্য ব্যবহৃত মশলা।
বেকারীর তৈরি খাবার যেমন ঃ কেক, মিষ্টি ও ক্রিমযুক্ত বিস্কুট, পেস্ট্রি ইত্যাদি।	ডাল	
ঘন দুধ, মাওয়া, ক্ষিরসা, আইসক্রিম।	ক্রিম ছাড়া দুধ।	
সবকরম ভাজা খাবার	মাছ, চর্বিহীন মাংস, ডিম।	
চর্বিযুক্ত মাংস, কলিজা, মগজ।		
অ্যালকোহল, সবরকমের কৃত্রিম নরম পানীয়।		
বনস্পতি, ঘি, ক্রিম, সালাদ ড্রেসিং।	সব্জির তেল।	
বাদাম ও তৈলবীজ।		

৪) ওজন কমানোর জন্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মৃদু থেকে মধ্যম প্রকৃতির ব্যায়াম অতিরিক্ত ক্যালরি খরচে সাহায্য করে থাকে। নিচের ছকে বিভিন্ন ব্যায়ামের ফলে কি পরিমাণ ক্যালরি খরচ হয় তা দেওয়া হল।

ওজন কমানোর জন্য পুষ্টিবিদ বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত ক্যালরির খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিশ্রম বা ব্যায়াম করতে হবে। যতদিন ওজন কমে স্বাভাবিক ওজনে ফিরে না আসে ততদিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। ওজন কমে স্বাভাবিক ওজনে ফিরে আসার পর পুনরায় দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যালরি নির্ধারণ করতে হবে এবং ওজন যাতে বেড়ে না যায় সেই ব্যাপারে স্বচেষ্ট হতে হবে।

প্রতিরোধ

ওজন বৃদ্ধির পর ওজন হ্রাসের চেষ্টার চাইতে স্থুলতা প্রতিরোধ করাই বেশি বাঞ্ছনীয়। স্থুলতা প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলা উচিতঃ

১. প্রয়োজনের চাইতে বেশি ক্যালরিবহুল খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। অধিক ক্যালরির খাবার কম খেয়ে আঁশবহুল খাদ্য গ্রহণ করলে খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা হ্রাস পাবে।

২. ভাজা-ভূনা ও চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের সময় মনে রাখতে হবে যে এই খাদ্যগুলো ঘনীভূত শক্তির উৎস। তাই পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। এই খাদ্যগুলো বেশি খাওয়ার অভ্যাস করলে সহজেই ওজন বৃদ্ধি পাবে।
৩. প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম বা পরিশ্রমের কাজ করা প্রয়োজন তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।
৪. বিভিন্ন ধরনের সফট্ ড্রিংসক্, চকলেট, আইসক্রিম, ক্যান্ডি ইত্যাদি ক্যালরিবহুল খাদ্যগুলো যখন তখন অনেক বেশি খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। কারণ এই ধরনের খাদ্যগুলো সহজেই শরীরের ওজনকে বৃদ্ধি করে।
৫. প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনের চাইতে বেশি খাদ্য খেলে স্বাস্থ্য ভাল হয় না বরং ওজন বৃদ্ধি পেয়ে নানা রোগের বা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে একথা মনে রাখতে হবে।
৬. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়রা বলে থাকেন "একদিন একটু খেলে এমন কি আর হবে" এই ধরনের কথায় ভুলে গেলে চলবে না যে বেশি খাওয়ার অভ্যাসটা এভাবেই দিনে দিনে হয়ে থাকে এবং ওজনও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

সারাংশ

অধিক মাত্রায় খাদ্য গ্রহণ করলেই ওজন বাড়বে। তাই কোনক্রমেই যাতে শরীরের ওজন না বাড়ে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ওজন বাড়লেই শরীরে নানা রকম জটিলতা এবং রোগের সৃষ্টি হবে। অত্যাধিক ওজনের কুফল হিসেবে, উচ্চ রক্ত চাপ, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস এবং আরো নানা প্রকার স্বাস্থ্যগত জটিলতা দেখা দিতে পারে।

তাই পরিমিত পরিমাণে সুষম খাদ্য গ্রহণ করে দেহকে অযথা ওজন বৃদ্ধি থেকে রক্ষা করে সুস্থ থাকতে হবে। অত্যধিক ওজন বেড়ে অসুবিধা দেখা দিলে খাদ্যনীতি অনুসারে খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে ওজন কমিয়ে নিয়ে জটিলতা দূর করতে হবে। ওজন যাতে না বাড়ে তার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে পরিমিত আহার ও ব্যায়াম অভ্যাস করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দেহে ওজন বাড়ে কি কারণে?
ক. অধিক ভোজনে খ. অধিক ভ্রমণে
গ. অধিক আনন্দে ঘ. অধিক পরিশ্রমে

২। শতকরা কতভাগ ওজন বাড়লে ওজনাধিক্য বলে?
ক. ৫০% খ. ৪০%
গ. ৩০% ঘ. ২০%

৩। ওজনাধিক্য নির্ণয় করা সহজ পদ্ধতি কোনটি?
ক. ওজন নির্ণয় পদ্ধতি খ. ব্রোকার ইনডেক্স
গ. নিউটন সূত্র ঘ. ভাসমান সূত্র

৪। স্থূলতার কারণে দেহে কয়টি জটিল রোগ দেখা দিতে পারে?
ক. ২৫ টি খ. ১৫ টি
গ. ১০ টি ঘ. ৩ টি

৫। ওজন কমানোর জন্য প্রথমেই দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী কি কথা উচিৎ?
ক. খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে খ. ক্যালরির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে
গ. প্রোটিনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে ঘ. ফ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অত্যধিক ওজন বৃদ্ধি বলতে কি বোঝেন। ওজন কেন বৃদ্ধি পায় লিখুন।
২. অত্যাধিক ওজন বৃদ্ধির কারণসমূহ লিখুন।
৩. হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়বেটিস এর সাথে দেহের ওজন বৃদ্ধি সম্পর্কে লিখুন।
৪. ওজনহ্রাস করার কৌশলগুলো লিখুন।

পাঠ- ৮.৬ ঃ বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টি সমস্যা ও দূরীকরণের উপায়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ বাংলাদেশের শিশুরা কোন কোন অপুষ্টিতে বেশি ভোগে এর স্পষ্ট বর্ণনা দিতে পারবেন
- ♦ শিশুদের অপুষ্টির কারণগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- ♦ বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূরীকরণে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন

একটি দেশের উন্নয়নে শিশুর উন্নত পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অপুষ্টি এদেশের একটি বিরাট সমস্যা। বাংলাদেশে অপুষ্টিজনিত সমস্যার জন্য অনেক শিশু কিশোররের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যহত হচ্ছে, কর্মক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। একটি শিশুর অপুষ্টি সমস্যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্মের আগেই শুরু হয় এবং এই অপুষ্টির প্রধান কারণ মায়ের অপুষ্টি। পরবর্তীতে অপুষ্টির বিস্তার ঘটে জন্মের পরবর্তী পর্যায়ে। আমাদের দেশের শিশুদের মধ্যে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো দেখা যায়ঃ

ক) প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টি;
খ) কম ওজনের শিশু;
গ) ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত অপুষ্টি;
ঘ) অপুষ্টিজনিত এনিমিয়া;
ঙ) আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা।

ক) প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯১ এর তথ্য অনুযায়ী ৬ বছরের নিচের বয়সের ২৩ মিলিয়ন শিশুর মধ্যে মাত্র ১.৩ মিলিয়ন (৫.৬%) শিশু পুষ্টিগত দিক দিয়ে স্বাভাবিক। অবশিষ্ট ২১.৭ মিলিয়ন (৯৪.৪%) শিশু বিভিন্ন মাত্রার অপুষ্টির শিকার। ৩৫% শিশু মারাত্মক অপুষ্টির শিকার। ৫ বছরের নিচের বয়সের ৫০-৬০% শিশু মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অপুষ্টিজনিত কারণই দায়ী। অন্য এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১-৪ বছর বয়সের প্রতি ৬ জন মৃত শিশুর মধ্যে ১ জন শিশুর মৃত্যু ঘটে অপুষ্টির কারণে। সকল মৃত্যুর এক তৃতীয়াংশ মৃত্যু ঘটে মারাত্মক অপুষ্টির কারণে। এছাড়া মারাত্মক অপুষ্টির কারণে ছেলেদের মৃত্যুর ঝুঁকির চাইতে মেয়েদের মৃত্যুর ঝুঁকি দ্বিগুণ বেশি।

শিশুদের প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টির প্রধান কারণ হল ঃ

১) শক্তি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের বিশেষ করে প্রোটিনের অপর্যাপ্ত গ্রহণ।
২) পুষ্টি শিক্ষার অভাবে এবং অজ্ঞতার কারণে অপুষ্টির শিকার হচ্ছে।
৩) খাদ্য সম্পর্কে কুসংস্কার।
৪) দুধ ছাড়ানোর সময় পরিপূরক খাদ্য যথাযথভাবে না দেওয়া।
৫) ডায়রিয়া, হাম, যক্ষ্মা, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ইত্যাদি।

শিশুদের প্রোটিন-ক্যালরির অপুষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১) অপুষ্টির ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, এ জন্য রেডিও ও টিভিতে ব্যাপক প্রচারণা করা যেতে পারে।
২) পুষ্টি সরবরাহের জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে; যেমন- কৃষকদের মধ্যে উন্নত ও অধিক ফলনশীল বীজ বিতরণ, সার এর সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ, হাঁস-মুরগির পালন, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
৩) আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেলে খাদ্য গ্রহণও বৃদ্ধি পাবে।
৪) পুষ্টি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

খ) কম ওজনের শিশু

২.৫ কেজি বা ২৫০০ গ্রাম ওজনের নিচে যদি শিশুর জন্ম ওজন হয় তাহলে তাকে কম ওজনের শিশু বলা হবে। ইউনিসেফের দেওয়া ১৯90 সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩০-৫০% শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়।

জন্ম ওজন কম হওয়ার প্রধান কারণগুলো হলঃ

১) গর্ভাবস্থায় অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ।
২) খাদ্য সম্পর্কিত কুসংস্কার।
৩) মায়ের অপুষ্টি।
৪) গর্ভাবস্থায় আয়োডিনের অভাব।
৫) গর্ভাবস্থায় মায়ের সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়া।
৬) অল্পবয়সে গর্ভধারণ।

অল্প ওজনের শিশুরা ভবিষ্যতে অপুষ্টিতে সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। এই ধরনের শিশু লালন পালনে মায়েরও যথেষ্ট কষ্ট হয়। শিশুর হীনস্বাস্থ্য শিশুর সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য হুমকির কারণ হয়। তাই শিশুর জন্ম ওজন যাতে ২.৫ কেজির বেশি হয় সে জন্য কিছু ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমনঃ

১) গর্ভবর্তী মাকে প্রতিনিয়ত পর্যাপ্ত খাদ্য দেওয়া।
২) নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করা।
৩) গর্ভাবস্থায় পরিপূরক পুষ্টি উপাদানের ব্যবস্থা করা।
৪) অল্প বয়সে বিয়ের প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা।
৫) পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬) গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করা।

গ) ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত অপুষ্টি

আমাদের দেশে ৬ মাস থেকে ৬ বছরের নিচের বয়সের প্রায় ৫ লক্ষ শিশু রাতকানায় ভুগছে। ভিটামিন 'এ' এর অভাবে প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন ১০০ জন শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ভিটামিন 'এ' এর অভাবের কারণগুলো হলোঃ

১) ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ হতে বঞ্চিত হওয়া।
২) তেলের গ্রহণ কম হওয়ায় ভিটামিন 'এ' এর শোষণ হ্রাস পায়। ফলে অভাব দেখা যায়।
৩) মায়ের বুকের প্রথম দুধ (কোলেস্ট্রাম) শিশুকে না দেওয়া।
৪) হাম, ডায়রিয়া ইত্যাদির সংক্রমণ।
৫) কম সব্জি গ্রহণ । সব্জির চাহিদা মাথাপিছু ২০০ গ্রাম কিন্তু আমাদের দেশে সব্জির গ্রহণ মাথাপিছু মাত্র ২৪ গ্রাম। ফলে প্রয়োজনীয় ভিটামিনের চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে না এবং অভাব হচ্ছে।

ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১) শিশুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে শাক-সব্জি, ডিম, দুধ ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস করা।
২) বছরে অন্তত ২ বার ভিটামিন 'এ' এর পরিপূরক গ্রহণ করা।
৩) মায়ের বুকের প্রথম দুধ (কোলেষ্ট্রাম) সন্তান জন্মের পর পরই দেওয়া।
৪) শাক-সব্জি তেল দিয়ে রান্না করে খাওয়া।
৫) সংক্রমণ হলে ভিটামিন 'এ' এর পরিপূরক দেওয়া।
৬) সবজির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সব্জির চাষ বৃদ্ধি করা।
৭) হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন প্রকল্প গ্রহণ করা।
৮) বিনা মূল্যে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) অপুষ্টিজনিত এনিমিয়া

আমাদের দেশে প্রায় ৭০% মা ও শিশু অপুষ্টিজনিত এনিমিয়ার শিকার।

আমাদের দেশে এনিমিয়ার প্রকোপ বেশি হবার কারণগুলো হলঃ

১) রক্তগঠনকারী পুষ্টিউপাদান; যেমন- ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, প্রোটিন ও লৌহ সমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব।
২) হুকওয়ার্মের সংক্রমণ ও অন্যান্য সংক্রমণ।
৩) আমাদের দেশে ফলের উৎপাদন তা গ্রহণ চাহিদার চাইতে অনেক কম। চাহিদার ১০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। যার ফলে বিভিন্ন ভিটামিন ও ধাতব লবণের অভাব দেখা যায়। বিশেষ করে ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-বি এর অভাব হয়।
৪) শিশুকে যথাসময়ে পরিপূরক খাদ্য না দেওয়ায় শিশুর এনিমিয়া হয়।

এনিমিয়া থেকে শিশুদের রক্ষা করতে হলে বা এনিমিয়াকে প্রতিরোধ করতে হলে যে বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলঃ

১) হুক ওয়ার্ম সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য উন্নত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞান থাকতে হবে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে হবে।
২) পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ, প্রোটিন ও লৌহসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
৩) শাক-সবজি ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
৪) গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর পাশাপাশি আয়রণ ও ফলিক এসিড ট্যাবলেট নির্দিষ্ট মাত্রায় দিতে হবে।
৫) শিশুর বয়স ৫ মাস পূর্ণ হলে দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাদ্য দিতে হবে।

৬) আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা

আমাদের দেশে প্রতি বছর আয়োডিনের অভাবের ফলে ৩৩,০০০ জন শিশু জীবনের প্রথম মাসেই মৃত্যুবরণ করে। প্রতি বছর ৪১,০০০ জন শিশু মৃত অবস্থায় জন্ম নিচ্ছে এবং ৩,৯০,০০০ জন শিশু (৩.৭ মিলিয়ন শিশু) আয়োডিনের অভাবজনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। ৫ বছরের নিচের বয়সের ২ মিলিয়ন শিশু আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যায় ভুগছে এবং ৭ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকি বহন করছে। ৩ মিলিয়ন মেয়ে শিশু আয়োডিনের অভাবে ভুগছে।

১) বাংলাদেশের মাটি ও পানিতে আয়োডিনের অভাব থাকায় আয়োডিনের গ্রহণ চাহিদার তুলনায় কম।
২) গৃহ পালিত পশু ও আয়োডিনের অভাবজনিত রোগে ভোগে ফলে শিশুরা ও ভোগে।

বাংলাদেশের সর্বত্রই খাদ্যে আয়োডিনের কম-বেশি ঘাটতি রয়েছে। তাই আমরা কেউই বিপদমুক্ত নই। শিশু ও মহিলারা সবচেয়ে বেশি বিপদে রয়েছে। প্রতিকারের উপায়ঃ

১) আয়োডিনের অভাবজনিত ভয়াবহ সমস্যাগুলো এড়ানোর জন্য একমাত্র উপায় শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ আয়োডিন লবণ গ্রহণ করা। আর তা সম্ভব সব খাবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের মাধ্যমে। এর কোন বিকল্প নেই।
২) সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার অভ্যাস করলে আয়োডিনের চাহিদা সহজেই মিটানো সম্ভব হবে।
৩) লবণ উৎপাদনের পর এর মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে ও সঠিকভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য জনগণের মধ্যে প্রচারণা চালাতে হবে।

সারাংশ

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশুই কম বেশি অপুষ্টিজনিত সমস্যার শিকার। অপুষ্টির কারণে শিশুর মেধা-বুদ্ধি, কর্মশক্তি, গঠনমূলক চিন্তা শক্তি সবই ধীরে ধীরে লোপ পায়। অর্থাৎ শিশু তথা ভবিষ্যতের ভাবি দায়িত্ববান নাগরিকের জীবনের বিকাশের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে অপুষ্টি। এর ফলে জাতি ধীরে ধীরে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। সামনে আগানোর পথে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে অপুষ্টি। এর ফলে জাতি ধীরে ধীরে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। সামনে আগানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অপুষ্টি। তাই এই অপুষ্টিকে অবশ্যই রোধ করতে হবে এবং এর জন্য যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সব পদ্ধতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে একজন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান শিশুই ভবিষ্যতে একজন দায়িত্ববান নাগরিক হতে পারবে এবং স্বাভাবিক মেধা বিকাশের মাধ্যমে জাতিকে উন্নয়নের শীর্ষে পৌছাতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশে শিশুরা বেশির ভাগই অপুষ্টিজনিত ব্যাধির মধ্যে প্রোটিন ক্যালরি ও ভিটামিন 'এ' অপুষ্টিতে বেশি ভুগছে। বর্তমানে আয়োডিনজনিত সমস্যাই একটি মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এর জন্য সর্বস্তরের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান এবং গণমাধ্যমের প্রচারণাই মুখ্য হওয়া প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের শিশুরা কমাস থেকে অপুষ্টি সমস্যায় ভোগে?

ক. জন্মের পর খ. ১-২ বছর বয়সে

গ. ৩-৪ বছর বয়সে ঘ. জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভ থেকে

২। বাংলাদেশের অপুষ্টিজনিত রোগ সাধারণত কয়টি?

ক. ২০ টি খ. ১০ টি

গ. ১২ টি ঘ. ৫ টি

৩। প্রতি ৬ জন মৃত শিশুর মধ্যে ১ জনের মৃত্যুর কারণ কি?

ক. অবহেলা ও অনিয়ম খ. অপুষ্টি সমস্যা

গ. অতিমাত্রায় খাদ্য গ্রহণ ঘ. চিকিৎসার অভাবে

৪। কম ওজনের শিশুদের সহজেই কি হয়?

ক. অপুষ্টিতে ভোগে খ. মারা যায়

গ. পেটের পীড়ায় ভোগে ঘ. মাথার ব্যাথায় ভোগে

৫। হাম এবং ডায়রিয়া হলে শিশুদের কোন ভিটামিনের অভাব হয়?

ক. বি, এর অভাব হয় খ. ভিটামিন 'এ' অভাব হয়

খ. ভিটামিন 'সি' এর অভাব হয় ঘ. বি, এর অভাব হয়

৬। কোন রোগে প্রতিরোধে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণের ব্যবস্থা করতে হয়?

ক. ডায়রিয়া খ. অন্ধত্ব

গ. এনিমিয়া ঘ. গলগন্ড

রচনামূরক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শিশুরা কি কি অপুষ্টিতে ভোগে এবং কেন? - লিখুন।

২। অপুষ্টি প্রতিরোধ করতে কোন কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় লিখুন।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ৮

অনুশীলনী- ৮.১ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ক

অনুশীলনী- ৮.২ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। গ

অনুশীলনী- ৮.৩ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ক ৪। খ ৫। গ

অনুশীলনী- ৮.৪ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। গ ৬। খ ৭। খ ৮। ক

অনুশীলনী- ৮.৫ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ ৫। খ

অনুশীলনী- ৮.৬ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক ৫। খ ৬। খ

ইউনিট ৯

খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

প্রতি গৃহে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় প্রতিদিনই খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকৃতি প্রদত্ত খাদ্যকে আহারের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্য প্রস্তুতকরণের। এ পর্যায়ে খাদ্য ক্রয়, রন্ধন পদ্ধতি, খাদ্য সংরক্ষণ, পরিবেশন এ কাজগুলো পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হবে পুষ্টি মূল্য সংরক্ষণ করে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবারকে গ্রহণোপোযোগী করে তোলা। খাবার প্রস্তুতের জন্য মেনু ও রেসিপি তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মেনুতে খাদ্য তৈরির নির্দেশনা থাকে। রেসিপি অনুসারে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করা হলে ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। খাদ্য পরিবেশন কলা ও শিল্প জ্ঞানের সমন্বয়ে হওয়া উচিত। খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা দু'ভাবে হয়। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন। প্রতি পরিবেশন ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব কর্তব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও খাদ্য পরিবেশনে পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিরুচি, নীতিবোধ, শিল্পকলার মনোভাব ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। সরকারী প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের আপ্যায়ন, বিবাহ ও বড় হোটেলে আনুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা করা হয়। জন্ম দিন, আকিকা, বিবাহ বার্ষিকী, বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নে অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা করা হয়।

খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা বিষদভাবে আলোচনার জন্য এ ইউনিটের বিষয়বস্তুকে নয়টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ- ৯.১ ঃ খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব

পাঠ- ৯.২ ঃ মেনু পরিকল্পনার নীতি

পাঠ- ৯.৩ ঃ মেনু রচনার নিয়ম কানুন

পাঠ- ৯.৪ ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুযায়ী খাদ্যের মেনু

পাঠ- ৯.৫ ঃ খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা

পাঠ- ৯.৬ ঃ খাদ্য প্রস্তুত ঃ রেসিপি

পাঠ- ৯.৭ ঃ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন

পাঠ- ৯.১ ঃ খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- ♦ পরিবেশন ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ♦ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ♦ ব্যবস্থাপকের দায়িত্বগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

খাদ্য প্রস্তুতের পরই আসে পরিবেশনের কথা। খাদ্য প্রস্তুতের উপর খাদ্যের গুণাগুণ রক্ষা করা যেমন নির্ভর করে তেমনি খাদ্য পরিবেশনে অসতর্কতার কারণে পুষ্টিমূল্যেরও অনেক অপচয় হয়। খাদ্য পরিবেশন একটি কৌশলগত পদ্ধতি। কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এ পদ্ধতির কৃতকার্যতা ঘটে। যে পদ্ধতিতে খাদ্য তালিকা বা মেনু অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট কৌশলে খাদ্য গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয় তাকে খাদ্য পরিবেশন বলে। যেমন চেয়ার টেবিলে বসে খাদ্য পরিবেশন ও বুফে পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন। উন্নত দেশগুলোতে খাদ্য পরিবেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এর উপর চলছে অনেক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও এর প্রতিফলন পড়ছে। শিল্প ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য পরিবেশনের প্রতি আজকাল শিক্ষিত সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা একটি কর্মমুখী প্রচেষ্টা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খাদ্য প্রস্তুতের দায়িত্ব পালনের পর খাদ্য পরিবেশনের কাজটি অন্য সদস্যগণ পালন করে নিজেদের কাজে নিয়োজিত করে উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারে।

ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা

LOUIS A. AILEH এর মতে "ব্যবস্থাপনা" এমন এক সমন্বিত পদ্ধতিগত জ্ঞান যা কতগুলো সাধারণ নীতিভিত্তিক এবং প্রভূত ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে পরিবর্তনশীল। Ear P. Strong এর মতে "একজন ব্যবস্থাপক পরিকল্পনা করেন, আয়োজন করেন, প্রভাবিত করেন, নির্দেশনা দেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন।" একজন ব্যবস্থাপকের সমস্ত কর্মকান্ডই "ব্যবস্থাপনা" শব্দটির উৎকৃষ্ট অর্থ। খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা হোক বা অন্যকোন ব্যবস্থাপনা হোক উপরোক্ত সংজ্ঞা মতেই হয়ে থাকে। কোন ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাপ্ত সম্পদসমূহের ব্যবহার দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই ব্যবস্থাপনা করবেন।

কোন ব্যবস্থাপনার সাধারণ উপাত্তকে ছয়টি 'M' দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন এম (M) - ম্যান (Men কর্মী), মানি (Money অর্থ), ম্যাটেরিয়াল (Materials বস্তু সম্পদ), মেশিনারী (Machinery যন্ত্রপাতি), মার্কেট (Market বাজার) এবং মিনিট (Minutes সময়)।

ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব

যে কোন খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব কর্তব্যের উপরই নির্ভর করবে খাদ্য প্রস্তুতের স্বার্থকতা ও খাদ্য গ্রহণের সন্তুষ্টি। ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব কি ধরনের হবে তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আকার, আয়তন, উদ্দেশ্যাবলীর প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ইত্যাদির উপর। খাদ্য পরিবেশনে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে বিশেষ কতগুলো বিষয়ের কারণে; যেমন- ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, আর্থসামাজিক অবস্থা, লোকসংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নতা, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

খাদ্য পরিবেশনের জন্য কোন ব্যবস্থাপক নিচের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

১। পরিকল্পনা করা
২। সংগঠন করা
৩। কর্মীসংস্থান করা
৪। নির্দেশ প্রদান
৫। সমন্বয় সাধন করা
৬। কর্মীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা যোগানো
৭। নিয়ন্ত্রণ করা
৮। মূল্যায়ন করা

১। **পরিকল্পনা করা ঃ** লক্ষ্য অর্জনের জন্য পালনীয় কার্যাবলীর নক্সা প্রণয়নকে পরিকল্পনা বলে। খাদ্য পরিবেশন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলীর লিখিত নক্সা তৈরি করার দায়িত্ব ব্যবস্থাপকের উপরই নির্ভরশীল। ব্যবস্থাপক তার হাতে কি ধরনের শক্তি সম্পদ আছে এগুলো বিচেনা করেই পরিকল্পনা করেন।

২। **সংগঠন করা ঃ** খাদ্য পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে কর্তব্য ও দায়িত্ব বন্টন এবং তাদের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করা বা সংগঠন করা একজন ব্যবস্থাপকের প্রধান দায়িত্ব।

৩। **কর্মীসংস্থান করা ঃ** ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খাদ্য পরিবেশনকারী নির্বাচন করা। কর্মীদের প্রশিক্ষণদান ও কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার ব্যবস্থা করাও একজন ব্যবস্থাপকরে দায়িত্ব।

৪। **নির্দেশ প্রদান ঃ** পরিকল্পনা অনুযায়ী সুসংগঠিতভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দেয়া একজন ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। ব্যবস্থাপকের নির্দেশনা কর্মীদের কাজের দিক নির্দেশনা হিসাবে কাজ করে। সঠিক নির্দেশনা কাজের ভুলত্রুটি কমিয়ে কাজের মান বৃদ্ধি করে।

৫। **সমন্বয় সাধন করা ঃ** খাদ্য পরিবেশন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন না করা হলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়; যেমন- রান্নাঘর, পরিবেশন কক্ষ, পরিবেশনের সরঞ্জামাদি নির্বাচন, অনাময় ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যাবলীর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করা গেলে খাদ্য পরিবেশন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। এতে সম্পদের অপচয় কমে সীমিত সম্পদের সু-ব্যবহার হয়।

৬। **কর্মীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা যোগানো ঃ** কোন ভাল কাজের জন্য স্বীকৃতি না পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে অগ্রগতির সম্ভাবনা কমে যায়। প্রতিষ্ঠানের ক্রমউন্নতি, গুণগত মান বৃদ্ধি ও লাভজনক করার জন্য কর্মীদের কাজের মান বৃদ্ধি প্রয়োজন। এই মান বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেয়া এবং অনুপ্রেরণা যোগানো ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

৭। **নিয়ন্ত্রণ করা ঃ** পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনবোধে কাজের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়; যেমন- সাংগঠনিক কাজের নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনবোধে স্থান পরিবর্তন। পরিবেশন পদ্ধতির পরিবর্তন ইত্যাদির দায়িত্ব ব্যবস্থাপকই পালন করেন।

৮। **মূল্যায়ন ঃ** মূল্যায়ন হল কোন কাজের পরিমাপক। পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো গেল কিনা তা দেখার জন্য মূল্যায়নের প্রয়োজন। লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটাও লক্ষ্য করতে হবে। যেন ভবিষ্যতে এ ত্রুটিগুলো সংশোধন করে সহজে কাজ সম্পাদন করা যায়। এসকল মূল্যায়নের দায়িত্ব ব্যবস্থাপকের উপর থাকে।

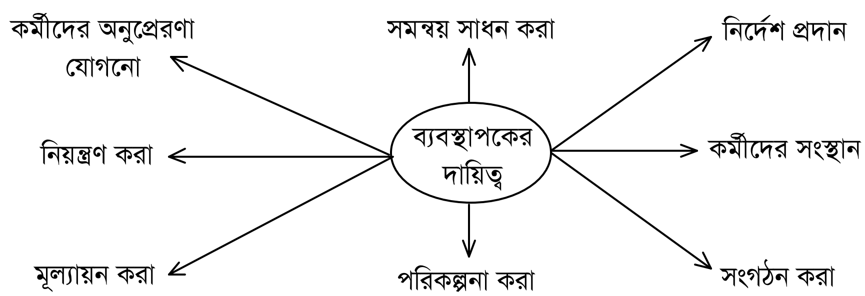

ব্যবস্থাপকের দায়িত্বের ক্ষেত্রের রেখাচিত্র

সারংশ

খাদ্য পরিবেশন কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি কৌশলগত পদ্ধতি। বিভিন্ন পরিবেশ, সদস্য সংখ্যা ও রীতিনীতির উপর নির্ভর করে খাদ্য পরিবেশন পদ্ধতি। খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব কর্তব্যের উপরই নির্ভর করে খাদ্য প্রস্তুতের সার্থকতা ও খাদ্য গ্রহণের সন্তুষ্টি। খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হল পরিকল্পনা করা, সংগঠন করা, কর্মীসংস্থান করা, নির্দেশ প্রদান, সমন্বয় সাধন করা, কর্মীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা যোগানো ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্যবস্থাপনার সাধারণ উপাত্তকে কয়টি ‘M’ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়?
ক. পাঁচটি খ. ছয়টি
গ. সাতটি ঘ. আটটি

২। ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব কি?
ক. বাজার করা খ. নির্দেশ প্রদান
গ. খাদ্য পরিবেশন করা ঘ. ঘরের পরিবেশ সুন্দর রাখা

পাঠ- ৯.২ ঃ মেনু পরিকল্পনার নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মেনু বা খাদ্য তালিকা কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- সু-পরিকল্পিত মেনুর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মেনু পরিকল্পনার নীতি উল্লেখ করতে পারবেন
- মেনু পরিকল্পনার বিভিন্ন নীতি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

মানুষের দৈহিক পুষ্টি ও পরিশ্রমের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুষম খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিবেশন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনার মাধ্যমেই অগ্রসর হতে হয়। খাদ্য পরিকল্পনা উন্নত বিশ্বের অন্যতম অধ্যায়। কারণ খাদ্য পরিকল্পনা আজকাল শুধুমাত্র গৃহেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও খাদ্য পরিকল্পনা যথারীতি চলছে। তাই স্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাদ্য পরিকল্পনা করতে হয়। খাদ্য পরিকল্পনা বলতে আমরা সাধারণ অর্থে বুঝি "প্রদত্ত আয় ও সময়সীমার মধ্যে খাদ্য উপাদানের চাহিদাভিত্তিক তালিকা বা মেনু তৈরি করা"। পরিবারের সদস্যদের সুষম খাদ্য পরিবেশনের জন্য মেনু পরিকল্পনা করে নেয়া উচিত। মেনু পরিকল্পনা করে খাদ্য গ্রহণ করলে ব্যক্তি বিশেষের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা পূরণ করা যায়। খাওয়ার প্রতি রুচি ও আগ্রহ জন্মে, খাদ্যের রং, আকৃতি, গুণাগুণ বজায় রেখে খাদ্য রান্না ও পরিবেশন করা সম্ভব হয়। সুপরিকল্পিত মেনু খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ ও খাদ্য ক্রয় করতে সহায়তা করে অন্যদিকে খাদ্যের অপচয় কমিয়ে দেয়। খাদ্য গ্রহণকারীর চাহিদা এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধা এ দুটি মেনু পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

মেনু পরিকল্পনার সময় যেসব নীতিগুলো লক্ষ্য করা প্রয়োজন সেগুলো নিচে আলোচনা করা হল।

১। বয়স, স্ত্রী-পুরুষ এবং পেশা

বয়সের তারতম্য, স্ত্রী-পুরুষ ও পেশার ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তি বিশেষের পুষ্টি চাহিদার তারতম্য দেখা যায়। দৈনিক পুষ্টিমানের চাহিদার উপর ভিত্তি করে খাদ্যের মেনু তৈরি করা বিজ্ঞানসম্মত। শৈশবে ও কৈশোরে পুষ্টির চাহিদা বেশি থাকে, তাদের শরীর গঠনের উপযোগী খাদ্য সংযুক্ত থাকবে মেনুতে। বয়স্কদের পুষ্টি চাহিদা কম এবং স্বল্প পরিশ্রমের ফলে তাদের শুধু শক্তির প্রয়োজন মিটানো ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খাদ্য রাখতে হবে মেনুতে। যে শ্রমিক মাটি কাটে রিক্শা চালায় তার ক্যালরির বেশি প্রয়োজন হয় যিনি অফিসে চেয়ারে বসে কাজকর্ম করেন তার চাইতে। স্কুল, রেস্টুরেন্ট, হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও সদস্যদের বয়স, স্ত্রী, পুরুষ ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য মেনুতে রাখতে হবে।

২। আবহাওয়া ও মৌসুম

মৌসুমী খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ বেশি থাকে। স্বাভাবিক বর্ণ, গন্ধ ও আকৃতির জন্য সে সব খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার প্রতিও আকর্ষণ থাকে। তদুপরি সহজলভ্য ও দামে কিছুটা সস্তা থাকায় মৌসুমী খাদ্যদ্রব্য মেনুতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মেনু পরিকল্পনায় আবহাওয়া ও ঋতুর একটি গুরুত্ব আছে। সাধারণত গরমের সময় শাক্ সবজি, ফলমূল, কম চর্বিযুক্ত খাদ্য দিয়ে মেনু পরিকল্পনা করা উচিত। শীতের সময় তাপ সৃষ্টিকারী চর্বি ও তেলজাতীয় খাবার দিয়ে মেনু তৈরি করা যায়। বর্ষার সময় তেলেভাজা খাদ্য, পিঠা, পায়েস ইত্যাদি খাবার দিয়ে মেনু পরিকল্পনা করলে বাস্তবমুখী এবং কার্যকরী হয়।

৩। বাজেট বা অর্থনৈতিক অবস্থা

খাদ্যের জন্য বরাদ্দ অথবা বাজেট অনুযায়ী মেনু করলে বাস্তবায়ন সহজ হয়। মেনু পরিকল্পনার সময় বরাদ্দকৃত অর্থের সাথে ভান্ডারে পূর্বের কি খাদ্য মজুদ আছে এবং বাজারদর মূল্যায়ন করে খাদ্য তালিকাভুক্ত করা উচিত। এতে অপচয় রোধ হয় এবং সুলভে খাদ্য ক্রয় করা যায়। মেনু পরিকল্পনার সময় পাশাপাশি খাদ্য ক্রয়, প্রস্তুত ও পরিবেশনের তালিকা তৈরি করা হলে ব্যবস্থাপকের কার্যভার অনেকটা লাঘব হয় এবং লক্ষ্য অর্জনে সফলতা লাভ করা যায়। আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেকের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে বাজেট অনুযায়ী মেনু পরিকল্পনা করা খাদ্য ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৪। জাতি, অঞ্চল, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

মেনু পরিকল্পনায় জাতি, ধর্ম ও আঞ্চলিক খাদ্যাভাস উল্লেখযোগ্য দিক। জাতিগত ভাবে কিছু খাদ্য অনেকের পছন্দ। আবার ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে কিছু কিছু খাবার অনেকেই বাদ দেন। আবার আঞ্চলিক খাদ্য গ্রহণে অনেকে এতবেশি অভ্যস্ত

যে, অন্য অঞ্চলের খাদ্য গ্রহণ তাদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠে না। পরিবার ব্যতীত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মেনু পরিকল্পনায় এসব বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত। সুদক্ষ খাদ্য ব্যবস্থাপককে এ বিষয়গুলো সূক্ষ্মতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে মেনু পরিকল্পনা করতে হবে।

৫। খাদ্যাভ্যাস

মেনু তৈরিতে খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব কম নয়। খাদ্যাভ্যাসের সাথে সঙ্গতি রেখে মেনু পরিকল্পনা দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তবে নতুন খাদ্যাভ্যাসের প্রচেষ্টা মেনু পরিকল্পনাতে অভ্যাহত থাকতে হবে। এতে দেশী বিদেশী নতুন খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্থ হয়ে পুষ্টি চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস শিশুকাল থেকেই গড়ে উঠে। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস অপুষ্টির হাত হতে রক্ষা করে। সুতরাং খাদ্যাভ্যাসের উপর লক্ষ্য রেখে মেনু তৈরি করা যুক্তিসঙ্গত।

৬। অভিজ্ঞ খাদ্য প্রস্তুতকারক

মেনুতে অন্তর্ভুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য দক্ষ বা অভিজ্ঞ লোক থাকলে মেনু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়; যেমন- ভাত-তরকারি, বেকারি দ্রব্য, সালাদ-স্যান্ডউইচ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, বিরিয়ানি ইত্যাদি খাবার তৈরির উপযোগী পাচক পাচিকা না থাকলে উক্ত খাবার মেনুতে অন্তর্ভুক্ত করার কোন সার্থকতা নেই। খাদ্য পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের মেনু পরিকল্পনা কারীকে বিভিন্ন বিভাগের দক্ষ পাচক সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার। পাচক ও সহপাচকদের জন্য মেনু সহজ হওয়া দরকার। কারণ জটিল মেনু সহপাচকদের বিভ্রান্ত করে।

৭। উদ্বৃত্ত খাদ্যের ব্যবহার

দিনের খাদ্য প্রস্তুতের পর অনেক সময় কিছু খাবার উদ্বৃত্ত থাকে। সেগুলো কাঁচা বা প্রকৃতিজাতও হতে পারে। এ খাদ্যগুলো যেন পরবর্তিতে ব্যবহার করে নতুন খাদ্য তৈরি করে মেনুতে সংযোজন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন উদ্বৃত্ত ডাল, চাল ব্যবহার করে খিচুড়ি, ফলমূল দিয়ে সালাদ বা কাষ্টার্ড, রান্না করা মাছ মাংস দিয়ে সিঙ্গারা, সমুচা ইত্যাদি খাদ্য মেনুতে রাখা যায়।

৮। তৈজসপত্র ও সরঞ্জাম

দক্ষ পাচক ছাড়া যেমন বাঞ্ছিত খাবার প্রস্তুত করা সম্ভব নয় তেমনি খাদ্য রান্নার জন্য নির্দিষ্ট তৈজসপত্র না থাকলে ভালভাবে খাদ্য প্রস্তুত করা যায় না। বেকড্ ইলিশের জন্য ওভেন, পুডিং তৈরির জন্য মোল্ড, ভাপাপিঠা তৈরির জন্য নির্দিষ্ট হাড়ি না হলে উক্ত খাবার দিয়ে মেনু পরিকল্পনা করা যায় না।

৯। রেসিপির ব্যবহার

রন্ধন পদ্ধতির উল্লেখ ছাড়া মেনু রচনা করলে সে মেনু সবসময় কার্যকরী নাও হতে পারে। সেজন্য মেনু পরিকল্পনার সময় পাশাপাশি রেসিপির নির্দেশ থাকলে পাচক-পাচিকা তা অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুতে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠানে খাদ্য রান্নার সময় পাচকদের কাছে নির্দিষ্ট মেনুর রেসিপি থাকলে রান্না করা খাবারের মান ও পরিমাণ সঠিক থাকে।

সারাংশ

খাদ্য পরিকল্পনা বা মেনু বলতে বুঝায় প্রদত্ত আয় ও সময়সীমার মধ্যে সকলের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে খাদ্য তালিকাভুক্ত করা। খাদ্যের প্রতি রুচি ও আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য মেনু পরিকল্পনা করার জন্য কতগুলো নীতি অবলম্বন করা উচিত; যেমন- বয়স, স্ত্রী-পুরুষ ও পেশাভেদে মেনু পরিকল্পনা করা। আবহাওয়া এবং মৌসুম অনুযায়ী মেনু পরিকল্পনা খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী তৈরি মেনু বাস্তবায়ন করা সম্ভব। মেনু পরিকল্পার অন্যান্য নীতিগুলো হল - জাতি, অঞ্চল, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, খাদ্যাভ্যাস, অভিজ্ঞ খাদ্য প্রস্তুতকারকের বর্তমান ও উদ্ধৃত্ত খাদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি অনুযায়ী মেনু পরিকল্পনা করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২

শূন্য জায়গায় সঠিক বাক্য বা শব্দ লিখতে হবে।

১। স্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে ______________________ ভাবে খাদ্য পরিকল্পনা করতে হয়।

২। খাদ্য গ্রহণকারীর ______________ এবং __________________ সুবিধা এ দুটি মেনু পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

৩। বয়সের তারতম্য ______________ ও ____________ অনুযায়ী ব্যাক্তি বিশেষের পুষ্টি চাহিদার তারতম্য দেখা যায়।

৪। গরমের সময় ________, ______________, ______________ খাদ্য দিয়ে মেনু পরিকল্পনা করা উচিত।

পাঠ- ৯.৩ ঃ মেনু রচনার নিয়ম কানুন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মেনু পরিকল্পনার নিয়ম কানুন বর্ণনা করতে পারবেন
- খাদ্যের ৪টি বিভাগ হতে কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন তা বর্ণনা করতে পারবেন
- মেনুতে বিভিন্ন ধরনের খাবার সংযোজনের গুরুত্ব বুঝবেন
- মেনু লিখার পদ্ধতি জেনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেনু কার্ড লিখতে পারবেন

বিষয়বস্তু

মেনু এমন একটি খাদ্যের তালিকা যার মধ্যে রয়েছে মানুষের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও তৃপ্তি। খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনার কৃতকার্যতা সুপরিকল্পিত মেনুর উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। মেনু পরিকল্পনাকারীকে বিভিন্ন খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানসম্মত, কুসংস্কারমুক্ত, উৎসাহী, রুচিজ্ঞানসম্মত হতে হয়। মেনু প্রণয়নে বহু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এসবের সুবিধার্থে পরিকল্পনার সময় ও স্থানটির গুরুত্ব কম নয়। সাধারণত সময় হাতে নিয়ে মেনু পরিকল্পনায় বসা উচিত। নিরিবিলি জায়গা ও টেবিলে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে মেনু রচনায় বসতে হয়। আদর্শ মেনু রচনার জন্য নিচের নিয়মনীতি অনুসরণ করা উচিত।

১। প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্য থেকে পরিমিত পরিমাণ নিয়ে মেনু তৈরি করা।

দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার থেকে-

শিশুদের জন্য	-	৩-৪ কাপ
কিশোরদের জন্য	-	২-৪ কাপ
বয়স্কদের জন্য	-	২ পরিবেশন বা ২ কাপ

মাছ, মাংস, ডাল ও ডিম জাতীয় খাদ্য-

শিশুদের জন্য	-	১ অথবা তারও অধিক পরিবেশন
কিশোরদের জন্য	-	৩ অথবা তারও অধিক পরিবেশন
বয়স্কদের জন্য	-	২ অথবা তারও অধিক পরিবেশন

শাক-সবজি ও ফলমূল জাতীয় খাদ্য-

শিশুদের জন্য	-	২ অথবা তারও অধিক পরিবেশন
কিশোরদের জন্য	-	৪ অথবা তারও অধিক পরিবেশন
বয়স্কদের জন্য	-	৪ অথবা তারও অধিক পরিবেশন

শস্য জাতীয় খাদ্য-

শিশুদের জন্য	-	১ অথবা তারও অধিক পরিবেশন
কিশোরদের জন্য	-	৪ অথবা তারও অধিক পরিবেশন
বয়স্কদের জন্য	-	৪ অথবা তারও অধিক পরিবেশন

খাদ্যের ৪টি বিভাগ হতে খাদ্য নিয়ে মেনু পরিকল্পনা করা হলে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি হবে না। এতে খাদ্য অভাবজনিত রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

২। সালাদ ও মিষ্টি খাবার অন্তর্ভুক্তি

ইদানিং সালাদের জনপ্রিয়তা আমাদের দেশে বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ লোকের মধ্যে কাঁচা সবজি খাওয়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ পায়। সালাদ তৈরির জন্য কাঁচা টাটকা সবজি ও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; যেমন শশা, খিরা, টমেটো, মূলা, গাজর, বীট, কামরাঙ্গা, জাম্বুরা, লেটুস, কাঁচামরিচ ইত্যাদি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, খনিজলবণ ও

পানি রয়েছে। প্রতিদিনের মেনুতে এক প্রকার সালাদ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সালাদের পাশাপাশি আঁচার, চাটনি ইত্যাদিও রুচি ও স্বাদ বাড়ানোর জন্য রাখা যায়।

প্রতিদিনের খাদ্য ব্যবস্থায় মিষ্টি খাবার (dessert) রাখা না গেলেও আনুষ্ঠানিক ভোজে খাওয়ার পর মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ার প্রচলন দীর্ঘকাল থেকে চলে এসেছে। দুপুর ও রাতে খাবারের পর কিছু মিষ্টিজাতীয় খাবার যেমন ফিরনি, জরদা পুডিং, হালুয়া, মিষ্টি, দই অথবা মৌসুমী ফল কলা, কমলা, পেপে, আম ইত্যাদি মেনুতে থাকবে।

৩। পানীয় অন্তর্ভুক্তিকরণ ঃ মেনুতে কিছু পানীয় অন্তর্ভুক্তি করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে স্কুল কলেজে ছাত্রাবাসের মেনুতে সপ্তাহে অন্তত ৪-৫ দিন দুধ বা লাচ্ছি নতুবা ফলের রস ইত্যাদি পানীয় দেয়া উচিত। আনুষ্ঠানিক ভোজেও খাওয়ার পর চা বা কফি পরিবেশন করা যায়। সকালে নাস্তার পর চা-কফি-দুধ অথবা ফলের রস ইত্যাদি ধরনের পানীয় রাখা হয়।

৪। চক্রমেনু তৈরি করা ঃ যে মেনু একবার তৈরি করার পর প্রয়োজনবোধে পুন: পুন: ব্যবহৃত হয়। রেস্টুরেন্ট, স্কুল কলেজ ক্যাফেটারিয়া, ছাত্রাবাস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে ৭ দিন ১৫ দিন অথবা এক মাসের মেনু একসাথে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। মেনু পরিকল্পনার কাজ সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার জন্য সাপ্তাহিক মেনুকে ঘুরিয়ে ১৫ দিন বা ১ মাসেরও বেশি চক্রাকারে আবর্তন করা যায়। চক্র মেনুর বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে। যেমন-

— সহজে খাদ্যের সংযোজন করা যায়।
— মৌসুমী খাদ্য সংযোজন করা যায়।
— মেনু পরিকল্পনায় সময় ও শক্তির কম অপচয় হয়।
— খাদ্যের চাহিদা ও পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
— একসাথে খাদ্য ক্রয় করে রাখা যায়।
— সুসংগঠিত ভাবে কাজ করা যায়।
— উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকার সম্ভাবনা থাকে না।
— মেনু পরিকল্পনা, খাদ্য ক্রয়, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়।

৫। মেনু লেখার নিয়মাবলী ঃ মেনু পরিকল্পনাকারীকে মেনু লেখার ধারাবাহিক নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হয়। খাদ্য গ্রহণকারী ও প্রস্তুতকারকের জন্য মেনু লেখার মধ্যে কিছুটা তারতম্য থাকে। প্রস্তুতকারকের জন্য মেনু বিষদভাবে লেখা হয় খাদ্য প্রস্তুতের সুবিধার্থে। যেমন মাছ ভাজা - হালকা না কড়া হবে সেটা লেখা থাকবে। ঘন ডাল না পাতলা ডাল হবে তা লেখা না থাকলে খাদ্য প্রস্তুতে অসুবিধা হতে পারে। মেনু লেখার সময় কি নিয়ম পালন করতে হয় তা নিচে দেয়া হল-

ক) পরিবেশন অনুযায়ী যে খাবার আগে পরিবেশ করা হবে তা আগে লিখতে হবে। পরবর্তী পরিবেশনের খাবারগুলো ক্রমান্বয়ে লিখতে হয়। কার্ড বা কাগজের মধ্যবর্তী স্থানে লেখা থাকবে। দু'দিকে সমপরিমাণ জায়গা খালি থাকবে। সুপ এবং মাছ মাংস দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য আগে লিখতে হবে। রান্না করা সবজি, সলাদ, ভাত বা রুটি মিষ্টি খাবার, চা বা কফি ক্রমান্বয়ে লিখতে হবে। অন্য ভাবে বলা যায়, প্রোটিন, শাক সব্জি, শস্য জাতীয় খাদ্য, মিষ্টি, পানীয় এভাবে পরপর সাজিয়ে লিখতে হয়।

খ) খাবার কি পদ্ধতিতে রান্না হবে তার উল্লেখ মেনুতে থাকবে যেমন ভাজামাছ, মিশ্র তরকারি, আলু পটল ভাজি, মুরগি আলুর তরকারি, গুড়া মাছের চচ্চড়ি, সব্জির কাটলেট ইত্যাদি।

গ) কোন খাবারের সাথে আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি থাকলে সেই খাবারের পাশাপাশি আনুসঙ্গিক খাবারের নাম লিখতে হবে। যেমন- রুটির সাথে মাখন, জ্যাম, জেলি। ডালের সাথে লেবু, চাট্নি, মাছ, মাংসের সাথে আমের আঁচার ইত্যাদি। মেনু লিখার নমুনা-

প্রাত:রাশ
মিশ্র তরকারির নিরামিষ
চাপাতি
কমলা/কলা
চা/দুধ/কফি

দুপুরের খাবার
ইলিশ মাছ পটলের ঝোল
লালশাক ভাজি করল্লা আলু ভর্তা
লেবু
ভাত

রাতের খাবার
কিমা বাধাকপির ভুনাকারি
তাজা সবজির সালাদ
মাঝারি ঘন ডাল
ভাত/রুটি
কাষ্টার্ড/ফিরনি

সারাংশ

মেনু পরিকল্পনাকারীকে বিভিন্ন খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন, রুচিশীল, উৎসাহী ও কুসংস্কারমুক্ত হতে হয়। সময় হাতে নিয়ে নিরিবিলি জায়গায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নিয়ে মেনু রচনায় বসতে হয়। আদর্শ মেনু রচনায় খাদ্যের ৪টি বিভাগ হতে পরিমাণমত খাবার নিতে হয়। মেনুতে সালাদ ও পানীয় অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব রয়েছে। খাওয়ার পর মিষ্টি (Dessert) জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। চক্র মেনু সাধারণত: হোস্টেল, হোটেল, রেস্টুরেন্টে ব্যবহৃত হয়। চক্র মেনুর সুবিধাগুলো হল - খাদ্য সংযোজন করা যায়। একসাথে সুলভে খাদ্য ক্রয় করা যায়, উদ্বৃত্ত খাদ্য ব্যবহার করা যায়, খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশনের কাজ সংগঠিতভাবে করা যায়। খাদ্য পরিবেশনের ক্রম অনুযায়ী মেনু লিখতে হয়। বিশেষ করে প্রোটিন, সব্জি-সালাদ, ভাতরুটি, ডাল, মিষ্টি, চা-কফি এভাবে ক্রমান্বয়ে মেনু লিখার পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দুধ বা দুধজাতীয় খাদ্য বিভাগ থেকে শিশুদের দৈনিক কি পরিমাণ প্রয়োজন হয়?
ক. ১-২ কাপ   খ. ২-৩ কাপ
গ. ৩-৪ কাপ   ঘ. ৪-৫ কাপ

২। কাঁচা টাট্‌কা সবজির সালাদে থাকে-
ক. প্রোটিন ও খনিজ লবণ   খ. ভিটামিন ও চর্বি
গ. খনিজলবণ ও ভিটামিন   ঘ. পানি ও প্রোটিন

রচনামূলক

১। মেনু পরিকল্পনার সময় কি কি নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৯.৪ ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুযায়ী খাদ্যের মেনু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুযায়ী খাবার নির্বাচন করতে পারবেন
- বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জন্মদিন, বিবাহ, চা-চক্র, বনভোজন ও স্কুল টিফিনের জন্য মেনু পরিকল্পনা করে লিখতে পারবেন

বিষয়বস্তু

পরিবারে নানাধরনের সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক অনুষ্ঠান হয়। এসময় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন চলে। অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সময় খুব ঝামেলায় পড়তে হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কি ধরনের খাদ্যদ্রব্য খাওয়ানো হবে একথা ভেবে। মেনু পরিকল্পনার নিয়মনীতি সম্পর্কে জানা থাকলে কাজটি সহজ বোধ হবে। সাধারণত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য খাদ্যের মেনু নির্ভর করে অনুষ্ঠানের প্রকৃতির উপর। লোকসংখ্যা, সময়, খাদ্য প্রস্তুতকারকের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। যেমন জন্মদিনের মেনু বিবাহ অনুষ্ঠানের মেনু হতে ভিন্ন হয়। আবার বনভোজনের মেনু চা-চক্রের মেনু থেকে ভিন্ন ধরনের হয়। নিচে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মেনু সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

জন্মদিন

জন্মদিন খুব আনন্দের দিন। পরিবারে ছোট-বড় সকল বয়সের সদস্যদের জন্মদিন হয়। এ অনুষ্ঠানে পারিবারিক সদস্য ছাড়াও বাইরের অতিথি থাকে। এ অনুষ্ঠানটি বিকেল বেলা বা রাত্রে হয়ে থাকে। বিকেলের অনুষ্ঠানে রাত্রের অনুষ্ঠানের চেয়ে কিছুটা হালকা ধরনের মেনু হয়। তাবে কিছু সাধারণ খাবার থাকে যা যে কোন সময়ে অনুষ্ঠান হোক না কেন থাকবে। যেমন জন্মদিনের কেক, মিষ্টি, পানীয়, ঝাল খাবার ইত্যাদি। ছোট-বড় সকল বয়সের লোকজনদের উপযোগী খাবার জন্মদিনে রাখতে হয়। পরিবেশনের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে জন্মদিনের মেনু পরিকল্পনা করতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিকেলের অনুষ্ঠানটি বুফে পদ্ধতিতেই পরিবেশন করা হয়। রাতের অনুষ্ঠানে পোলাউ, বিরিয়ানি ইত্যাদি খাবারের আয়োজন হয়। সেজন্য রাতের অনুষ্ঠান বিকেল বেলার অনুষ্ঠানের চেয়ে formal হয়।

জন্মদিন অনুষ্ঠানের উপযোগী খাবারের তালিকা

কেক, মিষ্টি, চটপটি চানাচুর, সিঙ্গারা, সমুচা, কাস্টার্ড, কলা, কমলা, আপেল বা অন্যান্য মৌসুমী ফল, লুচি-নিরামিষ, পারাটা-গোশ্‌ত, পোলাউ, কোরমা, তেহারি, বিরিয়ানি ইত্যাদি জন্মদিনের মেনু-

বিকেল বেলা

সব্‌জি সিঙ্গারা/মাংসের সমুচা
কেক/মিষ্টি
কলা/আপেল
চটপটি
চা/পানীয়

রাতের বেলা

আলু মাংসের রেজালা
তাজা সবজির সালাদ
পারাটা
কেক
ফ্রুট কাস্টার্ড
চা/পানীয়

বিবাহ

বিবাহ একটি সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানটি সাধারণত দিন ও রাত্রি উভয় সময়ে হয়। সে জন্য মধ্যাহ্ন ভোজ ও নৈশ ভোজেরই আয়োজন হয় বিবাহ অনুষ্ঠানে। আর্থসামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে এ অনুষ্ঠানের মেনুতে তারতম্য দেখা যায়। বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বাড়ির ছাদ, বড় মাঠে সামিয়ানা দিয়ে এবং ক্লাবে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। কম সদস্য হলে ঘরেও হয়ে থাকে। তবে বসে খাওয়ার ব্যবস্থাই করা হয় বিবাহ অনুষ্ঠানে। গ্রামাঞ্চলে বিত্তবান পরিবারে গরু জবাই করে মাটিতে পাটি পেতে বসিয়ে অনেক মেহমান খাওয়ানো হয় বিয়ে অনুষ্ঠানে, শহরাঞ্চলের বিবাহ অনুষ্ঠানে টেবিল-চেয়ারে বসিয়ে মেহমান খাওয়ানো হয়। তবে পোলাউ কোরমা, বিরিয়ানি, বোরহানি, কালিয়া, জরদা, ফিরনি ইত্যাদি সাধারণ খাবার। বিবাহ অনুষ্ঠানের উপযোগী খাদ্য তালিকা-

পোলাউ, কোরমা, রেজালা, কালিয়া, কাবাব, বিরিয়ানি, বোরহানি, সালাদ, জরদা, ফিরনি, পান ইত্যাদি।

বিবাহ ভোজের নমুনা

উচ্চ মধ্য বিত্ত পরিবারের

শামি কাবাব
আলু খাসির মাংসের রেজালা
সালাদ
মটর পোলাউ
ফিরনী
পান

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের

আলু মাংসের কালিয়া
সালাদ
সাদা পোলাউ
জরদা ফিরনী
পান

চা-চক্র

ঘরে এবং বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চা-চক্রের ব্যবস্থা থাকে। সাধারণত ভোজের চেয়ে হাল্কা ধরনের খাবার দিয়েই চা-চক্র হয়। বাড়িতে হলে লোকসংখ্যা কম থাকলে অনেক ক্ষেত্রে হাতে তৈরি খাবার দিয়ে চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। কিন্তু কোন সভার পর কিংবা ফাংশন এর পর চা-চক্রের ব্যবস্থাপনায় কেনা খাবার পরিবেশন করা হয়।

চা-চক্রের উপযোগী খাবার - কেক, বিস্কিট, চানাচুর, মিষ্টি, হালুয়া, বিভিন্ন ফল, নুডলস, চটপটি, পেয়াজু, কাস্টার্ড, সিঙ্গারা, সমুচা, কাবাব, চপ ইত্যাদি।

চা-চক্রের মেনু

ঘরোয়া ফাংশনে চা-চক্র

কেক চটপটি/সিঙ্গারা
কলা/কমলা
গাজরের হালুয়া
চা/কফি

বাইরের ফাংশনে চা-চক্র

কেক/বিস্কিট সিঙ্গারা/সমুচা
কলা/কমলা
চানাচুর
চা/কফি

বনভোজন

এটি একটি বাইরের অনুষ্ঠান। খাবার বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে রান্না করা হয়। নতুবা রান্না করে নিয়ে খাওয়া হয়। দুপুরেই এ খাদ্যের আয়োজন করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের উপযোগী খাবার তৈরি করা হয়। মোটামুটি খাদ্যের ৪টি বিভাগ থেকে খাবার নিয়েই মেনু তৈরি হয়। সকাল ও বিকেলের নাস্তাও অনেক সময় সংযোজন করা হয়। মেনুর ধরন সাধারণত লোকসংখ্যা, দূরত্ব, বয়সসীমা (সদস্যদের) ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

বনভোজনের উপযোগী খাবার ঃ বনরুটি, ডিম সেদ্ধ, বার্গার, কাবাব-পারাটা, পোলাউ বিরিয়ানি রোস্ট, ঝালমাংস, তেহারি, জরদা, মিষ্টি, সালাদ, পানীয় ইত্যাদি।

বনভোজনের মেনু

সকালের নাস্তা

বনরুটি ডিমসেদ্ধ/বার্গার
কলা/আপেল
চা/কফি

মধ্যাহ্ন ভোজ

মুরগির রোস্ট
আলু গোশ্‌তের কালিয়া
সালাদ
সাদা পেলাউ
মিষ্টি পানীয়

স্কুল টিফিন

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় স্কুল টিফিন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘ সময়ের জন্য স্কুলে আসে, সকালে তাড়াহুড়ো করে স্কুলে আসে অনেক ছেলে মেয়েরা সেজন্য বাড়ি থেকে ঠিক মত নাস্তা খেয়ে আসেনা। যেসব স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা থাকে সেসব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে টিফিন আনে না। স্কুলের টিফিন খেয়েই ৫-৭ ঘন্টা সময় কাটায়। ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্কুলে টিফিনের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। পরিবেশনের সুবিধার্থে সাধারণত স্কুলের টিফিন কিছুটা শুকনা ধরনের হয়। খাদ্য গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য টাটকা। উৎকৃষ্ট মানের খাবার পরিবেশন করা উচিত। শিশুদের খাবারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ভাল স্বাদযুক্ত রুচিকর খাবার তৈরি করতে হয়। এমন খাবার দিতে হয় যা অধিকক্ষণ পেটে থাকে। পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য ফলমূল ও পানীয় থাকবে মেনুতে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্যাকেটে বা বক্সে পরিবেশন করলে সময় কম লাগে। যে সকল স্কুলে কাফেটারিয়া আছে সেখানে কাফেটারিয়াতে বসে টিফিন খেতে পারে। বেশির ভাগ স্কুলে শ্রেণীতেই টিফিন পরিবেশন করা হয়।

স্কুল টিফিনের উপযোগী খাবার

কেক, সিঙ্গারা, সমুচা, সেদ্ধডিম, বনরুটি, বার্গার, আলুরচপ, সব্জি কাটলেট, কাবাব, পারাটা, মিষ্টি, ফলমূল, ফলের রস (প্যাকেটে) ইত্যাদি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য টিফিনের মেনু

কেক আলুর চপ
কলা/কমলা
অথবা
বার্গার মিষ্টি
ফলের রস

মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য টিফিনের মেনু

বনরুটি সেদ্ধডিম

আপেল/কলা
মিষ্টি
অথবা
কাবাব পারাটা
মিষ্টি
ফলের রস

সারাংশ

জন্মদিন, বিবাহ, চা-চক্র, বনভোজন ইত্যাদি পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মেনু পরিকল্পনার নীতি অনুসরণ করে এসব অনুষ্ঠানের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করতে হয়। অনুষ্ঠানের তারতম্য অনুযায়ী খাবারের মেনু ও ভিন্ন ধরনের হয়। বিবাহ, বনভোজনের মেনু হতে জন্মদিন চা-চক্র, স্কুল টিফিনের মেনুতে হালকা ধরনের খাবার থাকে। পরিবেশনের ধরন এবং প্রস্তুত কারকের দক্ষতা অনুযায়ী মেনুর তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত মেনু তৈরিতে খাদ্যের ৪টি বিভাগের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪

১. নিচের অনুষ্ঠানের জন্য মেনু তৈরি করুন। জন্মদিন, বিবাহ, চা-চক্র, বনভোজন ইত্যাদি।
২. স্কুল টিফিনের গুরুত্ব কি? প্রাইমারি ও মাধমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল টিফিন মেনু তৈরি করুন।

পাঠ- ৯.৫ ঃ খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থায় পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- পরিকল্পনা গ্রহণে দায়িত্ব নেবেন কারা চিহ্নিত করতে পারবেন
- কোন কোন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে তালিকা তৈরি করতে পারবেন
- লিখিত পরিকল্পনা কিভাবে রাখতে হয় সে ব্যপারে বর্ণনা দিতে পারবেন

বিষয়বস্তু

খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা গৃহ এবং গৃহের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে করা হয়। আমাদের দেশে সাধারণ পরিবারে এখনও অধিকাংশ আহার বাড়িতেই গ্রহণ করা হয়। যারা বাইরে কাজ করেন তাঁরা কর্মক্ষেত্রে, হোটেল, রেস্তোরায় আহার করে থাকেন। ছেলে মেয়েরা যারা স্কুল, কলেজে যাচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাদ্য গ্রহণের সুযোগ থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে। হাসপাতালেও খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। ঘরে বাইরে খাদ্য ব্যবস্থাপনার কাজের দায়িত্ব গৃহকর্তী এবং ব্যবস্থাপকই করে থাকেন। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের প্রতিটি ধাপেই প্রয়োজন হয় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের। খাদ্যকে আহার্যে পরিণত করে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিবেশনের ব্যবস্থায় অনেক কাজ নিহিত রয়েছে। ব্যবস্থাপক তার দায়িত্ব কর্তব্যগুলো পালনের মাধ্যমে এ কাজগুলো সমাধা করেন। যে কাজই করা হোক না কেন তার প্রাথমিক পরিকল্পনা থাকলে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া সহজ। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে মান ভাল হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো যায়। খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা শুধুমাত্র গৃহিণী এবং ব্যবস্থাপক দিয়ে সম্ভব হয় না। পরিবারের অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি সহায়তা করবেন।

খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিকল্পনা করা হয়-

১. **মেনু তৈরি করা ঃ** খাদ্য ব্যবস্থাপক অনুষ্ঠানের সময়সূচি নির্ধারণ করে কি খাওয়ানো হবে তালিকাভুক্ত করবেন। মেনু পরিকল্পনার নীতি অনুসারে মেনু তৈরি করতে হয়। মেনু পরিকল্পনার সময় খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা ভাল। মেনুর কয়েকটি কপি প্রয়োজনীয় জায়গায় সরবরাহ করতে হবে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য বিশেষ করে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের স্থানে। মেনু কার্ডে ব্যবস্থাপকের সই থাকবে।

২. **অর্থ ব্যয়ের পরিমান নির্ধারণ করা ঃ** খাদ্য ব্যবস্থায় কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যাবে তা জানতে হবে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ যেমন খাবার কেনা, ঘর সাজানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়। অর্থের উপর নির্ভর করে খাদ্য কোথায় কেনা কাটা করা হবে।

৩. **খাদ্য ক্রয় করা ঃ** খাদ্য তালিকা ও খাওয়ার সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী কি পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী কেনা হবে তা পূর্বেই স্থির করে নিতে হয়। কোন দোকানে কেনা কাটা করা হবে তা জানা থাকলে সময় কম লাগে। মানসম্মত খাদ্য কেনা কাটার জন্য কেনা কাটায় পারদর্শী লোককেই দায়িত্ব দিতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠানের জন্য খাদ্য কেনার দায়িত্বে নির্ধারিত ব্যক্তি থাকেন। খাদ্য কেনার জন্য তালিকা তৈরি করে নিতে হবে। সেখানে মেনু অনুযায়ী খাদ্য দ্রব্যের নাম, পরিমাণ ও সম্ভাব্য মূল্য বা approximate cost লেখা থাকবে।

৪. **খাদ্য প্রস্তুতের পরিকল্পনা ঃ** প্রতিষ্ঠানে খাদ্য প্রস্তুতের জন্য মেনু কার্ডে খাদ্য কীভাবে প্রস্তুত করা হয় তার কিছুটা নির্দেশ থাকে। যেমন মুরগির রোস্ট অথবা মুরগির কোরমা এভাবে মেনুতে লিখা থাকে। তদুপরি রেসিপি কার্ড তৈরি করতে হয় সুষ্ঠুভাবে খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য। রেসিপি অনুযায়ী বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতের দায়িত্ব বাবুর্চি বা প্রস্তুতকারকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। তারা যেন অগ্রিম সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সে সুযোগ ও সময় দিতে হবে। মেনু ও রেসিপি দেখে খাদ্য প্রস্তুতের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেবেন। কারণ নির্দিষ্ট খাদ্য প্রস্তুতের জন্য রান্নার বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি আবলম্বন করতে হয়। কে কি কাজ করবে সে জন্য কাজের তালিকা (work sheet) তৈরি করতে হবে প্রত্যেকের নামের বিপরীতে এবং সেটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

৫. **খাদ্য পরিবেশন পরিকল্পনা ঃ** কোথায় খাদ্য পরিবেশন করা হবে সেখানে টেবিল সাজানো, টেবিল সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা তৈরির কাজ পরিবেশনের দায়িত্ব কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। কি পদ্ধতিতে খাবার পরিবেশন করা হবে সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে আগেই ঠিক করতে হবে। এসব পরিকল্পনা লিখিতভাবে

রাখতে হবে তাহলে সঠিক নিয়মে সব কাজ সম্পন্ন হয়। কর্মীরা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে। তবে সকল ব্যবস্থাই কর্মীদের পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে করতে হয়। নতুবা কাজের মান উন্নত হয় না।

৬. **খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন ব্যবস্থা তদারকি করা ঃ** সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করার জন্য দু-একজনকে সর্বোপরি দায়িত্ব দিতে হয়। কোন সমস্যা দেখা দিলে ব্যবস্থাপকের অবর্তমানে তারাই সমাধা করবেন। এতে কর্মীদের মধ্যে একটা Co-ordination থাকে। তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকও লক্ষ্য করবেন। কারণ বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করা ব্যবস্থাপনার একটি লক্ষ্য।

সারাংশ

ঘরে বাইরে যেখানেই খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ পরিকল্পনার গুরুদায়িত্ব গৃহকর্তী এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককেই নিতে হয়। উন্নতমানের খাদ্য পরিবেশন, সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন ও কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গঠনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োজন। খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয়-

১. মেনু বা খাদ্য তালিকা তৈরি করা

২. অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে কীভাবে ব্যয় করা হবে?

৩. কীভাবে খাদ্য কেনাকাটা করা হবে?

৪. কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করা হবে?

৫. কীভাবে খাদ্য পরিবেশন করা হবে?

৬. কাজ পরিদর্শন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫

খালি জায়গা পূরণ করুন-

১. ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজের প্রতিটি ধাপেই প্রয়োজন হয় ________________ ও ________________ গ্রহণের।

২. খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র ______________ ও ____________ দিয়ে সম্ভব হয় না।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার গুরুত্ব কি?

২. কোন কোন বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ- ৯.৬ ঃ খাদ্য প্রস্তুত ঃ রেসিপি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- রেসিপির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- রেসিপির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- রেসিপি বুঝার নির্দেশাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- রেসিপি লেখার নিয়ম জেনে খাবারের রেসিপি লিখতে পারবেন

বিষয়বস্তু

বেশিরভাগ খাবারই রান্না করে খেতে হয়। কিছু সব্জি ও ফলমূল কাঁচা খাওয়া হয় সালাদ ও টাটকা ফল হিসেবে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের রুচির। এর সঙ্গে আবিষ্কৃত হচ্ছে নানা প্রকার খাবার তৈরি পদ্ধতি। সৃজনশীল মানুষ রান্নাকে বই পুস্তকের আওতায় এনে রন্ধনজ্ঞানের সীমাকে বিস্তৃত করেছে। সেজন্য একদেশী খাবারের প্রচলন অন্য দেশে হচ্ছে। যেমন ইন্ডিয়ান, চায়নীজ, থাই, আমেরিকান ও ইটালীয়ান খাবারের কদর বাংলাদেশেও কম নয়। আজকাল বই দেখে দেশি বিদেশী খাবার প্রস্তুত করা অনেকেরই শখ। বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রেও রন্ধন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে উপার্জন করছে।

রেসিপি

রেসিপি এমন একটি রন্ধন সম্বন্ধনীয় তালিকা যা পড়ে সহজেই খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। রেসিপির কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন কোন খাদ্য প্রস্তুতের জন্য উপকরণ, প্রয়োজনীয় পরিমাণ, খাবার প্রস্তুতের পদ্ধতি, পরিবেশন সংখ্যা ও পরিবেশনের প্রকার ইত্যাদি।

খাদ্য প্রস্তুতে রেসিপির গুরুত্ব

১. খাদ্য প্রস্তুতকারকের জন্য রেসিপি একটি গাইডস্বরূপ;
২. যে কোন নতুন খাবার রেসিপি দেখে রান্না করা যায়;
৩. রেসিপিতে উপকরণের মাপ ও প্রস্তুতপ্রণালী দেয়া থাকে সেজন্য খাবারের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ স্বাভাবিক থাকে;
৪. রেসিপির মাপ অনুযায়ী খাবার প্রস্তুত করা হলে খাবারের অপচয় হয় না, উদ্বৃত্ত থাকে না এবং কমও পড়ে না। কারণ সেখানে পরিবেশন সংখ্যা লেখা থাকে;
৫. রেসিপিতে লেখা থাকে কোন খাবার গরম বা কোন খাবার ঠান্ডা পরিবেশন করতে হয়। কীভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হয় সে নির্দেশ ও রেসিপিতে দেয়া থাকে;
৬. খাদ্য ক্রয়ের জন্য রেসিপির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে; যেমন- খাদ্য নির্বাচন, পরিমাণ নির্ধারণ রেসিপি অনুযায়ী করা সহজ।

রেসিপি বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়

রেসিপি বুঝতে হলে নিচের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখা প্রয়োজন।

মাপ ও ওজন ঃ খাবার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মাপ বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে দেয়া থাকে। যেমন কিলোগ্রাম, গ্রাম, লিটার ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। অনেক সময় মাপার একক হিসাবে কাপ, চামচ, দাগকাটা পাত্র ব্যবহৃত হয়।

খাবার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম ঃ কাটার জন্য ছুরি, বটি, দা, কুরুনি ছাড়াও বিভিন্ন রকম গ্রেটার, বিস্কিট কাটার নক্সা, ফলকাটার মেশিন খাদ্য প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহার করতে হয়।

মেশাবার জন্য বিটার, জুসার মেশিন, চপার, গ্রাইন্ডার এ ধরনের ইলেক্ট্রিক ও নন ইলেক্ট্রিক মেশিনের প্রয়োজন হয়। খাবার চুলায় রান্না করার জন্য প্রেসার কুকার, ওভেন, ননষ্টিক ফ্রাইপেন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পাত্রের প্রয়োজন আছে।

বিভিন্ন প্রকার মসলা ঃ রান্নায় ব্যবহৃত সাধারণ উপকরণ ছাড়াও কিছু মসলা বা উপকরণ আছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখলে রেসিপি অনুযায়ী খাবার প্রস্তুত করা সহজ হয় যেমন- বেকিং পাউডার, টেস্টিং সল্ট, বিভিন্ন প্রকার সস, জায়ফল, জয়ত্রী, শাহজীরা, পোস্ত দানা, বিভিন্ন প্রকার এসেন্স ইত্যাদি।

রান্নার কৌশল ও পদ্ধতি ঃ কি কৌশলে খাবার কাটা হবে, মেশানো হবে বা প্রক্রিয়াজাত করা হয় এ সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হয়। খাদ্য রান্নার বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন- সেকা, টালা, ভাজা, সেদ্দ, ঝলকানো ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকলে রেসিপি অনুসরণ করে খাবার প্রস্তুত করা যায়।

রেসিপি লেখার নমুনা নিচে প্রদত্ত হল-

গরুর মাংসের কালিয়া

উপকরণ	**পরিমাণ**	**উপকরণ**	**পরিমাণ**
মাংস (গরু)	১ কেজি	জিরা বাটা	২ চা.চা.
তেল	$\frac{1}{2}$ কাপ	ধনে বাটা	২ চা.চা.
পেঁয়াজ বাটা	$\frac{1}{4}$ কাপ	গো. মরিচ বাটা	$\frac{1}{2}$ চা.চা.
আদা বাটা	১ টে. চা.	দারচিনি ২ সে.মি.	২ টুকরা
রসুন বাটা	২ চা.চা.	এলাচ	৩ টি
হলুদ বাটা	১ চা.চা.	তেজপাতা	১ টি
মরিচ বাটা	১ চা.চা.	আলু	$\frac{1}{2}$ কেজি
		লবণ	প্রয়োজন মত

রান্নার পদ্ধতি

১. মাংস টুকরা করে ধুয়ে নিতে হবে।
২. আলু ও গরম মসলা ছাড়া $\frac{1}{4}$ কাপ তেল সহ সব উপকরণ মাংসে দিয়ে ভালভাবে মাখাতে হবে।
৩. মাংসের সম পরিমাণ পানি দিয়ে চুলায় মাংস তুলে দিতে হবে এবং কষাতে হবে মৃদু তাপে।
৪. আলু খোসা ছড়িয়ে দুটুকরা করে বাকি তেলে ভেজে মাংসে দিয়ে কিছুক্ষণ কষাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলু ভেঙ্গে না যায়। গরম মসলাগুলো দিতে হবে।
৫. পানি শুকিয়ে ভুনা গন্ধ বের হলে আলু ও মাংস ডুবে এমন আন্দাজ গরম পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে ৮-১০ মিনিট ফুটাতে হবে। আলু-মাংস সেদ্ধ হলে মৃদু আঁচে কিছুক্ষণ দমে রাখতে হবে।
৬. সাদা পোলাউর সাথে সালাদ দিয়ে মাংসের কালিয়া পরিবেশন করা হয়।
৭. এ পরিমাণ মাংস ৪ থেকে ৫ জনকে জনকে পরিবেশন করা যাবে।

সারাংশ

রেসিপি রন্ধন সম্মন্ধনীয় তালিকা। রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, পরিমাণ, রান্নার পদ্ধতি, পরিবেশন সংখ্যা, পরিবেশন পদ্ধতি রেসিপিতে লেখা থাকে। রেসিপির সুবিধা হল - রেসিপি দেখে সহজে খাবার প্রস্তুত করা যায়। প্রস্তুত খাদ্য গুণমানসম্পন্ন হয়, খাদ্যের অপচয় হয় না, খাদ্য পরিবেশনের নির্দেশনা থাকে। খাদ্য ক্রয়ের সুবিধা হয় ইত্যাদি। রেসিপি ব্যবহার করলে খাদ্য মাপার একক, রান্নার বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম, রান্নার কৌশল-পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকার মসলা সম্পর্কে ধারণা হয়। রেসিপেতে খাদ্য উপকরণ, পরিমাণ রান্নার পদ্ধতি ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে লিখতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যে তালিকায় খাদ্য উপকরণ, পরিমাণ, রন্ধন পদ্ধতি, পরিবেশন সংখ্যা ও পরিবেশন পদ্ধতি লেখা থাকে তাকে কি বলে?

ক. মেনু
খ. রেসিপি
গ. খাদ্য তালিকা
ঘ. খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী

২। খাদ্য কাটার সরঞ্জাম হল-

ক. কাঁটা চামচ
খ. গ্রেটার
গ. বিটার
ঘ. প্রেসার কুকার

রচনামূলক

১. রেসিপি কাকে বলে? রেসিপি ব্যবহারের উপকারিতা লিখুন।
২. রেসিপি বুঝার জন্য কোন বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার? একটি খাবার প্রস্তুতের রেসিপি লিখুন।

পাঠ– ৯.৭ ঃ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাবার পরিবেশনে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় কি তা বর্ণনা করতে পারবেন
- আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশনের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন
- আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশ ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

সুন্দর পরিবেশে সুষ্ঠু খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থার উপর খাওয়ার তৃপ্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। খাবার পরিবেশনের সাথে পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক আচার আচরণ, আতিথেয়তার প্রকার ইত্যাদি জড়িত। জাতিগতভাবে, সামাজিকভাবে ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা করা হয়।

আকর্ষণীয় পরিবেশন জাঁকজমকের সাথে করা যায়। আবার সাধারণভাবে রুচিসম্মত উপায়েও করা যায়। তবে যে ভাবেই করা হোক না কেন খাদ্য ব্যবস্থাপকের রুচি, প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত অভিরুচি, নীতিবোধ ও শিল্পকলার প্রভাব পড়ে। খাদ্য পরিবেশন এমন একটা বিষয় যা কোন অবস্থাতেই বর্তমান যুগে হেলাফেলা করা যায় না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্পকলার সংযোগে পরিবেশনকে এখন প্রধান্য দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে খাদ্য পরিবেশ দুভাবে করা হয়; যেমন- আনুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন ও অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন। নিচে বিবরণ দেয়া হল।

আনুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন

কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য যে ভোজের আয়োজন করা হয় তাকে আনুষ্ঠানিক ভোজ বলে। সাধারণত: সরকারী অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠান, দেশী-বিদেশী বিশেষ ব্যক্তিত্বের আপ্যায়ন ইত্যাদিতে আনুষ্ঠানিকভাবে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। আনুষ্ঠানিক ভোজে খাদ্য পরিবেশনের জন্য প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এসকল পর্যায়ে জ্ঞান দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এবং ডিগ্রীও দেয়া হচ্ছে।

নিচে আনুষ্ঠানিক ভোজে খাদ্য পরিবেশনের নিয়ম বর্ণনা করা হল-

মেনু কার্ড তৈরি ঃ আনুষ্ঠানিক ভোজে কি খাবার পরিবেশন করা হবে তা কার্ডে লিখে খাদ্য পরিবেশন টেবিলে এমনভাবে রাখতে হয় যেন সব দিক থেকেই দেখা যায়। মেনু বোর্ডে লিখে রাখা হয় কোন প্রতিষ্ঠান বা হোটেলের অনুষ্ঠানে।

অতিথির তালিকা ঃ প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথির নামের তালিকা বোর্ডে টানিয়ে দেয়া হয়। নিমন্ত্রণকারী বা হোস্ট/হোস্টেস (Host/Hostess) এর নামও লিস্টে বা তালিকায় লেখা থাকে।

টেবিল সাজানো ঃ আনুষ্ঠানিক ভোজে পদমর্যাদা অনুযায়ী চেয়ার টেবিল সাজানো হয়। প্রধান অতিথি বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জন্য আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা থাকবে। অন্যান্য অতিথিদের জন্য আলাদা করে টেবিল সাজানো হয়। বড় জায়গা হলে হোটেলের মত ছোট টেবিলে ৪ জন করে নতুবা কয়েকটা টেবিল একত্রিত করে লম্বালম্বিভাবে ৮/১০ জনের বসার ব্যবস্থা করা যায়। প্রধান অতিথির জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার থাকবে তার বিপরীতে হোস্ট বা হোস্টেস এর জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার থাকে। আনুষ্ঠানিক ভোজের বিশেষত্ব হচ্ছে প্রত্যেক অতিথির জন্য এককভাবে প্রত্যেকটি খাবার পরিবেশনের জন্য একটি একক (Unit) টেবিলে চেয়ারের সম্মুখে সাজান থাকবে। তবে পরিবেশনকারী দিয়ে খাবার পরিবেশন করা হলে সেখানে খাবারের মেনু অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্লেট, ডিস, বাটি চামচ ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে টেবিলে দেয়া হয়। কাটা চামচ দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে ন্যাপকিন বা হাত মোছার জন্য টিসু পেপার প্লেটের পাশে রাখা উচিত। পানির গ্লাস প্লেটের ডান দিকে রাখতে হয়।

পরিবেশন টেবিলের কেন্দ্রীয় সজ্জা ঃ টেবিলের মাঝখানে ফুল লতাপাতা, সব্জি-ফলের সালাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সজ্জা করা হয়। ফুল সাধারণত নীচু ফুলদানিতে অথবা টেবিল ক্লথের সাথে টেপ অথবা পিন দিয়ে বিছিয়ে সাজালে অতিথিদের এপাশে ওপাশে দেখার বিঘ্ন ঘটে না। রাতের অনুষ্ঠানে মোমের আলো টেবিলের মাঝখানে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য রাখা যায়।

পরিবেশনের নিয়ম নীতি

অতিথি আসার কিছুক্ষণ আগে অথবা ভোজ শুরু হওয়ার ৫/১০ মিনিট আগে সালাদ এবং পানি টেবিলে পরিবেশন করা হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পানি টেবিলে পড়ে না যায়। প্রধান অতিথি চেয়ারে বসার সাথে সাথে অন্যান্য টেবিলেও আমন্ত্রিত অতিথিগণ নির্ধারিত জায়গায় বসবেন। পরিবেশনকারীগণ প্রত্যেক টেবিলের পাশে দাঁড়াবেন নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য। পরিবেশনকারীর সংখ্যা বেশি থাকলে এক টেবিলের জন্য দু/তিন জন পরিবেশনকারী থাকবেন। কেউ টেবিল থেকে পরিত্যক্ত সরঞ্জাম তোলার জন্য এবং কেউ খাদ্য পরিবেশন করার জন্য অনেক সময় আনুষ্ঠানিক ভোজে টেবিলে হাত ধোয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। বাটিতে জগ বা গ্লাসে পানি নিয়ে পরিবেশনকারী অতিথিদের হাত ধোয়াবেন।

প্রধান অতিথির টেবিল হতে প্রথম খাদ্য পরিবেশন শুরু করা হয়। সেখান হতে ক্রমান্বয়ে ডান দিকে অগ্রসর হতে হয়। খাবার টেবিলে প্রথমে অতিথির প্লেটে খাবার দিতে হয়। অতিথির বাম পাশে দাঁড়িয়ে ডান হাতে খাবারের ডিশ রেখে বাম হাতে চামুচ দিয়ে খাবার পরিবেশন করবেন। এটাকে বলা হয় বাম হাতে পরিবেশন বা Left hand service। খাবার খাওয়া শেষ হলে যেমন ভাত খাওয়া শেষ হলে প্লেট, ময়লা ফেলার প্লেট, খালি বাটি ইত্যাদি অতিথির বাম পাশ থেকে তুলে পেছনে দাঁড়ানো পরিবেশনকারীর ট্রেতে তুলে দিতে হবে। মিষ্টি-ফিরনি বা Dessert খাওয়ার জন্য চামচ, বাটি ডান পাশে ডান হাতে টেবিলে দিতে হবে এবং ডান পাশেই মিষ্টি চা এবং পানি পরিবেশন করতে হয়। খাওয়া শেষে এসকল কাপ, বাটি এবং গ্লাস অনুরূপভাবে ডান পাশ থেকে তুলে নিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে খাবার পরিবেশন ও তোলার সময় সরঞ্জামাদির শব্দ যেন না হয়। পানি, ঝোল ও খাবার ইত্যাদি যেন টেবিল বা অতিথির গায়ে পড়ে না। শুধুমাত্র Decoration এর জিনিস ছাড়া খাওয়ার পর সব সরঞ্জাম তুলে টেবিলে পরিষ্কার করতে হয়। বাড়িতে যদি আনুষ্ঠানিক ভোজের ব্যবস্থা করা হয় অতিথি আপ্যায়ন ঠিক হচ্ছে কিনা এটা পরিবারের লোকদের ঘুরে ঘুরে দেখা শোনা করতে হয়। গ্লাসে পানি শেষ হয়ে গেলে পরিবেশনকারী আবার গ্লাসে পানি ঢেলে দেবেন। হাত ধোয়া ও মোছার জন্য টেবিলে কিংবা নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যবস্থা থাকবে। খাবার শেষে পান, পানীয় ইত্যাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে।

ভোজ অনুষ্ঠানে শেষে প্রধান অতিথি এবং অন্যান্যদের বিদায় দেয়ার জন্য হোস্ট কিংবা হোস্টেস তাদের এগিয়ে দিয়ে আসবেন।

অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন

সাধারণত খাবার যখন টেবিলে সাজান হয় বা খাওয়ার জন্য দেয়া হয় সেটাই পরিবেশন। ঘরোয়া অনুষ্ঠান যেমন আকিকা, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা আত্মীয়স্বজনদের কোন কোন উৎসবে খাওয়ানোর জন্য অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা থাকে। তবুও লক্ষ্য রাখা উচিত সাধারণ খাওয়ার চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ধরনের খাওয়ার মেনু যেন থাকে এবং অতিথি থাকেন সেজন্য খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। প্রধান কোন অতিথি না থাকলে লোক সংখ্যা জায়গার তুলনায় বেশি হলে অনানুষ্ঠানিক ভাবেই খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। বুফে খাদ্য পরিবেশন অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশনের একটি উদাহরণ।

বুফে খাদ্য পরিবেশনে অতিথি আপ্যায়ন

বুফে খাদ্য পরিবেশন হল মেনু অনুযায়ী সব খাবার এবং খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম টেবিলে সাজানো থাকে। খাদ্য গ্রহণকারীগণ নিজেদের সুবিধামত খাবার প্লেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে খাবেন। টেবিল থেকে কিছু দূরত্ব বজায় রেখে চেয়ার দেয়া থাকে সেটা একই রুমে কিংবা পাশের রুমে, বারান্দা ও লনে হতে পারে। প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন জায়গায় টেবিল দিয়ে বুফে খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

বুফে খাদ্য পরিবেশনে টেবিল সজ্জা

বুফে টেবিলের সাজসজ্জা নির্ভর করে মেনুতে কি কি খাবর আছে তার উপর। সাধারণত প্রধান খাদ্যের পাশে প্লেট একসাথে সাজান থাকে। লোক সংখ্যা বেশি হলে টেবিলের দু দিকে প্লেট এবং প্রধান খাবার রাখা হলে খাবার নিতে সুবিধা হয়।

প্লেটের পাশেই চামচ, কাটা, ন্যাপকিন ইত্যাদি আকার আকৃতি অনুযায়ী দেয়া হবে। প্রত্যেকটি খাবারের ডিসের পাশে খাবার তোলার জন্য উপযোগী চামচ, কাটা ছুরি দেয়া থাকে। বুফে টেবিলেও ফুলসাজান থাকে। চামচ, ন্যাপকনি ইত্যাদি সামগ্রী সুন্দর করে সাজিয়ে টেবিলে সৌন্দর্য বাড়ান যায়। পানি, মিষ্টি জাতীয় খাবার (Dessert), চা-কফি ইত্যাদি পরিবেশের জন্য কাছাকাছি অন্য টেবিলের ব্যবস্থা থাকলে খাদ্য পরিবেশন সহজ হয়। খাবারের একটা কোর্স শেষ করে সুবিধামত অন্য খাবার খেতে হয়। টেবিলেও গ্লাস, জগ, অন্যান্য পানীয়, কাপ-পিরিজ, চামচ, মিষ্টি খাওয়ার প্লেট-বাটি দেয়া থাকবে। অতিথিরা নিজের পছন্দ করা খাবার তুলে নেবেন।

পরিবেশন নীতি

বুফে পরিবেশনের নিয়ম স্বস্ব পরিবেশন টেবিল থেকে অতিথিরা একে একে প্লেট এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে প্রধান খাবার ও অন্যান্য খাবার তুলে ডানদিকে এগিয়ে যাবেন যেন অন্যরা সুবিধা মত খাবার নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন। যদি কোন বিশেষ খাবার পরিবেশনকারী দিয়ে পরিবেশন করতে হয় তাঁকে টেবিলের মাঝে দাঁড়িয়ে খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে। তিনি সবার প্লেটে খাবার তুলে দেবেন। সব টেবিলের পাশে দু-একজন পরিবেশনকারী থাকবেন। কোন খাবার শেষ হলে সেটা আবার নিয়ে আসবেন এবং টেবিল এলোমেলো হলে খাবারগুলো গুছিয়ে দেবেন। অনেক সময় বয়স্ক ব্যক্তিগণ খাবার একবার নিয়ে বসলে তাঁদের সামনে ডিস ধরবেন বা বাড়তি খাবার পরিবেশনকারী তাঁদের প্লেটে তুলে দেবেন। এসব কাজগুলো পরিবেশনকারী ঘুরে ঘুরে দেখবেন।

খাওয়ার পর প্লেট রাখার জন্য একটা জায়গা থাকবে অতিথিরা সবাই প্লেট সেখানে রাখবেন এবং পরিবেশনকারী সেগুলো সরিয়ে দেবেন ট্রেতে করে।

সারাংশ

খাবার পরিবেশনের সাথে পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, ব্যবস্থাপকের রুচি, প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কিত। অনুষ্ঠানের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা দুপ্রকার। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পারিবেশন। আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সাধারণত টেবিল চেয়ারে বসে খাদ্য গ্রহণ করা হয়। পরিবেশনকারী খাদ্য পরিবেশন করেন। সরকারী বা অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে পদমর্যাদা অনুযায়ী বসার ব্যবস্থা থাকে। নিয়মনীতি অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশন করা হয়। আনুষ্ঠানিক পরিবেশনের সতর্কতাগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে খাবার পরিবেশন করতে হয়। আকিকা, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা আত্মীয়স্বজন বাড়িতে দাওয়াত দিলে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। বুফে পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন অনানুষ্ঠানিক খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থার উদাহরণ। জায়গা কম কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি হলে বুফে পদ্ধতিতে খাবার পরিবেশন করা হয়। এ পদ্ধতিতে টেবিলে খাবার এবং খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম টেবিলে দেয়া থাকে। অতিথিরা নিজেদের পছন্দমত খাবার তুলে দাঁড়িয়ে বা বসে খেয়ে থাকেন। পরিবেশনকারী প্রয়োজনবোধে খাবার দেয়া, তুলে নেয়া ইত্যাদি কাজে সাহায্য করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭

রচনামূলক প্রশ্ন ৯.৭

১। অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক ভোজের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বর্ণনা করুন।

২। আনুষ্ঠানিক ভোজে কীভাবে নিমন্ত্রিত অতিথি আপ্যায়ন করা যায় বর্ণনা করুন।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ৯

অনুশীলনী- ৯.১ ঃ ১। খ ২। খ

অনুশীলনী- ৯.২ ঃ ১। বিজ্ঞানসম্মত ২। চাহিদা, ব্যবস্থাপনার ৩। স্ত্রী-পুরুষ, পেশার ভিন্নতা
৪। শাক-সবজি, ফলমূল, কম চর্বিযুক্ত

অনুশীলনী- ৯.৩ ঃ ১। গ ২। গ

অনুশীলনী- ৯.৪ ঃ ১। পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ২। গৃহিণী ও ব্যবস্থাপক

অনুশীলনী- ৯.৫ ঃ ১। খ ২। খ

ইউনিট ১০

খাদ্য সংরক্ষণ

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি ষড়ঋতুর দেশ, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ও শাক সব্‌জি পাওয়া যায়। টাট্‌কা তাজা ঋতুর ফলমূল ঋতুতেই সস্তা থাকে। এসব টাট্‌কা ফলমূল শাক সব্‌জি সময়মত সংরক্ষণ করলে পুষ্টিমান বজায় থাকে। দেশের যে কোন অভাবে বা দুর্ভিক্ষের সময় সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে খাদ্য ঘাটতি বা অপুষ্টির অভাব পূরণ করা যায়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে অনেক সময়ে উৎপাদন ব্যহত হয়। সেসব ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্যও খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্য সংরক্ষণের সময় মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। খাদ্য সংরক্ষণের পূর্বে খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে অধিক সচেতন হতে হবে। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ জেনে খাদ্য সংরক্ষণ করলে সবদিক থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আধুনিক প্রযুক্তিগুলো জানা এবং প্রয়োগ করা আবশ্যক। খাদ্য সংরক্ষণে যত্নবান হলে দেশকে খাদ্যের অপচয় ও জনগণকে অপুষ্টির হাত থেকে বাঁচানো সহজতর হবে।

খাদ্য সংরক্ষণ বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি খাদ্য যাতে পচে নষ্ট না হয় সেজন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণাগুণ অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখা যায় তাকেই সংরক্ষণ বলা হয়। খাদ্যকে পচনশীলতা অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

খাদ্য	
সহজে পচনশীল খাদ্য (২৪ ঘন্টার মধ্যে পচন ধরে যেসব খাদ্য) মাছ, মাংস, শাক-সব্‌জি ও ফলমূল ইত্যাদি	অপচনশীল খাদ্য (যেসব খাদ্য সহজে পচন ধরে না) চাল, ডাল, গম, আলু, শুকনো মরিচ, হলুদ, আদা, রসুন, জিরা, ধনে ইত্যাদি

খাদ্যের পচনশীলতার কারণ ও প্রকৃতি জেনে আমরা ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। কিছু কিছু খাদ্যবস্তুকে আমরা কতকগুলো সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে গৃহেই সংরক্ষণ করতে পারি। পারিবারিক চাহিদা মিটানোর পরে সেগুলো আমরা ঘরে তৈরি সংরক্ষিত খাদ্য হিসেবে বাজারে ছাড়তে পারি, যদি সংরক্ষণের উপায়টি নির্ভরযোগ্যতা লাভ করে তবে সেগুলো অচিরেই চাহিদা বাড়বে। এতে করে গৃহিণীরা বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারেন।

এই ইউনিটকে আলোচনার সুবিধার্থে সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ- ১০.১ ঃ খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব
পাঠ- ১০.২ ঃ খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ
পাঠ- ১০.৩ ঃ খাদ্য সংরক্ষণের নীতি
পাঠ- ১০.৪ ঃ খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ তাপ প্রয়োগ
পাঠ- ১০.৫ ঃ খাদ্য সংরক্ষণ বরফ জমিয়ে এবং রোদে শুকিয়ে
পাঠ- ১০.৬ ঃ খাদ্য সংরক্ষণ ঃ লবণ, চিনি ও তেলে সংরক্ষণ
পাঠ- ১০.৭ ঃ গৃহে খাদ্য সংরক্ষণ ঃ আমসত্ত্ব, তেঁতুলের আচার, জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, স্কোয়াস, পিকেলস্‌ ও লেবুর জারক

পাঠ- ১০.১ ঃ খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্য সংরক্ষণের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- খাদ্য সংরক্ষণের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন

যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে কতগুলো উদ্দেশ্য থাকে। সে সব উদ্দেশ্যগুলো মানব কল্যাণে নিয়োজিত হলেই তা সামাজিকভাবে গৃহীত হয়। আমাদের খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অতিমানব কল্যাণে নিয়োজিত। সেজন্যই এর গুরুত্ব সবার উপরে স্বীকৃত।

যে কোন দেশেই প্রথমে খাদ্য সংরক্ষণ করার গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের খাদ্য ঘাটতি ভবিষ্যতের অভাব পূরণ ও খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য। তারপর গুরুত্ব দেয়া হয় অতিরিক্ত খাদ্য শস্য মজুত রেখে সু-সংরক্ষণের মাধ্যমে তা বিদেশে রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা এ ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে খাদ্য সংরক্ষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে সে সব দেশের সরকারের পক্ষে সরকারী ভাবে খাদ্য সংরক্ষিত না হলে, কালো ব্যবসায়ীরা দুর্যোগের ও দুর্ভিক্ষের সময় জনগণকে উচ্চমূল্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে বাধ্য করে।

খাদ্য বস্তু সংরক্ষিত হলে খাদ্যমূল্যও বজায় থাকে ফলে জনগণ অপুষ্টিতে বা পুষ্টিহীনতার হাত থেকে রক্ষা পায়। তা ছাড়া সব ঋতুতে সব রকম খাদ্য বস্তু চাইলে পাওয়া যায় না যদি খাদ্য সংরক্ষণ করা না হয়।

সবচেয়ে বড় কথা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো খাদ্য সংরক্ষণের ফলেই তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পাঠিয়ে তাদেরকে খাদ্যাভাব থেকে প্রতিবছরই রক্ষা করে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া একদেশের খাবার অন্যদেশে আসতে পারা সম্ভব হত না। আজকাল সংরক্ষণ পদ্ধতি যত শক্তিশালী হচ্ছে পৃথিবীতে খাদ্যভাব তত বেশি কমে যাচ্ছে। খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত হলে খাদ্য দ্রব্যের দামও কমে আসবে। নিম্নবিত্তের লোকেরা ও ফলমূল ক্রয়ের ক্ষমতা রাখবে। মোটকথা বিশ্ব স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সংরক্ষণের গুরুত্ব অধিক। সংক্ষেপে বলা যায় খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব দেয়া হয় পাঁচটি কারণে ঃ

১) ব্যাধি সৃষ্টিকারী জীবাণুর হাত থেকে সংরক্ষিত খাদ্যকে রক্ষা করা;
২) রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ করে খাদ্যকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা;
৩) সংরক্ষিত খাদ্যের পুষ্টি মূল্য বজায় রাখা;
৪) দুর্যোগ দুর্ভিক্ষে খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখা;
৫) বিশ্ব স্বাস্থ্য রক্ষায় সংরক্ষিত খাদ্যকে ব্যবহার করা।

১) **ব্যাধি সৃষ্টিকারী জীবাণুর হাত থেকে সংরক্ষিত খাদ্যকে রক্ষা করা ঃ** খাদ্য যেমন তেমনভাবে সংরক্ষণ করা উচিত নয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্যের মধ্যে যেসব জীবাণু থাকে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২) **রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ করে খাদ্যকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা ঃ** সংরক্ষণের পরে খাদ্যের আসল রং, বর্ণ, গন্ধ যত নষ্ট হয় ততই সংরক্ষিত খাদ্যের চাহিদা কমে যায়। কারণ লোকে যে কোন খাদ্য বস্তুকে তার নিজস্ব রং ও বর্ণে দেখতে চায়। সেজন্য খাদ্য সংরক্ষণের সময় খাদ্যের রং, বর্ণকে যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অনেক সময় রং ও বর্ণ ও আকৃতি যথেষ্ট নষ্ট হবার সম্ভবনা থাকে। সেসব সতর্কতা অবলম্বন করে খাদ্যকে সংরক্ষণ করা হয়।

৩) **সংরক্ষিত খাদ্যের পুষ্টি মূল্য বজায় রাখা ঃ** সাধারণভাবে রাখলে খাদ্যের পুষ্টি মূল্য সহজে নষ্ট হয়ে যায়। তাই খাদ্য সংরক্ষণে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত যাতে খাদ্যের পুষ্টিমান যথাসম্ভব বজায় থাকে। সেজন্যই খাদ্য সংরক্ষণ এত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

৪) **দুর্যোগে দুর্ভিক্ষে খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখা ঃ** খাদ্য সংরক্ষণ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি আর্শীবাদ। সঠিকভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংরক্ষিত থাকলে দেশের যে কোন দুর্যোগ ও সংকটকালে সংরক্ষিত খাদ্যবস্তু স্বস্ব গুণেমানে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানো যায়।

৫) **বিশ্ব স্বাস্থ্য রক্ষায় সংরক্ষিত খাদ্যকে ব্যবহার করা ঃ** আমাদের একটিই বিশ্ব, সবাই আমরা একই বিশ্বের অধিবাসী। তাই আমরা যখন যার যা কিছু প্রয়োজন হবে তাই দিয়ে সাহায্য করব। বিশ্বের যে কোন দেশের যে কোন সময় খাদ্য সংকটে প্রত্যেক দেশ সংরক্ষিত খাদ্য সরবরাহ করে সাহায্য করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে এই নীতি বিশেষভাবে কার্যকরী হচ্ছে।

সারাংশ

খাদ্য সংরক্ষণ দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা দেশে বিদেশে খাদ্য সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করতে পারি। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশে খাদ্য অপচয় রোধ ও খাদ্যের পুষ্টিমানগত দিক ঠিক থাকে। মৌসুমী খাদ্যবস্তু সকল ঋতুতেই সহজলভ্য হয়। এ ছাড়াও খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য রক্ষায় দেশ অংশগ্রহণ করতে পারে। দেশ ও জাতির সেবায় খাদ্য সংরক্ষণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খাদ্য সংরক্ষণে খাদ্যে কি ঠিক থাকে?
ক. খাদ্যর রং খ. খাদ্যের গুণাগুণ
গ. খাদ্যের পরিমাণ ঘ. খাদ্যের দাম

২। পচনশীলতা অনুযায়ী খাদ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
ক. দু ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

৩। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে কি করা যায়?
ক. দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগে, দুর্ভিক্ষে মোকাবেলা করা যায়
খ. বিদেশে ব্যবসায়ীদের প্রসার ঘটান যায়
গ. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পথ প্রশস্ত করা যায়
ঘ. দেশের খাদ্য ঘাটতি রোধ করা যায়

৪। কয়টি কারণে আমরা সাধারণত খাদ্য সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. পাঁচটি ঘ. ছয়টি

৫। বিশ্ব স্বাস্থ্য রক্ষায় কোন খাদ্যকে ব্যবহার করা হয়?
ক. কাঁচা খাদ্য বস্তু খ. বরফে সংরক্ষিত খাদ্য
গ. সংরক্ষিত খাদ্য ঘ. শুকনো খাদ্য

৬। সংরক্ষণ পদ্ধতি খাদ্যকে রক্ষা করে
ক. রোগ জীবাণুর হাত থেকে খ. অপরিচ্ছন্নতার হাত থেকে
গ. পোকা মাকড়ের প্রভাব থেকে ঘ. গুদাম জাতের হাত থেকে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য সংরক্ষণ বলতে কি বোঝেন?
২. খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব কেন দেওয়া হয় কারণগুলো ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ১০.২ ঃ খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- কোন বিষয়গুলো খাদ্য নষ্ট হতে সাহায্য করে সেগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- খাদ্য নষ্ট হওয়ার জন্য অণুজীবের ক্রিয়া সাপেক্ষে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারবেন
- খাদ্য সংরক্ষণকালে বিবেচ্য বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য করতে পারবেন

যেসব খাদ্য সহজে নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো প্রকৃতিগতভাবে সাধারণ আলো বাতাসে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই এমনিতেই নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও খাদ্য নষ্ট হবার প্রধানত তিনটি কারণ আছে।

১) এনজাইম বা জারক রসের ক্রিয়া

২) অণুজীবের ক্রিয়া

৩) রাসায়নিক বিক্রিয়া

খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলোকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে যেসব বিষয় সেগুলো হচ্ছে-

১) খাদ্যের উপাদান

২) আর্দ্রতা

৩) তাপ

৪) অক্সিজেন

৫) অম্ল

আমাদের দেশের আবহাওয়াতে অণুজীব বাঁচার জন্য দরকার হচ্ছে- খাদ্য, পানি, তাপ ও অক্সিজেন। কিছু ফল আছে যা সহজে এসিডের সংস্পর্শে আসলেই নষ্ট হয়ে যায়। লৌহজনিত সংস্পর্শে এবং বাতাসের উপস্থিতিতে অম্ল ও ট্যানিন দিয়ে খাদ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। খাদ্য কালচে বর্ণ হয়। অনেক সময় বোতলে বা টিনের পাত্রে খাবার রাখলে ছত্রাক জন্মায়, কখনও গাঁজিয়ে যায়। খোলা বাতাসে মাখন, ঘি ইত্যাদি জারিত হয়ে দুর্গন্ধময় হয়। পাকা ফল বেশি দিন থাকলে বেশি পেকে এনজাইমের ফলে দুর্গন্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অতিপাকা পেঁপে, কলা ও ফল এভাবে নষ্ট হয়ে যায়।
প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহপদার্থ এ তিনটি উপাদানবিশিষ্ট খাদ্যে পানির পরিমাণ বেশি থাকলে খাদ্যে অণুজীব দিয়ে আক্রান্ত হয়ে খুব সহজে পচন ধরে।

আর্দ্র বায়ু ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ অণুজীব বৃদ্ধির জন্য অনুকূল। পানি ছাড়াও তাপ খাদ্য পচনের অন্যতম কারণ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় পাকার পূর্বে ফলমূল তাপযুক্ত স্থানে রাখলে সহজে পেকে নরম হয়ে যায়। বিভিন্ন অণুজীব বিভিন্ন তাপে বৃদ্ধি পায়। এক এক প্রকার অণুজীব এক এক ধরনের তাপে বিস্তার লাভ করে।

সেজন্য খাদ্য সংরক্ষণের সময় বেশি পাকা ক্ষত ও আঁচড় পড়া ফলমূল সংরক্ষণ করতে হয় না। কারণ এসব ফলমূলে অণুজীবের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

অণুজীব

পানিতে, মাটিতে, বাতাসে, ঈস্ট, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া অণুজীবগুলো ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ পেলেই খাদ্যে প্রবেশ করে অনুকূল পরিবেশে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ঈস্ট (Yeast)

কোন রসালো ফলের রসে যে চকের গুড়ার মত সাদা কিংবা ধূসর বর্ণের তলানি পড়ে থাকে সেগুলোই ঈস্ট। মোরব্বা, জ্যাম, জেলী, মিষ্টি আচার ইত্যাদি খাবারে পানি থাকলে ঈস্ট (Yeast) দিয়ে খাবার গেঁজে খাদ্যের শর্করা, এলকোহল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। খাদ্য তখন ফেনা ফেনা হয়ে গন্ধ হয়। এরকম পরিবর্তনকে গাঁজান (Fermentation) বলে। জোরে বাতাস বইলে বা আলো বাতাস চলাচল অঞ্চলে ঈস্ট জন্মায় না। ২০° সেঃ থেকে ৩০° সেঃ তাপমাত্রায় এবং আর্দ্রতাযুক্ত বাতাসে ঈস্ট ভালভাবে জন্মায়, খুব উচ্চ তাপে ঈস্ট বাঁচতে পারে না। কিন্তু পাউরুটি তৈরিতে ঈস্ট গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ছত্রাক (Mold)

কোন খাদ্য বস্তু অনেক দিন বন্ধ পাত্রে কিছু বাতাসসহ থাকলে সেখানে ছত্রাক জন্মায়, অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাতে বাতাসে অম্লযুক্ত পরিবেশ ছত্রাক জন্মানোর জন্য উপযোগী পরিবেশ।

মার্মালেড, স্কোয়াস ও শর্করাজাতীয় খাবারে ছত্রাক অনুপ্রবেশ বেশি। যে সব জায়গা আলোর অভাব বা তাপ নেই এবং আর্দ্র সেসব জায়গায় সংরক্ষিত খাদ্য রাখলে ছত্রাকের আক্রমণ অতিসত্বর ঘটবে। তবে কোন কোন সময় আচারে বা সংরক্ষিত ফলে উপরের পানি বা তরল কেমিকেলের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে ছত্রাকের জন্ম ও বৃদ্ধি। প্রখর সূর্য তাপে ছত্রাক জন্মাতে পারে না। প্রচুর বৃষ্টিপাত অঞ্চলেও ছত্রাক জন্মাতে পারে না।

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা খালি চোখে দেখতে পাইনা। এরা অণুবীক্ষণিক জীব তাই এদের নাম অণুজীব। ব্যাকটেরিয়া এককোষী জীব হিসেবে পরিচিত। অন্যান্য অণুজীবের মত ব্যাকটেরিয়াও উপযুক্ত পরিবেশে বৃদ্ধি পায়। সব ধরনের খাদ্যবস্তুতে ব্যাকটেরিয়া থাকে। তাপমাত্রাভেদে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এই ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

ব্যাকটেরিয়া		
সাইক্রোফিলিক ব্যাকটেরিয়া ঃ ২০° সেঃ তাপে বৃদ্ধি পায়	ম্যাসোফিলিক ব্যাকটেরিয়া ঃ ২০° সেঃ - ৪৫° সেঃ, তবে ৩৫° সেঃ তাপ এদের বৃদ্ধির জন্য উত্তম	থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া ঃ ৪৫° সেঃ এর অধিক তাপেও কতর্কগুলো ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পায়

চিত্র ঃ ক. অণুজীবের উৎপত্তি সহায়ক তাপমাত্রা
খ. অণুজীব ধ্বংসকারী তাপমাত্রা

সূত্র: “পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থা” দ্বিতীয় সংস্করণ - সিদ্দিকা কবীর

তাপমাত্রার রকমফের এর উপর র্নিভর করে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম ও বৃদ্ধি জানা থাকলে আমাদের পক্ষে খাদ্য সংরক্ষণ করা অতি সহজ হয়। কারণ যে তাপে যে ব্যাকটেরিয়া জন্মায় আমরা তার থেকে নিম্নতাপে খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারব। উপকারী ব্যাকটেরিয়া কিছু আছে যেমন- দই ও পনির তৈরিতে ল্যাকটোব্যাসিলাস নামক ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন।

এনজাইম

প্রাণি ও উদ্ভিদ কোষে এনজাইম অপরিহার্য উপাদান। উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে এনজাইম অণুঘটকের কাজ করে। অর্থাৎ নিজে নিজের মত থেকে প্রাণি ও উদ্ভিদকোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়, ফলমূল পাকায়। এনজাইম প্রোটিনজাতীয় পদার্থ। যত তাপ কম থাকে এনজাইমের কাজ তত কম হয়। যত তাপ বেশি থাকে এনজাইমের কাজ তত বাড়ে। শীত প্রধান দেশে ফলমূল পাকে বিলম্বে। গরম প্রধান দেশে ফল পাকে তাড়াতাড়ি। মানুষের শরীরের কিছু পার্থক্য থাকে শীত ও গরম প্রধান দেশে। ৮০° সেঃ তাপের অধিক তাপে খাদ্যবস্তুকে উত্তপ্ত করলে এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়।

রাসায়নিক বিক্রিয়া

ফল ও সবজির এসিড ও ট্যানিন লোহার সংস্পর্শে এসে বাতাসের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। ফলে খাদ্য দ্রব্য কালচে বর্ণ হয়। টমাটোজাত দ্রব্যে এ ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি পরিলক্ষিত হয়। খর পানিতে ধুয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতির কারণে খাদ্যবস্তু কিছুটা শক্ত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুটো উপাদানই অংশ গ্রহণ করে। রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ করতে হলে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ফলমূল সংরক্ষণ করা ভাল।

খাদ্য শুকিয়ে পানি সম্পূর্ণরূপে বের করলে পচন রোধ হয়। বোতলে বায়ুশূন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে ফলমূল সংরক্ষণ করলে অণুজীব ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার উৎপাত কম ঘটে।

অতএব খাদ্য সংরক্ষণকালে কয়েকটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করতে হবে-

১। পরিবেশ যেন অণুজীব বাঁচার প্রতিকূল হয়
২। অণুজীব অনুপ্রবেশে বাধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে
৩। অণূজীব ধ্বংস করে তবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে
৪। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অণুঘটকের উপস্থিতি লোপ করতে হবে

সারাংশ

খাদ্য নষ্ট হওয়ার প্রধানত তিনটি কারণ আছে। এনজাইম, অণুজীবের ক্রিয়া ও রাসায়নিক বিক্রিয়া। এ ছাড়াও খাদ্য নষ্ট হওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয়ও প্রভাব বিস্তার করে; যেমন- খাদ্যের উপাদান, আদ্রতা, তাপ, অক্সিজেন এবং অম্ল, এনজাইম খাদ্যকে বেশি পাকিয়ে ফেলে, খাদ্য উপাদান যেমন প্রোটিন, স্নেহে খাদ্যে পানির পরিমাণ বেশি থাকে বলে সহজে নষ্ট হয়। আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতেও খাদ্যবস্তু সহজে নষ্ট হয়। অণুজীবের মধ্যে ঈস্ট, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া খাদ্য নষ্ট করে বেশি, রাসায়নিক বিক্রিয়াতে খাদ্য নষ্ট হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ করতে হলে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ফলমূল সংরক্ষণ করতে হয়। পরিবেশ যদি অণুজীবর প্রতিকূলে হয় তবে খাদ্য বস্তু সহজে নষ্ট হতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রধানত খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ কয়টি?
ক. একটি খ. দুটি
গ. তিনটি ঘ. চারটি

২। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলোকে প্রভাবিত করে কয়টি বিষয়?
ক. একটি খ. পাঁচটি
গ. তিনটি ঘ. ছয়টি

৩। কোন খাদ্য তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়?

ক. যে খাদ্যে পানি কম থাকে খ. যে খাদ্যে খনিজ পদার্থ বেশি থাকে
গ. যে খাদ্যে পানি বেশি থাকে ঘ. যে খাদ্য বেশি রঙিন

৪। সংরক্ষণের সময় বাদ দিতে হয় কোন ধরনের ফলমূল?
ক. পাকা খ. কাঁচা
গ. কচি ঘ. ক্ষত ও আচড় পড়া

৫। অণুজীবগুলো কোথায় ঘুরে বেড়ায়?
ক. পানিতে খ. রোদ্রে
গ. বৃষ্টিতে ঘ. আগুনে

৬। অণুজীবের উৎপত্তি রহিত হয় কত তাপমাত্রায়?
ক. ০° সেঃ খ. ৪° সেঃ
গ. ১০° সেঃ ঘ. ১৫° সেঃ

৭। অণুজীব ধ্বংস হয় কত তাপমাত্রায়?
ক. ২০°-৩০° সেঃ খ. ২০° সেঃ-৫০° সেঃ
গ. ৬০° সেঃ-৮২° সেঃ ঘ. ৫৫° সেঃ - ৬০° সেঃ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য নষ্ট হওয়াতে কোন কোন বিষয়গুলো প্রভাবিত করে লিখুন।

২. অণুজীব খাদ্য নষ্ট হওয়াতে কীভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে নেবেন? আলোচনা করুন।

পাঠ- ১০.৩ ঃ খাদ্য সংরক্ষণের নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্য সংরক্ষণের নীতিমালাগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারবেন
- খাদ্যের নীতিমালা অবলম্বনে খাদ্য সংরক্ষণে সক্ষম হবেন
- সংরক্ষণের কাজে, কর্মদক্ষতা অর্জনেও নীতিমালার সাহায্য নিতে পারবেন

উৎপাদিত ফলমূল সব্জি ও যেকোন খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে কিছু নীতিমালা জানা প্রয়োজন। কারণ নীতিমালা অনুসরণ না করলে খাদ্য সংরক্ষণ বিফলে যাবে। নীতিমালা অনুসরণে খাদ্য সংরক্ষণের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সব ধরনের নীতিমালা সবরকম খাদ্য সংরক্ষণের জন্য এককভাবে প্রযোজ্য নয়। কিছু কিছু নীতিমালা সাধারণভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। আবার কিছু নীতিমালা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এখানে বিভিন্ন নীতিমালাগুলো বিষদভাবে আলোচনা করা হলঃ

১) পুষ্টিমানগত নীতি
২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নীতি
৩) স্বদেশ স্বীকৃত নীতিমালা
৪) আর্ন্তজার্তিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা

১) পুষ্টিমানগত নীতি

খাদ্যের পচনশীলতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উপায়ে খাদ্যকে সংরক্ষণ করতে হলে খেয়াল রাখতে হবে যাতে খাদ্যের প্রকৃত পুষ্টিমান নষ্ট না হয়। লেবেলে পুষ্টিমানগুলো প্রতি গ্রামে বা শতকরা হিসেবে লিখে দিতে হবে। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা ন্যায় সঙ্গত নয়। আবহাওয়াগত অবস্থা অনুযায়ী দেশে খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য জারীকৃত বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে গ্রহণযোগ্য হলে অতিরিক্ত উপাদান যুক্ত করা যেতে পারে। এতে সংরক্ষিত খাদ্যের পুষ্টিমান বাড়বে।

২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নীতি

খাদ্য সংরক্ষণে উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার করে খাদ্য সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থিতিকাল তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রক্রিয়াজাতকরণে ও গুদামজাতকরণে তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য তারতম্য যেন না হয়। সঠিক প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শ্রমিক বা কর্মী নিয়োগ একান্ত আবশ্যক। যে খাদ্য যে তাপমাত্রায় সংরক্ষিত হবে তার নিচে বা উপরের কোন তাপমাত্রা যেন প্রয়োগ না হয় সেজন্য সর্বদা বিশেষজ্ঞদের সচেতন থাকতে হবে।

প্রযুক্তিগত কারণে সংরক্ষিত খাদ্যকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। লেবেলে প্রযুক্তির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্ভবমত লেখা থাকা শ্রেয়। এতে করে ক্রেতা বিক্রেতা সকলের সুবিধা হয় এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। এতে সকলের আস্থা বাড়বে এবং পণ্যের চাহিদা ও বাড়বে।

৩) স্বদেশ স্বীকৃত নীতিমালা

খাদ্য সংরক্ষণে নিজের দেশের নীতিগুলো অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। অপ্রতুল খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়িক লাভের কারণে সময়ের পূর্বে সংরক্ষণ করে যেন কৃত্রিম সংকট বা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি না হয়। স্বদেশের অনুমতি ব্যতীত খাদ্যকে যেন অন্যায়ভাবে রপ্তানি করা না হয়। আমদানি, রপ্তানি যে কোনটির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। কালো বাজারের যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষা বিভাগের ছাড়পত্র এবং সনদপত্র নিয়ে যেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খাদ্য সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করেন সে ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। যেমন খুশী তেমনভাবে যেন দেশে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪) আন্তর্জাতিক নীতিমালা

প্রত্যেক দেশের খাদ্য সম্পর্কিত আমদানি রপ্তানির নীতিমালা জেনে নিতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে সংরক্ষিত খাদ্য আমদানি রপ্তানি করতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান দিয়ে সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলোকে সরল ও সচল করতে হবে। যেমন তেমনভাবে সংরক্ষণ করে অন্যায় ব্যবসা চালান যাবে না। খাদ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রযুক্তিগত দিকগুলো আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে নিতে পারলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করা যাবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিকভাবে এখনও সকল পদ্ধতি স্বীকৃত হয়ে উঠেনি। এর জন্য যে পুষ্টিজ্ঞান, উৎপাদন ক্ষমতা, উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও অধুনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন। এর কোনটাই পর্যাপ্ত নয়। তদুপরি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেনি। ভূটানের সংরক্ষিত ফল ও সব্জি আমরা স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র দেখতে পাই। আমাদের দেশে উন্নত ধরনের চালের উৎপাদন হলেও তা এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজার দখল করতে পারেনি। ভারতের আম, কাঁঠাল ইত্যাদি খাদ্য কাঁচা ও সংরক্ষিত অবস্থায়ও বিদেশের বাজার দখল করে আছে।

সচেতন হতে হবে বিদেশী সংরক্ষিত পণ্যে যেন দেশ ভরে না যায়। একে রোধ করতে হলে নিজেদের সচেতন হয়ে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধন করে দেশের ও ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। গৃহ থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বস্তরে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে নীতিগত ভাবে।

সারাংশ

খাদ্য সংরক্ষণে কতগুলো নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে পুষ্টিমানগত নীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার নীতি, স্বদেশ স্বীকৃত নীতি এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি। সব রকম নীতি সব ধরনের খাদ্য সংরক্ষণে প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিছু কিছু নীতিমালা কিছু কিছু খাদ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য নীতিমালাগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করতে হবে। নীতিমালা অনুসরণে খাদ্য সংরক্ষণ করলে সেটি সব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খাদ্য সংরক্ষণে কয়টি নীতিমালা আছে?
- ক. ২ টি
- খ. ৪ টি
- গ. ৫ টি
- ঘ. ছয়টি

২। খাদ্য সংরক্ষণে পুষ্টিমানগত নীতিমালাতে কি আছে?
- ক. অতিরিক্ত উপাদান যুক্ত করা যেতে পারে
- খ. অতিরিক্ত উপাদান যুক্ত করা যাবে না
- গ. অতিরিক্ত উপাদান ইচ্ছাতম যুক্ত করা যাবে
- ঘ. অতিরিক্ত উপাদান সব সময় যুক্ত করতে হবে

৩। স্বদেশ স্বীকৃত নীতিমালা অনুসরণ করলে কি হবে?
- ক. খাদ্যের চাহিদা কমে যাবে
- খ. সংরক্ষিত খাদ্যের দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাবে
- গ. কৃত্রিম সংকট বা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় না
- ঘ. কালো বাজারের সৃষ্টি হতে পারে

৪। প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে কোনটি সম্পর্কযুক্ত?
- ক. যন্ত্রপাতি
- খ. কলা কৌশল
- গ. স্থিতিকাল তাপমাত্রা
- ঘ. কর্মী সংগঠন

৫। আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করলে কি হবে?
- ক. স্বদেশের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে
- খ. আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়া যাবে
- গ. জনগণের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে
- ঘ. ভোক্তাদের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে

৬। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে কি করতে হবে?
- ক. সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে
- খ. জনগণকে সচেষ্ট হতে হবে
- গ. উভয়কে সচেষ্ট হতে হবে
- ঘ. ব্যবসায়ীদেরকে সচেষ্ট হতে হবে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য সংরক্ষণের নীতিমালাগুলোর বর্ণনা করুন।
২. খাদ্য সংরক্ষণের নীতিমালা অনুসরণ না করলে কি কি দুর্ভোগ হতে পারে লিখুন।
৩. আন্তর্জাতিক নীতিমালা আমাদের দেশে কেন অনুসরণ করতে হবে আলোচনা করুন।

পাঠ- ১০.৪ ঃ খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি (তাপ প্রয়োগ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কয়েকটি সংরক্ষণ পদ্ধতির নাম বর্ণনা করতে পারবেন
- খাদ্য সংরক্ষণে তাপ প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হবেন
- বোতল বা টিনজাতকরণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফল ও শাক-সব্জি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন

যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হলে কিছু নিয়ম ও রীতিনীতি এবং কলাকৌশল অবলম্বন করতে হয়। খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রথম শর্ত হল খাদ্য মূল্য বজায় রাখা। দ্বিতীয় কথা হল রং, বর্ণ, গন্ধ অবিকৃত রাখার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালান। বহুদিন থেকেই খাদ্য শস্যকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ফলমূল শাক-সব্জি, মাছ-মাংস এমনকি ফুল পর্যন্ত সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

যে কোন খাদ্য বস্তুকে যথা সম্ভব খাদ্য মূল্য বজায় রেখে প্রায় সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চয় করাকেই বলে খাদ্য সংরক্ষণ। যে সমস্ত কলা কৌশল ও প্রক্রিয়া অবলম্বনে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হয় সেগুলোকে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি বলে যেমন-

ক) তাপ প্রয়োগে

খ) বরফে জমিয়ে

গ) রোদে শুকিয়ে

ঘ) লবণ, চিনি, সিরকা এবং তেলে সংরক্ষণ (রাসায়নিক দ্রব্য)

এই পাঠে আমরা শুধু তাপ প্রয়োগে খাদ্য সংরক্ষণ আলোচানা করব।

তাপ প্রয়োগ

তাপ দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণের প্রধানত তিনটি পদ্ধতি রয়েছে যেমন-

১) পাস্তুরাইজেসন (Pasteurization)

২) স্ফুটন এবং

৩) প্রক্রিয়াজাতকরণ

১) পাস্তুরাইজেসনঃ

খাদ্যকে ১০০° সেঃ থেকে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ১০০° সেঃ অথবা অপেক্ষাকৃত কম নির্দিষ্ট তাপে নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য উত্তপ্ত করার পর দ্রুত তাপ কমিয়ে নির্দিষ্ট মাত্রায় ঠান্ডা তাপে নামিয়ে আনা এবং সে ঠান্ডা তাপে সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে খাদ্যের মধ্যে উপস্থিত রোগবাহিত অণুজীব নিধন করা যায়। ফলজাত দ্রব্য, দুধ ইত্যাদি পাস্তরণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়।

২) স্ফুটনঃ

মাছ, মাংস, তরকারি ইত্যাদি ১০০° সেঃ তাপে ফুটিয়ে রান্না করার ফলে অণুজীবের ক্রিয়া নষ্ট হয়। দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি অতি পচনশীল খাদ্য ফুটিয়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। অবশ্য স্থানীয় বা কক্ষ তাপের উপর সংরক্ষণের সময় বেশি কম হতে পারে। অর্থাৎ শীতপ্রধান দেশে ১০০° সেঃ তাপে ফুটিয়ে ২৪ ঘন্টারও বেশি রাখা যায়। আবার গরম অঞ্চলে একই তাপমাত্রায় ফুটিয়ে ২৪ ঘন্টা রাখা সম্ভব হয় না। মাঝে আর একবার ফুটিয়ে নিতে হয়।

৩) প্রক্রিয়াজাতকরণঃ

আজকাল আমাদের দেশে বোতলে বা টিনে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির বেশ প্রচলন হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তুকে ১০০° সেঃ এর ঊর্ধ্ব তাপ প্রয়োগ করে অণুজীব নিধন করা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া ও এনজাইম নিস্ক্রিয় করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়ায় টিনজাত বা বোতলজাতকরণ করে খাদ্যকে সংরক্ষণ করা হয়।

বোতলজাতকরণ ও টিনজাতকরণ প্রক্রিয়াতে খাদ্য সংরক্ষণ আমদানি রপ্তানির কাজে ব্যবহৃত হয়। বোতলজাতকরণ ও টিনজাতকরণ প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি পাত্র প্রয়োজন। বাণিজ্যিকভিত্তিতে অনেক প্রকার শিশি, বোতল, পট, কাঁচের/টিনের/প্লাস্টিকের বিভিন্ন বিক্রিয়া নিষ্ক্রিয় ধাতুনির্মিত পাত্র পাওয়া যায়। এগুলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে সংরক্ষণের উপযোগী করা হয়। সংরক্ষণের প্রথমে খালি পাত্রগুলোকে পানিতে ডুবিয়ে প্রায় ৩০ মিনিট ফুটিয়ে নির্বীজন করা

প্রয়োজন। সংরক্ষণের জন্য তাজা ও টাট্‌কা খাদ্য নির্বাচন করা আবশ্যক। নিখুঁত, পরিপক্ব, পুষ্ট, উচ্চমানের খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের জন্য বাছাই করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় সংরক্ষিত খাদ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

ফল ও সব্জি টিন বা বোতলজাতকরণ-এর সাধারণ পদ্ধতি (Canning)

পাত্র নির্বাচন
প্রথমে সংরক্ষণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাত্র নির্বাচন করতে হবে। পাত্রটিকে তার ধর্ম অনুযায়ী নির্বীজন করতে হবে।

খাদ্য নির্বাচন
তাজা, নিখুঁত, টাটকা, পরিণত, পরিপক্ব, পুষ্ট ফল ও সব্‌জি সংরক্ষণের জন্য অতি সতর্কতার সাথে বাছাই করতে হবে। কোন প্রকার দাগ ও ক্ষতযুক্ত খাদ্য যেন না থাকে। যদি থাকে তবে একটির জন্য সব কয়টি খাদ্যই নষ্ট হয়ে যাবে।

ধোওয়া
নির্বাচিত খাদ্য ডোবানো পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

খোসা ছাড়ানো ও কাটা
প্রয়োজনমত খোসা ছাড়িয়ে পছন্দ ও সুবিধামত সমান টুকরা করে কাটতে হবে।

ভাপ দেওয়া
ফুটন্ত ও ডুবো পানিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফল ও সব্‌জিকে ভাপ দিয়ে নিতে হবে।

লবণ পানি বা সিরাপ ঢালা
পাত্রে খাদ্য ঠিকভাবে সাজিয়ে রেখে লবণ পানি বা সিরাপ পরিমাণ মত ঢালতে হবে যাতে সব্‌জি ও ফলমূলগুলো সম্পূর্ণ রূপে তরলে ডুবে থাকে। পাত্রের মুখ ১/৪ সেঃমিঃ এর মত খালি থাকবে। সব্‌জিতে ২%-৩% লবণ পানি দিতে হবে এবং ফলের ৩৫%-৫০% চিনি ও ০.২%-০.৫% সাইট্রিক (Citric acid) মিশানো গরম সিরাপ ঢালতে হবে।

বায়ু নিরোধীকরণ (Air tight)
পাত্রে যে বায়ু থাকবে সেটাকে ভিতর থেকে বিশেষ ভাবে বের করে নিতে হবে। পাত্রের ঢাকনা আলগা করে দিয়ে ফুটন্ত পানিতে পাত্রের দুই তৃতীয়াংশ অংশ ডুবিয়ে উত্তাপ দিয়ে জলীয় বাষ্পের ঊর্ধ্বগতিতে পাত্রের ভিতরের বাতাস বের হয়ে যায় ৮০° সেঃ হলে বাতাস সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসে।

ঢাকনা বন্ধ করা
বাতাস বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ফুটন্ত পানি থেকে পাত্রটি তুলে মেশিনের সাহায্যে হাত না লাগিয়ে পাত্রের মুখ বায়ুবন্ধ অবস্থায় বন্ধ করতে হবে।

নির্বীজন করা
১০০° সেঃ এর ঊর্ধ্বে তাপমাত্রায় প্রেসার কুকারে পাত্রগুলোকে নির্বীজন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফুটালে অণুজীব ধ্বংস হয়ে যাবে। উচ্চ তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়া নিহত হয় এবং স্পোরধারণকারী ব্যাকটেরিয়া নির্জীব হয়ে যায়। টিনের পাত্র বা বোতলের নিচে ছিদ্রযুক্ত ছোট কাঠের পাটাতন অথবা মোটা কাপড় ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলে কাঁচের পাত্র বা টিনের পাত্র ভাঙ্গা বা উল্টে পড়ে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না।

ঠান্ডা করা
নির্বীজনের পর ঠান্ডা পানির ধারার নিচে রেখে সাধারণ তাপমাত্রায় আনতে হবে।

মোছা
স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে শুক্‌না পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভালভাবে মুছে নিতে হবে। যদি পাত্রের গায়ে পানি থাকে তবে মরিচা ধরার সম্ভাবনা থাকে।

লেবেল লাগানো

লেবেলে যাবতীয় প্রয়োজনাদি কথা লেখা থাকতে পারে; যেমন- খাদ্যের নাম, পরিমাণ, উপকরণ, সংরক্ষণের তারিখ ও শেষ মাত্রার তারিখ উল্লেখ থাকা ভালো।

গুদামজাত করা

পরিশেষে পাত্রগুলো উপযুক্ত পরিবেশে (ঠান্ডা এবং শুকনো) রাখতে হবে।

সূত্র: পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা- সিদ্দিকা কবীর, পৃষ্ঠা নং ২৪৬-২৫১ পৃষ্ঠা

সারাংশ

তাপ প্রয়োগে খাদ্য সংরক্ষণ একটি বহুল প্রচলিত আধুনিক ও সহজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ফলমূল শাক সব্জি দুধ, মাছ, মাংস তরিতরকারি সবই প্রায় সংরক্ষণ করা সম্ভব। পাস্তুরাইজেসন দিয়ে দুধ নির্ভরযোগ্যভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব, স্ফুটন পদ্ধতিতে সব রকম মাছ মাংস, তরিতরকারি ২৪ ঘন্টা বা তার ও বেশি সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। টিন বা বোতলজাতকরলের মাধ্যমে ফলমূল তরিতরকারী অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য অবস্থায় বেশ কিছুদিনের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। তাপ প্রয়োগ পদ্ধতির মূল কথা হল যথা সময়ে সঠিকভাবে তাপমাত্রা প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাস্তুরাইজেসন পদ্ধতিতে কত ডিগ্রী থেকে কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়?
ক. ৯০° সেঃ থেকে কম খ. ১০০° সেঃ থেকে কম
গ. ৮০° সেঃ থেকে কম ঘ. ৮৫° সেঃ থেকে

২। দুধ কোন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়?
ক. স্ফুটন খ. পাস্তুরাইজেশন
গ. বরফে জমিয়ে ঘ. রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে

৩। স্ফুটন পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুকে কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটিয়ে নিতে হবে?
ক. ৭০° সেঃ খ. ৮০° সেঃ
গ. ৯০° সেঃ ঘ. ১০০° সেঃ

৪। বোতলজাতকরণের সময় সব্জিতে কত % লবণ পানি দিতে হবে?
ক. ১%-২% খ. ২%-৩%
গ. ৩%-৪% ঘ. ৪%-৫%

৫। বোতলজাতকরণে বোতলকে কি করতে হবে?
ক. ভাল করে ধুতে হবে খ. মুছে নিতে হবে
গ. নির্বীজন করতে হবে ঘ. সাবান দিয়ে ধুতে হবে

৬। বায়ু নিরোধীকরণে পাত্রের কত অংশ ডুবিয়ে উত্তাপ দিতে হয়?
ক. দু তৃতীয়াংশ খ. এক তৃতীয়াংশ
গ. সম্পূর্ণ অংশ ঘ. কোন অংশই না

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির তাপ প্রয়োগ পদ্ধতি কি কি? যে কোন একটির বর্ণনা দিন।
২. ফল ও সব্জি বোতলজাতকরণ এর সাধারণ পদ্ধতি লিখুন।
৩. স্ফুটন পদ্ধতি কি? এটি আমাদের দেশে কোন কোন খাবারের সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয় লিখুন।

পাঠ- ১০.৫ ঃ খাদ্য সংরক্ষণ - বরফে জমিয়ে এবং রোদে শুকিয়ে

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বরফে এবং হিমাগারে কীভাবে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করতে হয় সে নিয়ম নীতিগুলো সম্পর্কে অবহিত হবেন
- তাপ নিয়ন্ত্রণ করে সহজে গৃহে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে সক্ষম হবেন
- রোদে শুকিয়ে মাছ মাংস এবং মশলা জাতীয় খাদ্যবস্তু সহজে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন

বরফে জমিয়ে এবং রোদে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ অনেক সনাতনী এবং অনেক আধুনিক পদ্ধতিও বটে, আদিকালের মানুষ রোদেই সব শুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিত। বরফ অঞ্চলে লোকেরা বরফ ব্যবহার করেই খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করত ভবিষ্যতের জন্য। আমরা এখন অনেক আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য এই সংরক্ষরণ পদ্ধতিগুলোকে আরো উন্নততর ও সহজতর করেছি। নিচে বরফে জমিয়ে ও রোদে শুকিয়ে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

বরফে জমিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ

হিমাগারে সংরক্ষণ ঃ আজকাল হিমাগারে ১০°-১৫° সেঃ ঠান্ডা তাপে কয়েক মাস ধরে আলু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি সংরক্ষিত করা হয়। পরে চাহিদা মাফিক বাজারে সরবরাহ করা হয়। সরকারি উদ্যোগে সরকারি হিমাগার থেকে জনগণের জন্য বিতরণও করা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা দুর্ভিক্ষের সময়।

তাজা নিখুঁত দাগমুক্ত ফল, সব্জি, টাট্‌কা দুধ, ডিম, রান্না করা খাদ্যবস্তু ০° সেঃ থেকে -৫° সেঃ তাপমাত্রায় ১ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। আমরা বাজারে প্যাকেট দুধ (সাভার ডেইরি বা মিল্ক ভিটা) এভাবেই পেয়ে থাকি।

মাছ, মাংস, সব্জি, ফল ইত্যাদি পচনশীল খাদ্য ডিপ ফ্রিজে (Deep fridge) বা রেফ্রিজারেটরে বরফ চেম্বারে -১৮° সেঃ থেকে -৪০° সেঃ হিম ঠান্ডা তাপে জমিয়ে ৬-৭ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারে (Cold storage) সংরক্ষিত ফল, সব্জি দিয়ে মৌসুম শেষ হয়ে গেলেও খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা যায়।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফলমূল ও সব্জি হিমাগারে সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। অণুজীব ও এনজাইম নিষ্ক্রিয় করার জন্য খাদ্যকে ফুটন্ত পানিতে (৮০° সেঃ উর্ধ্বে) দিয়ে ২-৩ মিনিট ভাপ দিয়ে নিতে হবে। তারপর গরম পানি থেকে সাথে সাথে হিমশীতল পানিতে ডোবাতে হবে। তারপর খাদ্যকে ঠান্ডা করে সম্পূর্ণরূপে পানি ঝরিয়ে পলিথিন ব্যগে বাতাস রুদ্ধ করে জমাটভাবে ভরে বরফের চেম্বারে রাখতে হবে। এভাবে প্রায় ৫/৬ মাস রাখা যায়। এতে রং, বর্ণ, গন্ধ নষ্ট হয় না। তবে যদি কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তবে সে খাদ্য আর গ্রহণ করা উচিত হবে না। একবার যে প্যাকেট খোলা হয় তা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করাই ভাল। কারণ এরপর সে খাবার বাতাসের সংস্পর্শে আসার কারণে নষ্ট হয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। বরফে সংরক্ষিত খাদ্য যথাসম্ভব ছোট ছোট প্যাকেটে থাকাই ভাল। এতে ব্যবহারে সুবিধা হয়, রাখাও সুবিধাজনক। লেবেলিং ভালভাবে থাকা দরকার।

রোদে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ

রোদ হচ্ছে সূর্যের রশ্মির প্রযুক্তিগত উপাদান। অনাদিকাল থেকে সূর্যের রশ্মিকে আদিবাসীরা খাদ্য সংরক্ষণের একটি প্রধান প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করেছে। সে সুদূরের জ্ঞান থেকে আজও আমরা সূর্যের রশ্মিকে বিভিন্নভাবে খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করে আসছি।

পৌষের শুরু থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত আমরা সূর্যের প্রখর তাপ অর্থাৎ রোদ পাই। এ সময়ে বৃষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে। এ সময়ে বাতাসের আর্দ্রতা ৬০%-৪৫% এসে দাঁড়ায়। এতে যেকোন খাদ্যশস্য শুকনো অবস্থায় থাকে। এসময়ে রোদের তাপে খাদ্যশস্য ও ফলমূলের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়ে খাদ্য তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

রোদে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণের জন্যও প্রথম কাজ হচ্ছে খাদ্য বাছাই করা। তাজা, টাট্‌কা পরিণত, পরিপক্ব ও পুষ্ট খাদ্যশস্য যেমন- ছোলা, বুট, মটর, সিমের বীচি, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মশলা জাতীয় খাদ্য, বাদাম, কুল, তেঁতুল, মাছ ও মাংস নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনের পর এদের বিশুদ্ধ পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। মটর, সিমের বীচি, গাজর ইত্যাদি খোসা ছাড়িয়ে পানিতে দিয়ে ২-৪ মিনিট ভাপানো প্রয়োজন হয়। ফলে কাঁচা একটা গন্ধ দূর হয়। এনজাইম ও অণুজীব ধ্বংস হয়। সব্জির স্বাভাবিক রং অনেকাংশে বজায় থাকে ও তাড়াতাড়ি শুকায়। প্রতি লিটার ঠান্ডা পানিতে পটাশিয়াম-মেটা-বাই-সালফাইট মিশিয়ে ভাপানো সব্জি ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর রোদে পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে তার উপর শুকাতে দিতে হয়।

বড় ঢাকনা বা পাটিতে অথবা মাদুরে অথবা টিনের পাতের উপর সমভাবে ছড়িয়ে শুকাতে দিলে তাড়াতাড়ি শুকায়। বেশি জায়গায় ছড়িয়ে দিলে ভাল। একটানা ৫/৬ ঘন্টা রোদের প্রয়োজন। মাঝে মাঝে পরিষ্কার কাঠি বা চামচ দিয়ে নেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। পর পর ৩/৪ দিন রোদে দিলে শুকিয়ে যায়। তবে এ ধরনের শুকানোর জন্য আবহাওয়াজনিত রেকর্ড পূর্বে সংগ্রহ করে তবে কাজে হাত দেওয়া ভাল। যাতে কোন বৃষ্টি বা কুয়াশার কারণে খাদ্য শুকাতে বাধা না পড়ে। সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেলে বোতলে, বোয়ামে বা কৌটাতে ভাল করে ভরে ঠেসে বাতাস বের করে নিতে হবে। বাতাস থাকলে অণুজীবের জন্ম শুরু হতে পারে।

মাছ ও মাংস আরো বেশি দিন শুকাতে হবে। সাধারণত মাছ মাংস শুকাতে ২০-২৫ দিন লাগে। কারণ এতে জলীয় অংশ থাকলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। শুকানোর পর আবারও মাঝে মধ্যে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনবোধে আবারও রোদে দিতে হতে পারে। মরিচ শুকিয়ে বাঁশের ডোলে অথবা ঝাঁকায় রাখতে হবে। বাঁশের ডোলে বা ঝাঁকায় রাখতেও মাটি ও গোবর মিলিয়ে ভালভাবে লেপে শুকিয়ে সংরক্ষণের জন্য পাত্র তৈরি করে নিতে হবে। তারপর শুকনো মরিচ রেখে উপরে ঢাকনা দিয়ে আবারও লেপ্টে দিতে হবে। মাঝে মধ্যে দেখে রাখতে হবে।

সারাংশ

অণুজীব ও এনজাইমকে ৮০° সেঃ ঊর্ধ্বে ফুটিয়ে ২-৩ মিনিট তাপ দিয়ে সাথে সাথে ঠান্ডা পানিতে ডোবাতে হবে। তারপর বরফের চেম্বারে রেখে দিতে হবে। ৫-৬ মাস রাখা যায়। হিমাগারে ১০°-১৫° সেঃ ঠান্ডা তাপে খাদ্যবস্তুকে সংরক্ষণ করা যায়। মাছ মাংসকে ফ্রিজে ১৮°-৪০° সেঃ হিমঠান্ডা তাপে জমিয়ে ৬-৭ মাস রাখা যায়। চৈত্র-বৈশাখে রোদে মাছকে শুকিয়ে এবং হলুদ মরিচ অন্যান্য মশলাকে শুকিয়ে প্রায় ১ বছরকাল রাখা যায়। মাঝে মাঝে আবার শুকিয়ে নিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫

সঠিক প্রশ্নের উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আলু, পেঁয়াজ ও রসুন হিমাগারে সংরক্ষিত হয় কত ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায়?
ক. ৪০°-৪৫° সেঃ খ. ৩০°-৪৫° সেঃ
গ. ২০°-২৫° সেঃ ঘ. ১০°-১৫° সেঃ

২। অণুজীব ও এনজাইম নিষ্ক্রিয় করতে ফুটন্ত পানিতে কত মিনিট ভাপ দিতে হয়?
ক. ১-২ মিঃ খ. ২-৩ মিঃ
গ. ২-৪ মিঃ ঘ. ৪-৫ মিঃ

৩। রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণের জন্য ফলমূলকে পানিতে দিয়ে কত মিনিট ভাপ দিতে হয়?
ক. ১-২ মিনিট খ. ২-৩ মিনিট
গ. ২-৪ মিনিট ঘ. ৪-৫ মিনিট

৪। রোদে শুকাতে হলে খাদ্যবস্তুকে একটানা রোদে দিতে হবে কত মিনিট?
ক. ২-৩ ঘন্টা খ. ৩-৪ ঘন্টা
গ. ৪-৫ ঘন্টা ঘ. ৫-৬ ঘন্টা

৫। পরপর কতদিন রোদে দিতে হবে?
ক. ৩-৪ দিন খ. ৪-৫ দিন
গ. ৪-৬ দিন ঘ. ৬-৭ দিন

৬। মাছ মাংস শুকাতে সাধারণত কত দিন লাগতে পারে?
ক. ১০-১২ দিন খ. ১৫-২০ দিন
গ. ২০-২৫ দিন ঘ. ২৫-৩০ দিন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বরফে জমিয়ে কীভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায় বিস্তারিত লিখুন।
২. রোদে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

পাঠ- ১০.৬ ঃ খাদ্য সংরক্ষণ-লবণ, চিনি ও তেলে

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- লবণ সহযোগে পানি দিয়ে ব্রাইন তৈরি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- লবণে জরানো প্রক্রিয়াটি আয়ত্ব করতে সক্ষম হবেন
- বিভিন্ন ফলমূল কিভাবে লবণে সংরক্ষণ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন
- তেলে কোন কোন খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা যায় সে প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- চিনি দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সাধারণ অর্থে লবণ হল সোডিয়াম ক্লোরাইড। এটি একটি উৎকৃষ্ট সংরক্ষণের রাসায়নিক পদার্থ। লবণ দিয়ে আমরা সহজ ভাবেই নানা খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করে থাকি। চিনি দামী হলেও এটিও একটি সংরক্ষণের উত্তম রাসায়নিক পদার্থ। এতেও আমরা ঘরে এবং বাণিজ্যিকভাবে ফলমূল সংরক্ষণ করতে পারি, তেলে সংরক্ষণ একটি আদি খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। নানান জাতীয় আচার তেলেই সংরক্ষণ করা হয়। তেলে সংরক্ষণ পদ্ধতিতে লবণ ও চিনির চেয়ে দাম বেশি পড়ে। তবে এতে খাদ্য অনেক দিন রাখা যায়।

লবণ, চিনি ও তেলে সংরক্ষণ

লবণ ঃ লবণ মেখে খাদ্য সংরক্ষণ বহু পুরাতন পদ্ধতি। লবণ ইলিশ একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ব্রাইন ঃ ব্রাইন বলতে ২% লবণের জলীয় দ্রবণকে বুঝায়। ফল ও সব্জি যাতে বাতাসের সংস্পর্শে এসে বিবর্ণ হয়ে না যায় সেজন্য ২% লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়।

লবণে জরানো ঃ আচার ও চাটনি তৈরি করার জন্য অনেক সময় কাঁচা ফল ও সব্জি পাতলা লবণ পানিতে ডুবিয়ে রেখে নরম করে নেওয়া হয়। একেই লবণে জরানো বলে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে ২% লবণ পানিতে ফল বা সব্জি একদিন ডুবিয়ে রাখার পর প্রতিদিন লবণ মিশিয়ে ঐ দ্রবণের ঘনত্ব ২% করে বাড়ানো হয়। এ ভাবে ৪ দিন পর লবণের ঘনত্ব ৮% হয়। তখন এই দ্রবণ থেকে ফল বা সব্জি তুলে নিয়ে ৮% লবণ-পানির একটি নতুন দ্রবণে রাখা হয়। এ ভাবে রাখতে ২/৩ সপ্তাহের মধ্যেই ফল, সব্জি নরম হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক দিনই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে ফল ও সব্জির টুকরা যেন প্রয়োজনের বেশি নরম না হয় এবং ছত্রাক না ধরে। উপযুক্ত নরম হলেই আচার বা চাটনি তৈরি করতে হবে। ছত্রাক জন্মানোর লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি কেজি ফল বা সব্জির জন্য ২০০ মিলিগ্রাম হিসাবে পটাসিয়াম-মেটা-বাই-সালফাইট অল্প পানিতে দ্রবীভূত করে ফলের উপর ছিটিয়ে দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে।

কাঁচা আম ও অন্যান্য ফল লবণে সংরক্ষণের বিবরণ সম্বলিত তালিকা

ফলের নাম	প্রথম দিন		দ্বিতীয় দিন	তৃতীয় দিন	পঞ্চম দিন	
	ফল নির্বাচন ও বাছাই	প্রস্তুতি			পরিশেষ	সংরক্ষণ
আম আমড়া আমলকি করমচা চালতা পাতিলেবু	কাঁচা, টাটকা, তাজা, পরিণত, ডাঁসা, কচকচে ফল বাছাই করা। নরম ফল বেছে বাদ দেওয়া। ঝড়ে পড়া ফল টাটকা অবস্থায় বাছাই করে নেওয়া।	ধুয়ে খোসা ছাড়ান, আঁটি ফেলে লম্বায় মোটা ফালি করে ২% লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখা, সাথে সাথে পানি ঝরিয়ে প্রতি কিলোগ্রাম ফলের টুকরায় ১৫০ গ্রাম লবণ মাখিয়ে পলিথিন ব্যাগে বা এনামেলের গামলায় এক রাত রাখা।	বেতের ঝুড়ি, চালনি বা নাইলনের মশারীরর কাপড়ে ঢেলে পানি ঝরানো। ওজন নিয়ে প্রতি কেজিতে ১০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে পুনরায় একরাত রাখা।	আগের দিনের মত পানি ঝরানো। আবার প্রতি কেজিতে ৫০ গ্রাম লবণ মাখিয়ে আরও দু'রাত রাখা।	৫ম দিনে ভাল ভাবে পানি ঝরিয়ে প্রতি কেজিতে ৫-১০ মি.লি. এসেটিক এসিড এবং ১ গ্রাম পটাসিয়াম-মেটা-বাই-সালফাইট মিশানো।	টক দ্রব্য রাখার উপযোগী ঢাকনাসহ পাত্রের ভিতরের তলায় ২ সে.মি. পুরু লবণ বিছিয়ে ফলের টুকরা ঠেসে ভরে উপরে ২ সে.মি. পুরু লবণের স্তর দিয়ে ফল সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা।

সূত্র ঃ "পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থা", অধ্যাপিকা সিদ্দিকা কবীর, পৃষ্ঠা নং- ২৬৭।

লবণ দিয়ে কাঁচা আম সংরক্ষণে ছত্রাকের আক্রমণ একটি সমস্যা। কিন্তু সংরক্ষিত টুকরার উপরিভাগে ২ সে.মি. লবণের পুরু স্তর দিয়ে ঢেকে দিলে বাতাস ঢুকতে পারে না এবং ছত্রাক জন্মাতে পারে না। ছত্রাক জন্মাতে দেখা গেলে ছত্রাকের অংশটুকু তুলে ফেলে প্রতি কেজি টুকরার জন্য ২০০ মিলিগ্রাম পাটাসিয়াস-মেটা-বাই-সালফাইট পানিতে গুলে পাত্রের উপরিভাগে ছিটিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে। পাত্রের মুখ বায়ুরুদ্ধভাবে বন্ধ করা না হলে সংরক্ষক দ্রব্য দিলেও ছত্রাক জন্মায়। ছত্রাক দিয়ে আক্রান্ত হলে টুকরা অতিরিক্ত নরম হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। যে কোন ফল ও সব্জিকে আচার তৈরির উপযুক্ত নরম করার জন্য ১৫%-২০% লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখলে সাধারণত ২ দিন থেকে ২ মাসের মধ্যে নরম হয়। লবণে সংরক্ষিত ফল থেকে আচার বা চাটনি প্রস্তুত করতে হলে সেগুলো প্রথমে গরম পানিতে এবং পরে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে প্রয়োজনমত লবণমুক্ত করতে হবে।

তেলে খাদ্য সংরক্ষণ

আচার ঃ আম, জলপাই, তেঁতুল, চালতা, কুল আচারের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ফল। এছাড়া আমড়া, কতবেল, করমচা, কাঁচামরিচ, আমলকি এবং টমেটো, ফুলকপি, মূলা, শালগম, গাজর, বীট দিয়ে আচার তৈরি হয়। কাঁচা ও পরিণত ফল, সব্জি আচার তৈরির জন্য প্রয়োজন। লবণে সংরক্ষিত ফল ও সব্জি এবং টাটকা ফল ও সবজি দিয়ে আচার তৈরি হয়। লবণে সংরক্ষিত ফল ও সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। তেলে ডুবানো থাকলে আচারে ছত্রাক জন্মায় না, কিন্তু তেলে পানি মিশানো থাকলে বা আচারে তেল কম এবং পানি বেশি থাকলে ছত্রাক দিয়ে আচার নষ্ট হয়ে যায়। বোতলে আচার ভরার পরে বোতলের মুখে তেল দিয়ে আচার ডুবিয়ে রাখলে আচার নষ্ট হয় না।

সরিষা, মেথি, রাঁধুনি, কালিজিরা, মৌরি, জিরা, ধনে, মরিচ, হলুদ, আদা, রসুন এসব মসলা আচারে স্বাদ আনে এবং কিছুটা সংরক্ষণেরও কাজ করে। আচারে চিনি এবং সিরকার ব্যবহার সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং স্বাদ উন্নত করে। কয়েক রকমের সংমিশ্রিত মসলা পাঁচফোড়ন আচারে সুঘ্রাণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

তেলে ডুবানো আচারে প্রতি কিলোগ্রাম টুকরা ফলের জন্য ৩৫০-৪০০ গ্রাম তেলের প্রয়োজন। আচারের রং আকর্ষণীয় করার জন্য অর্ধেক তেলের মধ্যে লবণে নরম করা ফল বা সব্জি হালকা ভেজে রাখা হয়। বাকি অর্ধেক তেল গরম করে চুলা থেকে নামিয়ে ১ চা চামচ চিনি তেলে মিশাবার পরে কাঁচা মরিচ দিয়ে আবার চুলায় দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ নেড়ে লাল করে অন্য মসলা দিয়ে কষাবার পর ফলের টুকরা, পাঁচফোড়নের গুঁড়া মিশিয়ে গরম অবস্থায় বোতলে ভরা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পাঁচফোড়ন তেলে ছাড়া হয়। আচারের বোতল ১০/১২ দিন একনাগারে প্রতিদিন রোদে রাখা উচিত। পরবর্তীতে মাসে অন্তত একবার রোদে রাখা ভাল। আচারের বোতল রোদে রাখাকালে ঢাকনা খুলে দিতে হয়। তারপর বোতল পরিষ্কার করে মুখে শুকনা কাপড় দিয়ে শুকনা জায়গায় ঢেকে রাখলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

চিনি দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ

চিনির সংরক্ষণ ধর্ম দ্রবণের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। কোন উৎপাদিত দ্রব্যে চিনির পরিমাণ ৬৫% বা এর অধিক হলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য শুধু চিনির দিয়েই সংরক্ষিত থাকে। কার্যত চিনি অণুজীবের জন্য বিষাক্ত নয়, চিনির ঘন দ্রবণ অণুজীবের কোষের আর্দ্রতা, অভিস্রাবন প্রক্রিয়ায় শুষে নেয়। অর্থাৎ অণুজীবের কোষের অভ্যন্তরের জলীয় অংশের বহিঃপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দ্রবণের মাধ্যমে অণুজীবের কোষের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে অণুজীব মারা যায়। স্কোয়াস, মোরব্বা, মারমালেড, জ্যাম, জেলী প্রভৃতি দ্রব্য চিনি দিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।

সারাংশ

খাদ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে লবণ, চিনি ও তেলে সংরক্ষণ উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে গৃহে অতিসহজে প্রায় সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। লবণের ব্রাইন তৈরি করে খাদ্যবস্তুকে বর্ণহীনতা থেকে রক্ষা করা যায়। লবণ জরানো পদ্ধতির মাধ্যমে ফলমূলকে সংরক্ষণের উপযোগী করে তোলা যায়।
চিনি খাদ্য সংরক্ষণের একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক। এতে মোরব্বা ভাল হয়। তেলে আমরা অনেক ফলমূলের আচার করে থাকি এবং সেগুলো অনেক দিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্রাইন তৈরি করতে কত % লবণের দ্রবণকে বুঝায়?
ক. ১% খ. ৩%
গ. ২% ঘ. ৪%

২। লবণে জরানো অবস্থায় কত দিনের মধ্যে ফল সবজি নরম হয়?
ক. ২/৩ দিন খ. ৩/৪ দিন
গ. ৪/৫ দিন ঘ. ৫/৬ দিন

৩। ছত্রাকের জন্ম রোধ করতে পানিতে অল্প পরিমাণে কি মিশাতে হয়?
ক. চুন খ. লবণ
গ. চিনি ঘ. পটাসিয়াম-মেটা-বাই সালফাইট

৪। সিরকার ব্যবহার কিসে সহায়তা করে?
ক. সংরক্ষণে খ. নরমকরণে
গ. জীবাণু নষ্টে ঘ. পরিমাণ বাড়াতে

৫। প্রতি কিলোগ্রাম ফলের জন্য কত গ্রাম তেলের প্রয়োজন?
ক. ১০০-২০০ গ্রাম খ. ২০০-৩০০ গ্রাম
গ. ৩৫০-৪০০ গ্রাম ঘ. ৪০০-৫০০ গ্রাম

৬। চিনি দিয়ে কি কি সংরক্ষণ করা যায়?
ক. মোরব্বা, জ্যাম খ. ডাল, চাল
গ. পানি ও সব্জি ঘ. ডিম ও আলু

রচনামূলক প্রশ্ন

১. লবণে জরানো বলতে কি বোঝায় লিখুন।
২. তেলে সংরক্ষণ পদ্ধতি লিখুন।
৩. চিনি দিয়ে সংরক্ষণ কীভাবে করা হয় বর্ণনা করুন।

পাঠ- ১০.৭ ঃ গৃহে খাদ্য সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- গৃহে খাদ্য সংরক্ষণের সহজ উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- গৃহে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি দিয়ে আমসত্ত্ব, তেঁতুলের আচার, পেয়ারার জেলী, আনারসের জ্যাম, কাঁচা আমের স্কোয়াস, আমলকির মোরব্বা ও মূলার পিকেলস্ তৈরি করতে সক্ষম হবেন
- গৃহে সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বনে খাদ্য সংরক্ষণ করে পরিবারের আয় বাড়াতে সক্ষম হবেন

গৃহে নানাভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। গৃহে সংরক্ষিত আচার, জ্যাম, জেলী, স্কোয়াস ইত্যাদি বাজারে বিক্রি হয়। কর্মমুখী অভিজ্ঞতার বিষয় হিসেবে গার্হস্থ্য অর্থনীতির শিক্ষার্থীবৃন্দের এসব কিছু জানা থাকা ভাল। ভবিষ্যতের আয় বাড়ানো এবং ঘরের খরচ কমাতে গৃহে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ফলের স্কোয়াস, জ্যাম, জেলী, আমসত্ত্ব, মোরব্বা, পিকেল্স ও লেবুর জারক তৈরি করতে পারি।

আমসত্ত্ব

আমাদের দেশে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এ দুমাসে আম একসঙ্গে প্রায় পেকে যায়। সে সময় কাঁঠাল, জাম ও লিচু ইত্যাদি ফলও পেকে আসে। দামও কম থাকে, স্বাদে গন্ধে ভরপুর থাকে। এ সময়ে ফল খাওয়া হয় প্রচুর। তাই বিশেষ করে আমকে নষ্টের হাত থেকে বাচাতে হলে গৃহে আমসক্ত করে রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমসত্ত্ব কাঁচা পাকা দুরকম আম দিয়ে করা সম্ভব। সাধারণত পাকা আমের আমসত্ত্ব বেশি স্বাদ হয়। পুষ্টি উপাদানও বেশি পরিমাণে থাকে। ভবিষ্যতের জন্য মুখরোচক খাদ্য হিসেবে সংরক্ষিত রাখা যায়।

উপকরণ ও পরিমাণ

কাঁচা আম/পাকা আম	২৪ টি	আখের গুড়	$1\frac{1}{2}$ কেজি
লবণ	২ চা চামচ	তেল	২ টেবিল চামচ

১। চৈত্র বৈশাখ মাসের নতুন কচি সবুজ আম দিয়ে আমসত্ত্ব ভাল হয়। আমের আঁটি বেশি শক্ত হয়ে গেলে এবং আমের খোসা ছাড়াবার পর যদি দেখা যায় রং হলুদ হয়ে গেছে তাহলে আমসত্ত্ব ভাল হবে না। পাকা আমের আমসত্ত্ব কাঁচা আমের মত হবে। কাঁচা আমের আমসত্ত্ব বেশি ভাল।

২। আমের খোসা ছাড়িয়ে আঁটি ফেলে টুকরা করে ২-৩ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।

৩। পানি থেকে আম তুলে খুব অল্প পানি দিয়ে আম সিদ্ধ দিন। ভালভাবে সিদ্ধ হলে আম চালনি দিয়ে চেলে নিন।

৪। গুড় ভেঙ্গে আধা কাপ পানি দিয়ে উনুনে দিন। বড় বড় ফেনা হয়ে ফুটে উঠলে এবং আঠাল হলে নামিয়ে আম এবং লবণ দিয়ে মিশিয়ে আবারও উনুনে দিয়ে নাড়তে থাকুন। ফুটে উঠার পরে বেশ থকথকে হলে নামিয়ে নিন।

৫। ট্রে বা ডালায় তেল মাখিয়ে আমসত্ত্ব ঢালুন। চামচ দিয়ে সমান করে বিছিয়ে দিন। ৩ দিন চড়া রোদে রেখে আমসত্ত্ব ভাল করে শুকান। ঠিকমত শুকাবার পরে রোল করে পেঁচিয়ে রাখুন। বৈয়ামে বা বোতলে মুখ বন্ধ করে ৫/৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

তেঁতুলের আচার

তেঁতুল আমাদের দেশের একটি বারমাসি আচারের ফল। এই আচার সারা বছর চলে। গরমের সময় তেঁতুল পাকে। ঘরে তেঁতুলের আচার করা খুবই সহজ এবং এ আচার সহজে নষ্ট হয় না।

উপকরণ ও পরিমাণ

তেঁতুল, বীচিসহ	১ কেজি	বড় এলাচ	৩ টি
ধনে	৪ ভাগের ১ চামচ	দারচিনি, ২ সে.মি.	২ টুকরা
জিরা	১ টেবিল চামচ	তেজপাতা	১
রাঁধুনি	১ চা চামচ	শুকরা মরিচ	১০ টি
জইন	১ চা চামচ	জায়ফল, গুড়া	আধা চা চামচ
কালজিরা	দেড় চা চামচ	লবণ	১ চা চামচ
মেথি	দেড় চা চামচ	আখের গুড়	১ কেজি
গোলমরিচ	১ চা চামচ	সরিষার তেল	দেড় কাপ
লবঙ্গ	৩ টি	মৌরি	আধা টেবিল চামচ

১। তেঁতুল পরিষ্কার করে ধুয়ে সামান্য পানিতে ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন।
২। সব মসলা আলাদা ভেজে গুঁড়া করুন।
৩। তেঁতুল মোটা বাঁশের চালনিতে ছেনে নিন। ট্রেতে ছড়িয়ে দিয়ে ৩/4 ঘন্টা চড়া রোদে শুকান। গুড় মিশান। চুলায় দিয়ে জ্বাল দিন। ফুটে উঠলে নামিয়ে নিন।
৪। তেল ও মসলা মিশিয়ে আচার রোদে দিন। ২-৩ দিন রোদে দেয়ার পরে আচার তেল চকচকে দেখালে বোতলে ভরে নিন।

জ্যাম

জ্যাম সব ধরনের ফল দিয়ে করে অনেকদিন ঘরে রাখা যায়। পেকটিনসমৃদ্ধ ফলের শাঁস, চিনি ও সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে জ্যাম প্রস্তুত করা হয়। প্রয়োজন হলে জ্যামে খাওয়ার রং এবং সুগন্ধি দ্রব্য মিশান যায়। টাটকা পাকা সুগন্ধিময় ফল দিয়ে ভাল জ্যাম তৈরি হয়। মিশ্র ফল যেমন- কমলা ও লেবু, কমলা ও টমেটো মিশিয়েও জ্যাম করা যায়। জ্যামে চিনির পরিমাণ ৬৫% থাকতে হবে। উনুন থেকে নামিয়ে গরম জ্যাম সঙ্গে সঙ্গে নির্বীজিত বোতলে একেবারে মুখ পর্যন্ত ভরতে হয়। আনারস, কুমড়া, আম, গাজর ইত্যাদি দিয়ে জ্যাম তৈরি হয়।

আনারসের জ্যাম

উপকরণ ও পরিমাণ

আনারস ২ কাপ, চিনি $1\frac{1}{2}$ কাপ

১। আনারস কেটে বেটে নিন অথবা কুচিয়ে নিন।
২। আনারস ও চিনি একসাথে জ্বাল দিন। সিরা ঘন হলে বোতলে ভরে দিন।
৩। ঠান্ডা হলে বোতলের মুখে মোম লাগিয়ে জ্যাম ঢেকে ঢাকনা লাগিয়ে দিন।

জেলী

জ্যামের মত জেলীতেও ৬৫% চিনি থাকে। ফলের স্বচ্ছ পেকটিন নির্যাসের সাথে চিনি ও সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে জেলী তৈরি হয়। ১০৫° সেঃ উত্তাপে পৌছালেই জেলী উনুন থেকে নামাতে হয়। প্রতি কিলো পেকটিন নির্যাসের সঙ্গে সমপরিমাণ চিনি এবং ৮ গ্রাম সাইট্রিক এসিড মিশালে উন্নত মানের জেলী তৈরি করা যায়।

পেকটিন ঃ পেকটিন শর্করা জাতীয় পদার্থ, ফল ও সব্জিতে পাওয়া যায়। পেকটিন পানিতে দ্রবীভূত হয়। পেকটিন নির্দিষ্ট অনুপাতে চিনি ও পানির সাথে মিশে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যকে জমায়। জমাতে পারে বলেই জ্যাম ও জেলী প্রস্তুতে পেকটিন অপরিহার্য উপাদান। পেয়ারা, আম, কতবেল, করমচা, কাঁঠাল ইত্যাদি পেকটিনসমৃদ্ধ ফল।

পেয়ারার জেলী

উপকরণ ও পরিমাণ

পেয়ারা	৪০ টি	সাইট্রিক এসিড	১-1$\frac{1}{2}$ চা চামচ
পানি	৩০ কাপ	কাগজি লেবুর রস	৩ টে চামচ
চিনি	২ কেজি	১ কেজির বোতল	২ টি

১। পেয়ারা ধুয়ে টুকরা করুন। পানি দিন। ঢাকনা দিয়ে ২ ঘন্টা সিদ্ধ করুন। পেয়ারা নাড়বেন না। পানি অধিক হলে নামিয়ে নিন।
২। পাতলা কাপড়ে ২ ভাজ করে একটি হাঁড়ি খুলে রেখে পেয়ারা ঢেলে দিন। পেয়ারা নাড়াবেন না। আলতভাবে চিপে রস নিংড়ে নিন।
৩। পেয়ারার রস মেপে প্রতি কাপ রসের জন্য $\frac{3}{4}$ কাপ চিনি নিন।
৪। পেয়ারার রস চিনি দিয়ে জ্বাল দিন। হাঁড়ি কোনায় ভরে গেলে সাইট্রিক এসিড দিন।
৫। বাটিতে পানি দিয়ে এক ফোঁটা জেলী ফেলুন। জেলী জমলে নামিয়ে ফেলুন এবং বোতলে ভরুন। ঠান্ডা হলে মুখ বন্ধ করুন। বেশি ঘন হলে শক্ত হয়ে যাবে। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

মোরাব্বা

চালকুমড়া, কাঁচা আম, আমলকি, বেল, কাঁচা পেপে, গাজর ও আদা দিয়ে মোরব্বা প্রস্তুত করা যায়। ঘন চিনির সিরাপে সংরক্ষিত ফল বা সব্জিকে মোরব্বা বলে। মোরব্বায় চিনি ৭০% থাকে। চিনির ৭০% ঘনত্বে অণুজীব জন্মাতে পারে না। মোরব্বার বোতলে বাতাস ঢুকলে ছাতা ধরার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ছোট ছোট বোতলে মোরব্বা সংরক্ষণ করা শ্রেয়।

আমলকির মোরব্বা

<u>**উপকরণ ও পরিমাণ**</u>

আমলাকি	১ কেজি	চিনি	1$\frac{1}{2}$ কেজি
ভিজানো চুন	অল্প		

১। আমলকি ধুয়ে খেজুর কাঁটা দিয়ে চারদিক ভাল করে কেঁচে নিন। ডুবো পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। মাঝে মাঝে পানি বদলাবেন।
২। চুনের পানিতে আমলকি (অল্প চুন পানিতে দেবে) ৪-৫ ঘন্টা ভিজান।
৩। আমলকি ২-৩ বার ধুয়ে ফুটান পানিতে সিদ্ধ করুন।
৪। তিন কাপ পানিতে চিনির সিরা করে ছেঁকে নিন।
৫। আমলকি পানি নিংড়ে সিরায় দিন। ১ ঘন্টা আস্তে জ্বাল দিন।
৬। পরের দিন জ্বাল দিয়ে সিরা ঘন হলে উনুন থেকে নামান। গরম মোরব্বা পরিষ্কার শুকনা বোতলে ভরুন।

স্কোয়াস

পাকা ফলের রস, চিনি, খাওয়ার রং, সুগন্ধি ও সংরক্ষক দ্রব্য সহযোগে তৈরি স্কোয়াস একটি পানীয়। লেবু, কমলা, আনারস, আম, তরমুজ, জাম্বুরা স্কোয়াস তৈরির উপযোগী ফল। পাকা এবং সুগন্ধিময় ফলের স্কোয়াস ভাল হয়। তবে কাঁচা আম এবং ডাঁসা পেয়ারা দিয়েও স্কোয়াস তৈরি করা যায়। স্কোয়াসে ৪০%-৪৫% চিনি, ২৫% ফলের রস এবং ১.৫%-৩% সাইট্রিক এসিড থাকলে স্বীকৃত মানের স্কোয়াস বলা যায়। ঘরোয়াভাবে তৈরি স্কোয়াসে সমপরিমাণ ফলের রস ও পানির দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি দেওয়া হয়। প্রতি লিটার উৎপাদিত স্কোয়াসে ৬০০ মিলিগ্রাম সংরক্ষকদ্রব্য মিশান যেতে পারে।

কাঁচা আমের স্কোয়াস

<u>**উপকরণ ও পরিমাণ**</u>

কাঁচা আম ৪ টি সিরাপ বা চিনি ১ কাপ ঠান্ডা পানি ৩ কাপ লাল বা সবুজ রং সামান্য

১। কাঁচা আম খোসা ছাড়িয়ে স্লাইস করুন। আম ছেঁচে অথবা ব্লেন্ডারে দিয়ে রস ছেঁকে নিন। পানি ও সিরাপ মিশিয়ে রিফ্রিজারেটারে রাখুন।

২। পরিবেশনের আগে সামান্য রং প্রয়োজন হলে দেওয়া যেতে পারে। বরফের কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।

মূলার পিকেল্স

উপকরণ ও পরিমাণ

সাদা বড় মুলা	$\frac{1}{2}$ কেজি	আদা কুচি	$\frac{1}{4}$ চা চামচ
শালগম	২০ গ্রাম	শুকনা মরিচ, গুঁড়া	$\frac{1}{2}$ চা চামচ
পেঁয়াজ কুচি	১ টি	লবণ	$1\frac{1}{2}$ টে চামচ
রসুন কুচি	৫ কোষ	ফুটানো পানি	$1\frac{1}{4}$ কাপ

১। মূলার খোসা ছাড়িয়ে ১ সে.মি. চৌকা টুকরা করুন। শালগম খোসা ছাড়িয়ে ছোট টুকরা করুন। এখন বাতাসে পানি শুকিয়ে নিন।

২। সব মশলা ও অর্ধেক লবণ একসাথে মিশিয়ে সব্জি দিয়ে মেশান। বড় মুখের বোতলে দিয়ে চামচ দিয়ে ভরে রাখুন।

৩। ফুটানো পানিতে বাকি লবণগুলো বোতলে ঢেলে দিন। অল্প ঠান্ডা হলে বোতলে মুখ বন্ধ করে ৫-৬ দিন গরম এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

পিকেল্স

শীতের সবজি, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ ইত্যাদি সিরকায় ডুবিয়ে রেখে পিকেল্স করা হয়। পিকেল্সের গন্ধ ও স্বাদ উন্নত করার জন্য বিভিন্ন রকম সুগন্ধি পাতা ও গোটা মসলা দেয়া হয়।

কাগজি লেবুর জারক

উপকরণ ও পরিমাণ

কাগজিলেবু	১০ টি
লবণ	১ টেবিল চামচ
সিরকা	১ কাপ

১। নতুন হাঁড়িতে অথবা খসখসে জায়গায় কাগজিলেবুর উপরের সবুজ আবরণ ঘষে তুলুন। ধুয়ে লবণ মেখে ২ দিন রোদে রাখুন।

২। লেবু বৈয়ামে ভরুন। সিরকা ঢেলে দিন। লেবু যেন সিরকায় ডুবে থাকে। বৈয়ামের মুখ বন্ধ করে কয়েকদিন রোদে রাখুন।

সারাংশ

গৃহে খাদ্য সংরক্ষণ একটি সহজ সংরক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আমসত্ত্ব, তেঁতুলের আচার, জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, পিকেলস, লেবুর জারক প্রভৃতি সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো প্রয়োগে গৃহে মৌসুমী ফলমূল সংরক্ষণ করতে পারা যায়। এতে গৃহ খাদ্য অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। মৌসুম ছাড়াও খাদ্য বস্তু সহজলভ্য হয়। গৃহিণী ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনেও সক্ষম হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আমাদের দেশে আম কখন পাওয়া যায়?
ক. বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে খ. ভাদ্র, আশ্বিন মাসে
গ. পৌষ, মাঘ মাসে ঘ. আশ্বিন, কার্তিক মাসে

২। কোন আমের আমসত্ত বেশি ভাল হয়?
ক. পাকা আমের খ. আটি শক্ত আমের
গ. কাঁচা আমের ঘ. খুব কচি আমের

৩। তেঁতুলের আচার কতদিন থাকে?
ক. ছয় মাস খ. তিন মাস
গ. কয়েক মাস ঘ. সারা বছর

৪। জ্যামের চিনির পরিমাণ কত থাকতে হবে?
ক. ৫০% খ. ৬০%
গ. ৬২% ঘ. ৬৫%

৫। পেকটিনসমৃদ্ধ ফল কোনটি?
ক. লেবু খ. আমলকি
গ. পেঁয়াজ ঘ. আনারস

৬। মোরব্বাতে কত ভাগ চিনির পরিমান থাকলে অণুজীব জন্মাতে পারে না?
ক. ৫০% খ. ৫৫%
গ. ৭০% ঘ. ৮০%

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গৃহে সংরক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা কোন কোন ফলমূলকে ব্যবহার করতে পারি তার একটি তালিকা দিন।
২। জ্যাম ও জেলী বলতে কি বোঝেন? পেকটিন কি?
৩। মূলার পিকেল্‌স কীভাবে তৈরি করবেন? লিখুন।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ১০

অনুশীলনী- ১০.১	ঃ ১। খ	২। ক	৩। ক	৪। গ	৫। গ	৬। ক	
অনুশীলনী- ১০.২	ঃ ১। গ	২। খ	৩। গ	৪। ঘ	৫। ক	৬। ক	৭। গ
অনুশীলনী- ১০.৩	ঃ ১। খ	২। ক	৩। গ	৪। গ	৫। খ	৬। গ	
অনুশীলনী- ১০.৪	ঃ ১। খ	২। খ	৩। ঘ	৪। খ	৫। গ	৬। ক	
অনুশীলনী- ১০.৫	ঃ ১। ঘ	২। খ	৩। গ	৪। ঘ	৫। ক	৬। গ	
অনুশীলনী- ১০.৬	ঃ ১। গ	২। ক	৩। ঘ	৪। ক	৫। গ	৬। ক	
অনুশীলনী- ১০.৭	ঃ ১। ক	২। গ	৩। খ	৪। খ	৫। গ	৬। গ	

ইউনিট ১১ খাদ্য সরবরাহ

ভূমিকা

আমাদের খাদ্যের সরবরাহ বিভিন্ন উৎস হতে আসে-

১) ক্ষেত ও বাগান (শস্য, ডাল, আলু, বাদাম, শাক-সব্জি, ফল)

২) খামার, খোয়াড় (গবাদি পশু, হাঁস মুরগি, ডিম দুধ)

৩) নদনদী, পুকুর, সাগর (মাছ)

উৎস হতে পরিবারের কাছে খাদ্যের সরবরাহ সরাসরি হতে পারে। আবার প্রক্রিয়াজাতকরণের পরও হতে পারে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম সরাসরি সরবরাহ করা হয়। খাদ্য ভাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হয়। খাদ্যের সরবরাহে বিভিন্ন ধাপ থাকে যেমন কাটা পরিষ্কার করা, গুদামজাত করা, পরিবহণ করা, রান্না করা ইত্যাদি। একে খাদ্য শিকল (food chain) বলে। এর যে কোন ধাপে খাদ্যবস্তু জীবাণু দিয়ে সংক্রামিত হতে পারে।

খাদ্য উৎপাদন ও উত্তোলন ⟶ গুদামজাতকরণ পরিবহন ⟶ প্রক্রিয়াজাতকরণ ⟶ গ্রহণ

খাদ্য সরবরাহের শিকল (Food supply chain)

জীবাণু এককোষী প্রাণী, যা খালি চোখে দেখা যায় না। বিশেষ বিশেষ জীবাণু বিশেষ বিশেষ রোগ সৃষ্টি করে। মাটি, পানি, মানুষের ও প্রাণীর মল, বাতাস প্রভৃতি হতে জীবাণু খাদ্যে প্রবেশ করে এবং উক্ত খাদ্য ভক্ষণে দেহে রোগ হয়। এই সব রোগকে খাদ্যবাহিত রোগ বা food borne diseases বলে। সাবধানতা অবলম্বনে খাদ্য বাহিত রোগের প্রার্দুভাব কমানো যায়।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই ইউনিটে কেবল খাদ্য বাহিত রোগের কারণ, জনস্বাস্থ্য সমস্যা, এবং খাদ্য সরবরাহে স্বাস্থ্যসম্মতবিধি বিষয়গুলো সীমাবদ্ধ রেখেছি। এই ইউনিটকে তিনটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে-

পাঠ- ১১.১ ঃ খাদ্যবাহিত রোগ ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা

পাঠ- ১১.২ ঃ অণুজীব দিয়ে খাদ্য রোগ সংক্রমণ

পাঠ- ১১.৩ ঃ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহে নিরাপত্তাবিধি

পাঠ- ১১.১ ঃ খাদ্য বাহিত রোগ ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্যবাহিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রোগের নাম বর্ণনা করতে পারবেন
- খাদ্যবাহিত রোগের সংক্রমণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- খাদ্যবাহিত রোগের সাথে স্বাস্থ্য সমস্যার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন

আমাদের দেশে খাদ্য ও পানিবাহিত রোগের (food and water borne diseeses) প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। প্রায় ৩০ প্রকারের অণুজীব, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, খাদ্যবাহিত হয়ে মানবদেহে সংক্রমণ করে। এদের মধ্যে টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, জন্ডিস অন্যতম। এই সব রোগজীবাণু মল ও মুখের মাধ্যমে (fecal and oral route) দেহে প্রবেশ করে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যবাহিত রোগের নাম দেওয়া হল:

রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব	**রোগ**
ব্যাক্টেরিয়া (Bacteria)	টাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড স্যালমোনেলা শিগেলা ট্রেপটোকক্কাস
ভাইরাস (virus)	ভাইরাল হেপাটাইটিস
পরজীবী (parasites)	কৃমিরোগ আমাশয়

খাদ্যবাহিত রোগের কারণ প্রধানত দুটি-

১। জীবাণুদুষ্ট খাদ্য গ্রহণ, অর্থাৎ যে সব খাদ্যে জীবাণু রয়েছে এবং যা খাওয়ার পর দেহে রোগ সৃষ্টি হয় সেসব খাদ্য গ্রহণ। একে food infection বলে। এই খাদ্য গ্রহণের পর জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও ক্রিয়ার ফলে রোগের সূচনা ও লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। দূষিত খাদ্য গ্রহণ হতে রোগের লক্ষণ প্রকাশের মেয়াদ ৩-২১ দিন পর্যন্ত হয়।

২। খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি। এই বিষাক্ত পদার্থ (toxin) জীবাণুর ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। একে খাদ্য বিষক্রিয়া (food poisoning) বলে। খাদ্য গ্রহণ হতে রোগ লক্ষণের প্রকাশের সময় খুব অল্প হয়। সালমোনেলা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস প্রভৃতি জীবাণু খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটায়।

খাদ্যবস্তুর মধ্যে অণুজীবের প্রবেশ নানাভাবে হতে পারে। দূষিত মাটি, পানি, অপরিচ্ছন্ন পাত্র ইত্যাদিতে খাদ্য রাখলে জীবাণু খাদ্যে প্রবেশ করে। ইদুঁর, তেলাপোকা, মাছি প্রভৃতি বাহকের মাধ্যমেও জীবাণু খাদ্যে প্রবেশ করে। এই খাদ্য খাবার পর জীবাণুর বংশবৃদ্ধি পরিপাকতন্ত্রে হয় এবং জীবাণু হতে উৎপন্ন টকসিন দেহে রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করে। এ সব রোগ হচ্ছে টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি।

কিছু কিছু অণুজীব খাদ্যে প্রবেশ করে বিষাক্ত উপাদান উৎপন্ন করে। যখন এই খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তখন বিষাক্ত উপাদান সরাসরি দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তাড়াতাড়ি বিষক্রিয়ার লক্ষণ সৃষ্টি করে। এই ধরনের খাদ্যবাহিত রোগ হচ্ছে স্ট্যাফাইলোকক্কাল, বটিউলিনাম ইত্যাদি। পেট ব্যাথা, ডায়রিয়া, মথাব্যাথা, পানিশূন্যতা প্রভৃতি বিষক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।

খাদ্যবাহিত রোগের সংক্রমণে তিনটি বিষয় প্রভাবিত করে-

১। **রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু (Agent) ঃ** নির্দিষ্ট জীবাণু দিয়ে নির্দিষ্ট রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন কলেরা জীবাণু v. cholera হতে কলেরা রোগ হয়। এ্যামিবা হতে আমাশয় ইত্যাদি।

২। **পোষক (host) ঃ** যেখানে জীবাণু বসবাস করে সেখানে বংশবৃদ্ধি করে। মানবদেহ, অন্যান্য কীট, ইদুঁর, উদ্ভিদ, পানি, জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৩। **সংক্রমণের জন্য মাধ্যম (media) ঃ** এই যে মাধ্যমে রোগ জীবাণু খাদ্য অথবা দেহে প্রবেশ করে, তা পরোক্ষ (indirect) বা প্রত্যক্ষ (direct) হতে পারে। পরোক্ষ সংক্রমণের মাধ্যমে রোগ জীবাণু নাক, মুখ, যৌনাঙ্গ প্রভৃতি প্রবেশদ্বার হতে অথবা কাটা ক্ষতস্থান, লালা, শ্লেষ্মা, কফ, থুথু হতে সরাসরি দেহে প্রবিষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ সংক্রমণে জীবাণু অন্য মাধ্যম যেমন পানি, খাদ্য, রক্ত প্রভৃতি হতে দেহে প্রবেশ করে।

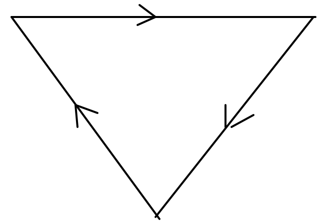

খাদ্য বাহিত রোগের সংক্রমণ

স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলেই চলবে না, তার সাথে খাদ্য কিভাবে বিশুদ্ধ থাকে এবং দূষিত হয়, সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে, শরীর রোগজীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয়ে পুষ্টিহীন হয়ে পড়বে। রোগ জীবাণু সহজেই উষ্ণতা, আদ্রতা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে দ্রুত বৃদ্ধি করে। স্বাস্থ্য রক্ষায় রোগ জীবাণুর বংশবৃদ্ধি রোধ এবং জীবাণু ধ্বংস করে খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত রাখা আবশ্যক। সংক্রমক রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও সজীবতা সবই নষ্ট হয়, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমনকি খাদ্যবাহিত রোগের কারণে অনেক শিশু ডায়রিয়ার আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশে আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি খাদ্যবাহিত রোগ জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

উন্নয়নশীল দেশের জনজীবনের বৈশিষ্ট হচ্ছে ঘনবসতি, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য, পয়:নিষ্কাশনের অব্যবস্থা, দূষিত পানি ও খাদ্য ত্রুটিপূর্ণ, খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ যার ফলে রোগ জীবাণুর বৃদ্ধি ও সংক্রমণ খুবই দ্রুত ও ব্যাপক হারে হয়। খাদ্যবাহিত রোগ একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। প্রতিবছর জনগণের এক বিরাট অংশ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবাহিত রোগের আক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং এমনকি মৃত্যুবরণও করছে। জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জনগণকে রোগ সংক্রমণের প্রতিরোধ পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং পরিচালনা করতে হবে। নিম্নলিখিত উপায়ে খাদ্যবাহিত রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়ঃ

১। **রোগের প্রসার প্রতিরোধ করা ঃ** কোন আক্রান্ত ব্যাক্তি সনাক্ত করার পর তার ব্যবহৃত জিনিসকে আলাদা করে রাখা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মলমূত্র, বমি, কফ ইত্যাদি অপসারণ করা, যাতে রোগ জীবাণুর বিস্তার না ঘটে।

২। দেহের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নতি করা যাতে করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

৩। জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করা এবং জীবাণু ধ্বংস করা। পরিবেশ পরিষ্কার রাখা, বিশুদ্ধ পানি পান, খাদ্য সরবরাহে ও সংরক্ষণে সতর্কতা অবলম্বন, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি পালনের মধ্য দিয়ে জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ ও জীবাণু ধ্বংস করা যায়। ভালভাবে খাবার পানি ফুটিয়ে খেলে, হাত, নখ, থালা, বাসন ইত্যাদি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে খাদ্য গ্রহণ করলে রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়।

সারাংশ

আমাদের দেশে খাদ্যবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি, যার কারণে জনগনের এক বিরাট অংশ ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। জীবাণুদুষ্ট খাদ্য গ্রহণ অথবা জীবাণুর আক্রমণে খাদ্যে বিষাক্ত উপাদান গ্রহণ উভয়ই দেহে রোগ সংক্রমণ করে। এসব রোগ সংক্রমণের জন্য জীবাণু, পোষক এবং মাধ্যম প্রয়োজন। খাদ্য বাহিত রোগের সংক্রমণ রোধর জন্য এর বিস্তার প্রতিরোধ করতে হবে এবং জীবাণু ধ্বংস করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি খাদ্যবাহিত রোগ নয়?

ক. ক্যানসার
খ. আমাশয়
গ. টাইফয়েড
ঘ. স্যালমোনেলা

২। খাদ্যবাহিত রোগের প্রধান কারণ কি?

ক. সঠিকভাবে খাদ্য গ্রহণ না করা
খ. জীবাণুমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা
গ. বিশুদ্ধ পানি পান করা
ঘ. অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা

৩। খাদ্যের বিষক্রিয়ার জন্য কোন অণুজীব দায়ী?

ক. কলেরা জীবাণু
খ. ভাইরাস
গ. ম্যালেরিয়া
ঘ. স্যালমোনেলা

৪। নিচের কোনটি খাদ্যবাহিত রোগের মাধ্যম?

ক. অক্সিজেন
খ. দুধ
গ. আলো
ঘ. উদ্ভিদ

৫। জীবাণু বৃদ্ধি রোধে নিচের কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী?

ক. খাদ্যকে না ধুয়ে খাওয়া
খ. খাদ্যকে খোলা বাতাসে রাখা
গ. খাদ্যকে ভালভাবে ফুটিয়ে খাওয়া
ঘ. খাদ্যকে আলোতে রাখা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কি কি বিষয় খাদ্য বাহিত রোগ সংক্রমণে প্রভাবিত করে?

২। খাদ্যবাহিত রোগের নাম এবং এসব রোগের সমস্যাগুলো সম্পর্কে লিখুন।

৩। খাদ্যবাহিত রোগের সংক্রমণ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

পাঠ- ১১.২ ঃ অণুজীব দিয়ে খাদ্য রোগ সংক্রমণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্য রোগ সংক্রমণে অণুজীবের নাম বর্ণনা করতে পারবেন
- কীভাবে অণুজীব খাদ্যে প্রবেশ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন

অণুজীব দিয়ে খাদ্য রোগ সংক্রমণ জনস্বাস্থ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কিছু কিছু অণুজীব দেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। এদেরকে খাদ্যবাহিত রোগ (food borne diseases) বলে। এই রোগ সংক্রমণ দুভাবে হতে পারে।

১। ব্যাক্টেরিয়া সরাসরি খাদ্যের সাথে মানবদেহে প্রবেশ করে তারপর রোগ সৃষ্টি করতে পারে। একে food infection বলে। টাইফয়েড, কলেরা, হেপাটাইটিস প্রভৃতি এভাবে সৃষ্টি হয়।

২। ব্যাকটেরিয়া আগের থেকেই খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে এবং সেই বিষাক্ত উপাদান গ্রহণের পরপরই দেহে অসুস্থতার লক্ষণাদি দেখা দেয়। একে খাদ্যের বিষক্রিয়া (food poisoning) বলে।

নিচে কয়েকটি খাদ্যবাহিত রোগের নাম, সংক্রমণের কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছকে দেখান হল ঃ

রোগের নাম	অণুজীবের নাম	সংক্রমণ ও লক্ষণ	প্রতিরোধ ব্যবস্থা
টাইফয়েড (Typhoid)	স্যালমনেলা টাইফি (Salmonella typhi)	অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, দূষিত পানি, খাদ্য। মল, মূত্র দিয়ে সংক্রামিত হয়; জ্বর, মাথাব্যাথা, জিহ্বায় আস্তর পড়ে। পেটে ব্যথা হয়।	রোগীর মল, মূত্র, উচ্ছিষ্ট খাদ্য নিরাপদে ফেলা রোগীর ব্যবহৃত থালাবাসন ফুটানো পানিতে ধোয়া, পানি ও খাদ্য ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে খাওয়া। উপযুক্ত ওষুধ গ্রহণ।
কলেরা (Cholera)	ভিবরিও কলেরা (vibrio cholera)	জ্বরের সাথে বমি ও ঘন ঘন পায়খানা, রোগী দুর্বল, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শিশুদের জন্য মারাত্মক হতে পারে।	পানি শূন্যতা রোধের জন্য ORS গ্রহণ। ডায়রিয়া রোধের জন্য বিশেষ ওষুধ গ্রহণ। খাবার জীবাণুমুক্ত রাখা।
আমাশয় (Amoebiasis)	ই, হিসটোলাইটিকা (E. histolytica)	ঘন ঘন পাতলা পায়খানা শ্লেষ্মা ও রক্ত থাকবে। তলপেটে ব্যাথা। জ্বর থাকতে পারে। খাদ্য ও পানির মাধ্যমে দেহে প্রবেশ।	উপযুক্ত ওষুধ সেবন, পানি ও খাদ্য ফুঠিয়ে খাওয়া, ঢেকে রাখা। কাঁচা শাকসব্জি, ফল ভালভাবে ধুয়ে খাওয়া।
কৃমিরোগ (Ascariasis)	এসকারিস লাম্ব্রিকয়েডস (গোলকৃমি) (Ascaris lumbricoids)	ব্যাপক আকারে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। কৃমির ডিম মলত্যাগের মাধ্যমে খাদ্য ও পানি দূষিত করে। শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, রক্তস্বল্পতা হয়, কখনও পাতলা পায়খানা, খাওয়ায় অরুচি প্রভৃতি দেখা দেয়।	ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মল নিষ্কাষণ, নখ কাটা। জীবাণুমুক্ত করে খাবার ও পানি গ্রহণ। কাঁচা সব্জি ও ফল না খাওয়া, মানুষের মল সার হিসেবে ব্যবহার না করা।

খাদ্য গ্রহণের সময় তাতে জীবাণু দিয়ে উৎপন্ন টকসিন জাতীয় পদার্থ থাকলে দেহে বিষক্রিয়ার লক্ষণাদি দেখা দেয়।

নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খাদ্যবাহিত বিষক্রিয়ার নাম, লক্ষণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছকের মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

রোগের ও অণুজীবের নাম	রোগের লক্ষণ ও কারণ	প্রতিরোধ ব্যবস্থা
স্যালমনেলসিস (Salmonellosis) স্যালমনেলা ব্যাক্টেরিয়া	দূষিত খাদ্য ও পানি গ্রহণ। মাংস, ডিম, দুধে বংশ বৃদ্ধি করে। পাতলা পায়খানা, জ্বর, পেট ব্যাথা, মাথা ধরা থাকে।	জীবাণু মুক্ত খাদ্য ও পানি গ্রহণ, বাসি, পচা ও উদ্বৃত্ত খাদ্য গ্রহণ হতে বিরত থাকা। ORS গ্রহণ ও সহজ পাচ্য খাদ্য গ্রহণ। প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন।
বটিউলিজম Botulism Cl. বটিউলিনাম	স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন হয় বলে, চোখে দুটো জিনিস দেখে হজমে অসুবিধা, অবসন্নতা, শ্বাস কষ্ট। টিন্‌জাত খাদ্যে জীবাণু বেঁচে থাকে। আক্রান্ত নষ্ট খাদ্যবস্তুতে জীবাণু অনেক দিন পর্যন্ত জীবিত থাকে।	টিনজাত খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন। পচা টিনজাত খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা। খাদ্য ভালভাবে উচ্চ তাপে ফুটানো। শ্বাস কষ্ট রোগীদের হাসপাতালে স্থানান্তর।
স্ট্যাফাইলোকক্কাল (staphylococcal) ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস staphy pcocmb awreus	বমি, পেটের পীড়া, পাতলা পায়খানা, মলের সাথে আম ও রক্ত থাকতে পারে। বেকারি খাদ্য, মাংস, পুডিং, ক্রীম, সস্‌, জ্যাম, সালাদ ইত্যাদিতে সংক্রামিত হয়। নোংরা হাত, নখ, ব্রন, ক্ষতস্থান, পুঁজ, মল হতে খাদ্যে প্রবেশ করে।	ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, তৈরি খাবার অল্পসময়ে খেয়ে ফেলা, উচ্চতাপে খাদ্য ও পানি ফুটানো এবং বাসি, পচা খাবার বর্জন করা।

কয়েকটি খাদ্যের জীবাণু দূষণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা

খাদ্যের নাম	যে জীবাণু খাদ্য দূষিত করে	প্রতিরোধ ব্যবস্থা
দুধ ও দুধ জাতীয় খাদ্য (দই, ছানা, ক্রীম)	স্যালমোনেলা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়্যাস স্টেপ্টোকক্কস ল্যাকটোব্যাসিলাস	ভালভাবে ফুটান পাস্তরাইজেশন হিমায়িতকরণ
মুরগি মাংস ও মাংস দিয়ে তৈরি খাদ্য কাবাব, প্যানিশ	স্যালমোনেলা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টেকক্কাস	ভালভাবে সিদ্ধ করা। কাবাব প্রস্তুতকরণে পরিচ্ছন্নতার প্রতি সতকর্তা অবলম্বন। হিমায়িতকরণ।
মাছ	স্যালমোনেলা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস	বরফে রাখা। উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেয়া।
মাংস ও মাছের কাবাব পিজ্জা, চাইনিজ খাবার, দুধের তৈরি খাবার	স্যালমোনেলা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস	খাওয়ার আগে ভালভাবে উত্তপ্ত করা

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবাহিত জীবাণুর সংক্রমণে ডায়রিয়া হতে পারে। ডায়রিয়াতে ঘনঘন পাতলা পায়খানা হয়। ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর অনেক শিশু প্রাণ হারায়। পানি শুন্যতা শিশুর জন্য মারাত্মক, তাই ডায়রিয়া হলে শিশুর আশু চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। যে সকল পরিবেশে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব বাড়ে, সেগুলো হচ্ছে- (১) ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশ, (২) অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, (৩) বিশুদ্ধ পানির অভাব, (৪) মল, মূত্র নিষ্কাষণের অব্যবস্থা, (৫) অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও গ্রহণ এবং (৬) অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানি।

১। ই, কোলাই (E. coli)- শিশুর খাদ্যে বিস্তার লাভ করে।

২। **শিগেলা** (shigella) ঃ ছোট ছেলেমেয়ে ও বড়দের মধ্যে সংক্রামিত হয়। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও পানিশূন্যতা দেখা দেয়।

৩। **রোটা ভাইরাস** (Rota virus) ঃ শিশুদের ডায়রিয়ার মধ্যে অন্যতম। এটি খাদ্য বাহিত রোগ। পাতলা পায়খানা, বমি এবং জ্বরে শিশুর স্বাস্থ্যহানি প্রকট হয়। ডায়রিয়াতে চিকিৎসা পদ্ধতি হচ্ছে (১) দেহে পানির সমতা ফিরিয়ে আনা, (২) অপুষ্টি দূর করা, (৩) জটিলতা দেখা দিলে হাসপাতালে নেওয়া (৪) উপযুক্ত ওষুধ গ্রহণ করা।

সারাংশ

খাদ্য বাহিত রোগের সংক্রমণে প্রতিবছর জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশ আক্রান্ত হয়। শিশুদের জন্য এই রোগ মারাত্মক হতে পারে। কিছু রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু খাদ্যের সাথে দেহে প্রবেশ করে এবং পরে রোগ সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় উল্লেখযোগ্য। কিছু রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্রিয়ায় খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় যা খাওয়ার পর পরই রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এগুলোকে খাদ্য দূষণ বলে। খাদ্য বাহিত রোগ প্রধানত দূষিত খাদ্য, পানি গ্রহণের পর হয় এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, মারাত্মক বলে শিশুদের প্রতি বেশি নজর দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২

নিচের সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

১। টাইফয়েড সৃষ্টিকারী অণুজীবের সঠিক নাম কোন্টি?
ক. স্যালমোনেলা টাইফি খ. ভিব্রিও কলেরা
গ. আমাশয় ঘ. এসকারিম

২। কোনটি দেহে পানিশূন্যতা রোধের জন্য অত্যাবশ্যক?
ক. সবুজ শাক খ. ORS
গ. মাংস ঘ. ডিম

৩। নিচের কোন অণুজীব খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে?
ক. ভাইরাস খ. এ্যামিবা
গ. স্যালমোনেলা ঘ. ইস্ট

৪। টীনজাত খাদ্যে কোন অণুজীব টিকে থাকে?
ক. বটিলিনাম খ. ম্যালেরিয়া
গ. ডিপথেরিয়া ঘ. ব্যাক্টেরিয়া

৫। শিশুদের ডায়রিয়াতে কোনটি অত্যাবশ্যক?
ক. খাবার বন্ধ করে দেওয়া খ. বেড়াতে নেওয়া
গ. মাথায় পানি দেওয়া ঘ. দেহে পানির সমতা ফিরিয়ে আনা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিশুদের জন্য ডায়রিয়া কেন মারাত্মক? শিশুদের মধ্যে কোন ডায়রিয়ার জীবাণু অন্যতম

২। খাদ্যবাহিত রোগের নাম ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন।

৩। সংক্ষেপে লিখুন ঃ ক) খাদ্য সংক্রমণ (food infection) এবং খ) খাদ্যের বিষক্রিয়া (food poisoning)

পাঠ- ১১.৩ ঃ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহে নিরাপত্তা বিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে খাদ্য সরবরাহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ♦ খাদ্যবাহিত রোগ সংক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- ♦ জাতীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহের বিধি পালনে উদ্যোগী হবেন

আমাদের স্বাস্থ্যের উপর খাদ্যের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন আছে, তা সত্ত্বেও দূষিত খাবারগুলো নানা রকম রোগ জীবাণু দিয়ে শরীর আক্রান্ত হয়ে অপুষ্টি ও মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। দেহের পুষ্টির জন্য খাবার অবশ্যই বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ হওয়া উচিত। বিভিন্নভাবে নানা রকম জীবাণু দিয়ে খাদ্য দূষিত হতে পারে। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্য অনেক রোগের জীবাণু বহনের মাধ্যমেও ঘটে। খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে কলেরা, আমাশয় টাইফয়েড, পেটের অসুখ, খাদ্যের বিষক্রিয়া এবং কৃমি ইত্যাদি রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে। সুতরাং শরীর ঠিক রাখতে হলে, সঠিক খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে কিছু স্বাস্থ্যনীতিও মেনে চলতে হবে।

উৎস হতে খাদ্যের গ্রহণ পর্যন্ত খাদ্যবস্তু বিভিন্ন পর্যায়ে জীবাণু দিয়ে দূষিত হতে পারে। তাই খাদ্য জীবাণুমুক্ত রাখতে হলে প্রথম থেকেই পরিচ্ছন্নতার প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

জীবাণুমুক্ত খাদ্য সরবরাহের প্রতি লক্ষ রেখে খাদ্যের বাজারজাতকরণের আগেই পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। নিচে খাদ্যের বিভিন্ন জীবাণুমুক্ত প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

খাদ্য	জীবাণুমুক্ত প্রক্রিয়া
দুধ	নীরোগ গাভী, দুধ দোয়ানোর সময় হাত পরিষ্কার, পাত্র পরিষ্কার রাখতে হবে। দুধ সরাসরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
মাংস	সুস্থ জীব, কসাইখানা পরিষ্কার রাখা এবং মাংস কাটার পর পাতলা জালি দিয়ে ঢেকে রাখা।
মাছ	মাছ ধরার পর ঠান্ডায় রাখা বা বরফের কুচি দিয়ে ঢেকে রাখা।
শস্য ও কন্দ জাতীয় খাদ্য	পোকা মাকড় হতে দূরে রাখতে হবে। পরিষ্কার, শুক্না গুদাম ঘরে রাখতে হবে।

পরিবহন এবং বাজারজাতকরণের সময় ও একই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। জীবাণুমুক্ত খাদ্য সরবরাহে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে-

১। সবজি বাগান, ক্ষেত, পুকুরের ধারে মলমূত্র ত্যাগ না করা। সার হিসেবে মানুষের মল ব্যবহার না করা।
২। উন্মুক্ত খাবার বিক্রি নিষিদ্ধ করা ও উন্মুক্ত স্থানে খাদ্য গ্রহণ হতে বিরত থাকা।
৩। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ও আবর্জনা ফেলা।
৪। ময়লা নর্দমা, টয়লেট ইত্যাদির পাশে খাবার বিক্রি নিষিদ্ধ করা।
৫। পানির উৎস সম্পর্কে সতর্ক থাকা। পানির দূষণ রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬। খাদ্য প্রস্তুতকরণের স্থান ময়লা আবর্জনা ও পায়খানা হতে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে।

পারিবারিক পর্যায়ে যে সকল নিরাপত্তা বিধি পালন করা আবশ্যক, সেগুলো হচ্ছে-

১। খাদ্য কেনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে মাছ, মাংস, দুধ যেন টাটকা হয় এবং উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেনা না হয়। দূষিত খাদ্যের কতগুলো সংকেত মনে রাখা উচিত। এগুলো হচ্ছে-

মাছ, মাংস, দুধ, ফল এবং রান্না করা খাদ্য-

⇒ পচা দুর্গন্ধ
⇒ ভিন্ন স্বাদ
⇒ খাদ্যের ওপরে ছাতা পড়া

⟹ মাছের চোখ বসা, কলসা ফ্যাকাশে আঁস ঢিলা
⟹ মাংসের গন্ধ, পিছলাটে ভাব
⟹ দুধ টক হওয়া
⟹ আটা, চাল, গম, বাদাম
⟹ স্যাঁতস্যাঁতে ভাব, ছাতা পড়া

মাখন, তেল, ঘি-
⟹ কটু গন্ধ

টিনজাত খাদ্য-
⟹ টিনে ফুটা হওয়া
⟹ ঢাকনা ঢিলে হওয়া
⟹ খাদ্যে গন্ধ, পিছলা জমিন (slipy)
⟹ ফ্যাকাশে রং

২। বাজার হতে খাদ্যবস্তু কেনার পর উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিতে হবে।
⟹ খাদ্যবস্তু ঠান্ডা, শুকনা জায়গায় রাখতে হবে।
⟹ খাদ্যবস্তু রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে।
⟹ আটা, চাল, ডাল, ঠান্ডা, শুক্‌না, কোন পাত্রে ঢেকে রাখতে হবে যাতে তেলেপোকা ইঁদুর খাবার নষ্ট করতে না পারে।

৩। খাদ্য প্রস্তুতকরণের সময় কিছু নিয়ম কানুন মানা হলে খাদ্য জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাবে। এগুলো হচ্ছে-
⟹ কাচাঁ ফল ও সবজি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে যাতে অণুজীব এবং কৃমির ডিম না থাকে।
⟹ কাটা খাদ্য ধূলা ও মাছি হতে ঢেকে রাখতে হবে।
⟹ খাদ্য তৈরির সময় হাত ও নখ পরিষ্কার রাখা ও ব্যবহৃত তৈজসপত্র যেন পরিষ্কার রাখা হয়।
⟹ খাদ্যবস্তুর ওপর কাঁশি, হাঁচি, নাক চুলকানো জিহ্বা দিয়ে আঙ্গুল কাটা প্রভৃতি বদঅভ্যাস হতে বিরত থাকতে হবে।
⟹ খাদ্যবস্তু ভালভাবে উতাপে ফুটিয়ে রাখা।

শিশুর জন্য খাদ্য প্রস্তুতকরণে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ শিশুরা সহজেই সংক্রামিত হয়ে অসুস্থ হয়।
⟹ দুধ ও চিনি খাওয়ার ঠিক আগে মেশালে জীবাণুর বৃদ্ধি কম হয়।
⟹ দুধের সাথে পানি মিশানো হলে, পানি যেন ফুটানো হয়।
⟹ উদ্বৃত্ত খাদ্য ভালভাবে ফুটিয়ে রাখতে হবে।
⟹ খাওয়ার পর থালাবাসন, চামচ ভালভাবে ধুয়ে শুকাতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহের জন্য নিরাপত্তাবিধিগুলো জনসাধারণের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাজে পৌঁছানো উচিত। সমাজে যাদের এই শিক্ষা দেওয়া যায়, তারা হচ্ছে-
(১) স্কুলগামী ছেলেমেয়েরা, (২) মা এবং খাদ্য প্রস্তুতকারীগণ, (৩) খাদ্য বিক্রেতাগণ, (৪) হোটেল ও রেস্তোরার ব্যবস্থাপক ও যারা খাদ্য পরিবেশন করে এবং (৫) খাদ্য প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, ক্যাফেটেরিয়া, হাসপাতালের পরিচালকগণ।

জনস্বাস্থ্য বিভাগ হতে পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে বাজার, হোটেল, রাস্তায় খাদ্য বিক্রি, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতির পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে। জনস্বাস্থ্যের অবনতি রোধ করা যাবে।

সারাংশ

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও খাদ্যবাহিত রোগের সংক্রামণ প্রতিরোধ করার জন্য নিরাপত্তাবিধি পালন করা উচিত। খাদ্য সরবরাহের বিভিন্ন ধাপে এই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। খাদ্য গুদামজাতকালে, খাদ্য কেনার সময় ও প্রস্তুতকরণের সময় কতগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হলে, খাদ্যবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যায়। জনগণের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে এই বিধি সম্পর্কে সচেতন করা হলে এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগ হতে নিয়মিত পরিদর্শন করা হলে। রোগাক্রমণের সম্ভবনা অনেকাংশে কমানো যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। জীবাণুমুক্ত খাদ্য গ্রহণে নিচের কোনটি পালন করা উচিত?
ক. উন্মুক্ত স্থানের খাবার না খাওয়া
খ. শাকসবজি না ধুয়ে খাওয়া
গ. বেশি করে পানি দিয়ে খাবার ধোয়া
ঘ. টাট্কা দুধ খাওয়া

২। মাছ, মাংস পচে গেলে কি ধরনের পরিবর্তন হয়?
ক. মাছ, মাংসের জমিন শক্ত হয়
খ. মাংসের রং লাল বর্ণ হয়
গ. মাছ নরম ও মাংস পিছলাটে হয়
ঘ. গন্ধহীন হয়

৩। টিনজাত খাদ্য ব্যবহারের আগে কোনটি দেখা উচিত?
ক. টিনের ঢাকনা শক্ত ও বায়ুশূন্য হয়ে আছে
খ. টিনের গায়ে লেবেল ঠিক মত আছে
গ. টিনের ওজন ঠিক মত আছে
ঘ. খাদ্যের রং উজ্জ্বল আছে

৪। খাদ্য প্রস্তুতকালে নিচের কোনটি করা উচিত নয়?
ক. খাদ্যকে ভালভাবে ধোয়া
খ. খাদ্যের টুকরা ছোট রাখা
গ. খাদ্য তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলা
ঘ. খাদ্যের উপর হাঁচি, কাঁশি দেওয়া

৫। শিশুর খাদ্য প্রস্তুতকরণে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কারণ কেন?
ক. শিশুরা চঞ্চল
খ. শিশুরা খেতে চায় না
গ. শিশুরা সহজেই সংক্রামিত হয়ে অসুস্থ হয়
ঘ. শিশুরা খাবার নষ্ট করে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। খাদ্য সংরক্ষণে ও প্রস্তুতকালে কি কি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?
২। খাদ্য কেনার সময় দূষিত খাদ্যের কতগুলো সংকেত মনে রাখা উচিত। সংকেতগুলো আলোচনা করুন।
৩। শিশুর খাদ্য প্রস্তুতকরণে কি কি সতর্কতা পালন করা উচিত।

প্রশ্নোত্তর ঃ অনুশীলনী- ১১

অনুশীলনী- ১১.১ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। খ ৫। গ
অনুশীলনী- ১১.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ
অনুশীলনী- ১১.৩ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। গ

ব্যবহারিক অংশ

ব্যবহারিক

ইউনিট- ১২

শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক

পাঠ- ১২.১ ঃ দেশীয় উপকণের সাহায্যে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর উপযোগী খেলনাসামগ্রী প্রস্তুত করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলনার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে পারবেন

☞ দেশীয় উপকরণের সাহায্যে কি কি ধরনের খেলনা তৈরি করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

☞ খেলনা তৈরির কলাকৌশল রপ্ত করতে পারবেন

আধুনিক ধারণা হল বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে শিশুরা নতুন কৌশল রপ্ত করে, শিশুর অতৃপ্ত ইচ্ছার তৃপ্তি ঘটে। খেলা হলে শিশুর মানসিক দ্বন্দ্ব মুক্তির স্বচ্ছল ও নিরাপদ প্রকাশ পথ এবং আত্মপ্রকাশের উত্তম পথ। খেলার মাধ্যমে শিশু নিজেকে বিভিন্ন রকম ভূমিকায় সাজায় এবং সে ভূমিকার সাথে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। এতে মনের তৃপ্তি সাধন হয়। সঠিক ভাবে পরিচালনা করলে খেলার মাধ্যমে শিশু সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ও সহানুভূতিশীল ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে। খেলার নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ জন্মে।

উন্নত বিশ্বে শিশুর মানসিক সমস্যা সমাধানের জন্য খেলার মাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়। শিশুর মনের বিরক্তি, রাগ দ্বন্দ্ব নিরাময়ের জন্য খেলা দিয়ে শিশু স্বাভাবিক হয়। এতে অশান্তি দূর হয়। সুতরাং শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দেশীয় উপকরণ দিয়ে শিশু নিজেই অনেক কিছু বানায়। এতে উপকরণের বস্তুগত গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারে; যেমন, কাদামাটি দিয়ে মাটি গোল করার চেষ্টা করে, পুতুল বানায়, পাখি বানায় ইত্যাদি। কাগজ দিয়ে নৌকা, পাখি বানাতে পারে। বালি, পুতি, কাপড়ের টুকরা, কাঠের টুকরা, গাছের পাতা ইত্যাদি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে। এতে শিশু কিছু বানানোর আনন্দে আত্মহারা হয় এবং মানসিক বিকাশের সাথে সাথে শিশু খেলার উপাদানকে আরও বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে।

খেলনা সামগ্রীর বেলায় ছেলেমেয়ের মধ্যে তফাৎ হয়। ছেলেরা বল খেলা, টেনিস খেলা, গাড়ি চালানো ইত্যাদি খেলা পছন্দ করে। মেয়েরা পুতুল খেলা, ঘর সাজানো, পুতুল বিয়ে, জন্মদিন, মা সেজে পুতুলকে খাওয়ানো ইত্যাদি আকর্ষণীয় খেলা দিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে সহযোগী মনোভাব গড়ে ওঠে। এধরনের অভিনয়মূলক খেলার ভিতর দিয়ে শিশুরা তার ভবিষ্যত কাজের কুশলতা অর্জন করে।

আমাদের দেশীয় উপকরণ দিয়ে এই শিশুদের জন্য অনেক খেলনা তৈরি করা যায়। ঘরে তৈরি খেলনার চাহিদাও বেড়ে গেছে। মাটি দিয়ে পুতুল, হাতি, ঘোড়া, কাছিম, প্রজাপতি, গ্লাস, মগ ইত্যাদি তৈরি করে। কাপড়ের টুকরা দিয়ে পাখি, ফুল, কল, বল, ভালুক, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, উট, পুতুল বানায়। কাগজ দিয়ে নৌকা, ফুল, পাখি তৈরি হয়। বিভিন্ন ধরনের খেলনা শিশুদের জন্য নিরাপদ। শিশুরা বড় আকারের কুকুর, ভালুক, ঘোড়া, উট, পুতুল কাগজ দিয়ে নৌকা, ফুল, পাখি তৈরি করে। এ ধরনের খেলনা শিশুদের জন্য নিরাপদ। শিশুরা বড় আকারের কুকুর, ভালুক, মেয়ে পুতুল, খরগোশ পছন্দ করে এবং প্রায়ই বিছানার পাশে শুইয়ে রেখে ঘুমায়। সে জন্য যেসব খেলনা যত আনন্দদায়ক হয় ততই শিশু আকৃষ্ট হয়।

নিচে একটি সহজ এবং শিশুকে আকৃষ্ট করে এমন একটি খেলনা পুতুল তৈরির নমুনা দেয়া হল।

উপকরণ ঃ বাদামি কাগজ, পেন্সিল, রাবার, স্কেল পিন, কাঁচি, ক্রিম রংয়ের কাপড়, সূই, আঠা, রঙিন, সুতা, মোটা সুতা/উল, তুলা, প্লাস্টিকের তার/সোডা পানের স্ট্র/লোহার তার। শাড়ির জন্য কাপড়, পুঁথি, বোতাম, জড়ি, রং-তুলি/কালি কলম ইত্যাদি।

পুতুল তৈরির ধাপ

বইয়ের ছবি দেখে কাগজে নকশা আঁকতে হবে। কাগজের নক্‌শা কেটে ক্রিম রংয়ের কাপড় দুভাঁজ করে তার উপর বসিয়ে আলপিন আটকিয়ে নকশার মাপে কাপড় কেটে ফেলুন। দ্বিতীয় ছবির মত প্লাস্টিকের তার বেঁধে কাপড়ের উপর বসিয়ে নক্‌শার একপাশে $\frac{1}{2}''$ জায়গা বাদ দিয়ে $\frac{1}{4}''$ ভিতরের চারপাশ ঘুরিয়ে রান সেলাই দিন। এবার $\frac{1}{2}''$ সেলাই বাদের জায়গা দিয়ে কাপড় উল্টিয়ে নিতে হবে। এতে পুতুলের সঠিক আকৃতি ফুটে উঠবে। এবার ঠিক বালিশ বানানোর মত ভিতরে তুলা অথবা টুকরা কাপড় কাঁচি দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে অথবা খড় কেটে নকশা করা কাপড়ের ভিতরে ঢুকাতে হবে। তুলা সমানভাবে ঠেসে ভরতে হবে যাতে প্রতি অংশে ঠিকমত তুলা ঢোকে। নতুবা পুতুল নরম হয়ে যাবে। এবার হাতের এবং পায়ের অংশের কিনারাগুলো যেখানে তুলা ঢুকেনি তেমনি জায়গাগুলোর কিনারা ভেতরের দিকে ঢুকিয়ে সেলাই করে দিতে হবে।

এবার নাক, চোখ, চুল, মুখ ইত্যাদি রং দিয়ে, সুতা দিয়ে অথবা কালি দিয়ে এঁকে দেয়া যায় প্রয়োজনে মোটা সুতা অথবা উল দিয়ে চুল বানানো যায়। পুঁতি দিয়ে পুতুলের গহনা বানানো যায়। টুকরা কাপড় অথবা ওড়নায় জড়ি বসিয়ে শাড়ি বানাতে হবে। চোখ বানানোর জন্য বাজারে পুতুলের জন্য তৈরি চোখ কিনতে পাওয়া যায়, পুঁতি অথবা বোতাম দিয়েও চোখ বানানো যায়। এভাবে একটি সুন্দর পুতুল তৈরি হয়। ঠিক একইভাবে কুকুর, ভালুক, বানর, বিড়াল, পাখি ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

ব্যবহারিক

ইউনিট- ১৩

খাদ্য ও পুষ্টি

ভূমিকা

তত্ত্বীয় খাদ্য ও পুষ্টির বিভিন্ন পাঠগুলোতে মেনু পরিকল্পনা, পরিবেশন, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক ভোজ ও আপ্যায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবহারিক পাঠে শুধু ব্যবহারিক দিকগুলোই আলোচনা করা হবে। তবুও ব্যবহারিক সকল পাঠগুলোর উপর কিছু আলোকপাত করা হল।

কি ধরনের খাবার পরিবেশন করা হবে তা পূর্বেই ঠিক করে খাদ্য কেনাকাটা ও রান্নার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য খাবারের তালিকা তৈরি করা হয়। এই খাবারের সুষম তালিকাকে মেনু বলা হয়। মেনু করার সুবিধা হল যে সহজে পরিমিত খরচে সুষম খাদ্য তৈরি করা যায়। খাদ্যকে বৈচিত্রময় ও আকর্ষণীয় করা যায়।

খাদ্য প্রস্তুতের কথা আসলে রান্নার কথাই সবার আগে মনে হয়। কিছু খাবার আছে যা আমরা কাঁচা অবস্থায় খেয়ে থাকি। বেশির ভাগ খাদ্যই রান্না করা হয়। কাঁচা অবস্থায় হোক আর রান্না অবস্থায় হোক খাদ্যকে খাওয়ার জন্য পূর্বে সঠিকভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। এই প্রস্তুতি বলতে খাদ্যের নির্বাচন ধোয়া, কাটা, বাছা অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্যকে খাওয়ার জন্য তৈরি করাকে বুঝায়।

আমরা সকল প্রকার খাদ্যই খেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের খেয়াল করতে হবে আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে সকল প্রকার খাদ্যের মিশ্রণে খাদ্যবস্তু তৈরি হচ্ছে কিনা; যেমন- শ্বেতসার জাতীয় ও প্রোটিন মিশ্রিত খাদ্য, খনিজ লবণ ও ভিটামিন জাতীয় খাদ্যবস্তু কীভাবে তৈরি করা যায় তা আমাদের জানতে হবে।

খাদ্য তৈরি করলেই চলবেনা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি আপ্যায়ন জানা একান্ত প্রয়োজন। নববর্ষ, জন্মদিন, আনুষ্ঠানিক ভোজ, বুফে পরিবেশন। এসব ধরনের আপ্যায়ন জানা থাকলে প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজতর হয়। আমরা গৃহে কিছু কিছু খাদ্য সংরক্ষণ করে থাকি। সেসব খাদ্যকে প্রথমে ভালভাবে নির্বাচন করে নিতে হবে। তারপর সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। আমরা এই ইউনিটে ব্যবহারিক কাজের জন্য তেলের আচার, আনারসের জ্যাম ও পেয়ারার জেলী তৈরি আলোচনা করব।

ব্যবহারিক কাজের সুবিধার্থে এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে ছয়টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ-২.১ ঃ স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনা, খাদ্য প্রস্তুত পরিবেশন ও তৈরি খাবারের মূল্য নির্ণয়
পাঠ-২.২ ঃ শস্য (শ্বেতসার জাতীয়) এবং ডালমিশ্রিত খাদ্য তৈরি
পাঠ-২.৩ ঃ প্রোটিন, খনিজ লবণ এবং ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি
পাঠ-২.৪ ঃ নববর্ষ উপলক্ষ্যে অতিথি আপ্যায়ন
পাঠ-২.৫ ঃ আনুষ্ঠানিক লাঞ্চে ৮ জন সম্মানিত অতিথি আপ্যায়ন
পাঠ-২.৬ ঃ খাদ্য নির্বাচন, প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ - তেলের আচার; আনারসের জ্যাম, পেয়ারার জেলী

পাঠ- ১৩.১ ঃ স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনা, খাদ্য প্রস্তুত পরিবেশন ও তৈরি খাবারের মূল্য নির্ণয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনার নমূনা থেকে যেকোন স্বল্প ব্যয়ের মেনু তৈরি করতে সক্ষম হবেন;
- খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং নিয়মনীতি অবলম্বনে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করতে পারবেন;
- যে কোন তৈরি খাবারের মূল্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন।

প্রত্যেক দিনে কি কি খাবার খাওয়া হবে তার একটি সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি করাকে মেনু বলে। স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। কারণ সীমিত ব্যয়ে প্রোটিনের সুষম বন্টন করতে বেশ চিন্তা করতে হবে। স্বল্প ব্যায় মেনু পরিকল্পনা একটি সুকঠিন কাজ। সেজন্য কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনার মাধ্যমেই অগ্রসর হতে হয়।

পরিবারের সদস্যদের সুষম খাদ্য পরিবেশনের জন্যও মেনু পরিকল্পনা করে নেওয়া উচিত। খাদ্য খাতে নির্ধারিত টাকার অংক যখন সীমিত থাকে তখন পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের জন্য স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনার সময় বয়স, শারিরীক অবস্থা, শ্রম, উপলক্ষ, আবহাওয়া ও মৌসুম, রুচি, সংরক্ষিত বা উদ্বৃত্ত খাদ্যের ব্যবহার, খাদ্য খাতে বাজেট ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়। কাগজে কলমে মেনু এখানে নিতে হবে। মেনু অনুসারে খাদ্য নির্বাচন, ক্রয় ও প্রস্তুত করতে হবে।

নিচে স্বল্প ব্যয়ে এক দিনের মেনু পরিকল্পনার ১ টি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

পরিবারের ৪ জন সদস্য প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে এক দিনের মেনু পরিকল্পনা

খাদ্যের নাম	**পরিমান**
সকাল	
আটার রুটি/চালের গুঁড়োর রুটি	মাঝারি ধরনের ৮ টি
বুটের ডাল/সব্জি	রান্না করা ২ কাপ
চা	২ কাপ
বেলা ১১ টায় ঃ মৌসুমী ফল ১ টি (যে কোন)	৪ টি
মধ্যাহ্ন ভোজন	
ভাত	রান্না করা ৮ কাপ
ছোট মাছের তরকারি	রান্না করা ২ কাপ
সবজি বা নিরামিষ	রান্না করা ৪ কাপ
ডাল	রান্না করা ২ কাপ
নৈশভোজ	
ভাত বা রুটি (আটা)	রান্না করা ৮ কাপ/৮টি
সবজি বা নিরামিষ	রান্না করা ৪ কাপ

স্বল্প ব্যয়ের মেনুতে প্রাণীজ প্রোটিনের প্রভাব একটু কম থাকে। খাদ্য প্রস্তুত করা মানে শুধু রান্না নয়, এর জন্য বিশেষ প্রস্তুতি প্রয়োজন।

খাদ্য প্রস্তুত

খাদ্য প্রস্তুত করার সময় লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ

১) কি খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে তা মেনু অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে।

২) যে খাদ্যগুলো প্রস্তুত করা হবে সেই খাদ্যগুলো তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং তৈজসপত্র ও ব্যবস্থাদি আছে কিনা তা দেখতে হবে। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল না থাকলে তা ক্রয় করতে হবে।

৩) রেসিপি অনুযায়ী খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।

যে কোন খাদ্য তৈরির পূর্বে নির্ধারিত খাদ্য বস্তুর পরিমাণ ও আনুসঙ্গিক রন্ধনযোগ্য উপকরণের নাম ও পরিমাণ এবং প্রণালী লিখে এবং দেখে খাদ্য প্রস্তুত করাকে রেসিপি বলে।

পরিবেশন

পরিবেশন কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি অতি আকর্ষণ। খাদ্য যেমনই হউক না কেন খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থার উপর খাওয়ার আগ্রহ অনেকাংশে নির্ভর করে। পরিস্কার, নিরিবিলি, স্বচ্ছন্দ পরিবেশে গুছিয়ে খাদ্য পরিবেশন করলে তৃপ্তিতে মন ভরে আনন্দে খাওয়া যায়। বাড়িতে অনেকে রান্না সুন্দর করে কিন্তু খেতে বসে যেমন তেমন করে। বাড়িতেও যথাযথ সুন্দর গোছাল পরিবেশে খাদ্য প্রতি বেলাতে পরিবেশন করা একান্ত প্রয়োজন। আজকের সমাজ বহু পরিবর্তিত। শুধু পরিবেশনের কারণে লোকে এক একদিন এক এক রেস্টুরেন্টে খেতে যায়। বাড়িতেও একঘেয়ে রান্না পরিবেশনে সুন্দর নাহলে খেতে ইচ্ছা করে না। পরিবেশনের উপর ছোট বাচ্চাদের খাদ্যের সদ অভ্যাস গড়ে উঠে একথা কিন্তু সকলকে স্বীকার করতে হবে। রান্নার বৈচিত্র এবং সুন্দর পরিবেশন দুটোই খাদ্য গ্রহণের আকর্ষণ বাড়ানোর পূর্ব শর্ত।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাদ্যের মেনু অনুসারে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। বেশি লোক অল্প জায়গায় অনানুষ্ঠানিক উৎসব ইত্যাদিতে যে কোন প্রকার বুফে পরিবেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অনানুষ্ঠানিক পরিবেশনগুলো দেশীয় এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে করা হয়।

বুফে পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন

অনানুষ্ঠানিক ভোজে খাদ্য পরিবেশন সাধারণত বুফে পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে নিমন্ত্রিত অতিথিগণ দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ করেন। বুফে পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু ডিসে করে একটি টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিগণ নিজের ইচ্ছামত নিজ নিজ প্লেটে তুলে নিবেন ও ঘুরে ফিরে খেতে পারেন। বুফে পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় বেশি লোককে খাওয়ানো যায়।

তৈরি খাবারের মূল্য নির্ধারণ

তৈরি খাদ্য বিক্রি করার পূর্বে তার মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। খাদ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় খাদ্য তৈরি করতে মোট কি পরিমাণ খরচ হয়েছে তা বিবেচনা করতে হয়। এই ক্ষেত্রে কাঁচা খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ ছাড়াও, জ্বালানি খরচ, শ্রম বাবদ ব্যয় ইত্যাদি খাতের খরচও হিসাব করতে হবে। খাদ্য বিক্রয়ের জন্য মূল্য নির্ধারণের সময় যে খাতগুলো হিসাবের আওতায় আনতে হবে তা হল ঃ

১) কাঁচামালের দাম
২) জ্বালানি বাবদ খরচ
৩) শ্রম বাবদ খরচ
৪) দোকান বা রেস্তোরার ব্যবস্থাপনা ব্যয়
৫) বিদ্যুৎ খরচ
৬) পরিবহন খরচ
৭) খাদ্য বিতরণে (প্যাকেট বা পলিথিন) ব্যয়

বিভিন্ন খাতের খরচগুলো যোগ করে মোট খরচের বা মুখ্য ব্যয়ের ১.৫% পর্যন্ত খাদ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

নিচে একটি খাদ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

ডালপুরির মূল্য নির্ধারণ (৩০টি ডালপুরি)

১)	কাঁচামালের মূল্য	মসুর ডাল (আধা কাপ) ময়দা (৩ কাপ) ধনেপাতা আদা, পেঁয়াজ, মরিচ (শুকনা) লবণ, তৈল (২৫০ গ্রাম)	৩৫.০০ টাকা
২)	জ্বালানি খরচ		৫.০০ টাকা
৩)	শ্রম বাবদ ব্যয়		২০.০০ টাকা
৪)	পরিবহন ব্যয় ও বিতরণের জন্য ব্যয় (পেকেট)		২০.০০ টাকা
		মোট ব্যয়	৮০.০০ টাকা

মূল্য নির্ধারণ

৩০টি ডালপুরির জন্য কাঁচামাল, জ্বালানি, শ্রম ও পরিবহন ও বিতরণের জন্য প্যাকেটের মূল্য বাবদ ব্যয় হল ঃ ৮০.০০ টাকা × নিরাপদ মাত্রা ১.৫ = ১২০.০০ টাকা

অর্থাৎ ৩০টি ডালপুরির মোট বিক্রয় মূল্য = ১২০.০০ টাকা

প্রতিটি ডালপুরির বিক্রয় মূল্য (১২০÷৩০)=৪.০০ টাকা

তৈরি খাবরের মূল্য নির্ধারণ করলে নিজের কাছে একটি সঠিক হিসাব থাকে। তাতে করে বিক্রয় করলে লাভ ক্ষতি সহজে হিসাব করা যায়। বাজারে দাম বাড়তে থাকলে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সেভাবে দাম রদ বদল করা যাবে। নিরাপদ মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে বাজারের সাথে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা সুবিধা হয়। এছাড়াও নিজস্ব বুদ্ধি প্রয়োগ করে নির্ধারিত মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যদি নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যের নিচে বিক্রি করা হয় তাতে যদি পরিমাণে বেশি বিক্রি হয় তবে লাভ করে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন প্রশ্ন- ২.১

১) স্বল্প আয়ের একটি মেনু প্রস্তুত করুন।
২) বুফে পরিবেশনের জন্য একটি টেবিল সাজান যাতে ২০ জন লোক একসঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।
৩) যে কোন একটি খাদ্যের মূল্য নির্ধারণ করে হিসাব করে শতকরা কত % লাভ হল দেখান।

পাঠ- ১৩.২ ঃ শস্য (শ্বেতসার জাতীয়) এবং ডালমিশ্রিত খাদ্য তৈরি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ থেকে আপনি—

- শস্যজাতীয় খাদ্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- শস্যজাতীয় খাদ্যের সাথে বিভিন্ন ডাল মিশ্রণ করে খাবার তৈরি করতে পারবেন;
- এ মিশ্রণের ফলে খাদ্যের উপাদানগুলো কি কি হবে তা জানতে পারবেন।

আমাদের দেশে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য সহজে উৎপন্ন হয় এবং সারা বছর পাওয়া যায়। বহু রকমারি ডালও আমাদের দেশে সহজলভ্য। ডাল আমাদের প্রোটিনের অভাব মুক্ত করে। তাই স্বল্প বা সীমিত আয়ের সংসারে অতি অল্পে প্রোটিনের চাহিদা মিটাতে হলে এ ধরনের খাদ্য তৈরি করা শিখতে হবে। আমরা সব রকমের ডাল একসাথে রান্না করেও প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করতে পারি। ডালের সাথে গম, চাল, সাগু মিলিয়ে রান্নাঘরে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন যুক্ত খাবারও একই সাথে তৈরি করতে পারি। এ ধরনের খাদ্যবস্তু নিঃসন্দেহে সহজ পরিপাক ও সুস্বাদু হয়। শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য এসব খাদ্য বেশ গ্রহণযোগ্য। নিচে দুটি রান্না সম্পর্কে আলোচনা করছি।

শস্য (শ্বেতসার জাতীয়) এবং ডালমিশ্রিত খাদ্য

শস্যজাতীয় বা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য যেমন চাল, গম ইত্যাদি ডালের সাথে মিশ্রিত করে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। চাল, গম ও বিভিন্ন ধরনের ডালের মিশ্রণে যে খাদ্যগুলি তৈরি করা যায় তা হল, খিঁচুড়ি, হালিম ইত্যাদি। নিচে খিঁচুড়ি প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হল ঃ

(১) খিঁচুড়ি

রেসিপি

উপকরণ	**পরিমাণ**
পোলাউর চাল	২ কাপ
মুগডাল (ভাজা)	১ কাপ
আদা (মিহিকুচি)	২ চা চামচ
লবঙ্গ	৪ টি
দারচিনি ১″	৩ টুকরা
তেজপাতা	১ টি
ঘি	১/৩ কাপ
পানি (ফুটান)	৫ কাপ
লবণ	১ টেঃ চামচ

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে উপরের রেসিপি নিজেদের পছন্দমত রদবদল করা যাবে। পোলাউ এর চালের বদলে ভাতের চাল ও সিদ্ধ বা আতপ চাল ব্যবহার করা যাবে। সামর্থ অনুযায়ী করা যায়। মুগডাল এবং অন্য যে কোন ডাল ও ব্যবহার করা যাবে।

প্রস্তুত প্রণালী

১। চাল ও ডাল ধুয়ে পানি ঝরাতে হবে।

২। ঘি আদা, তেজপাতা দিয়ে চুলায় দিতে হবে। খুব অল্প ভাজা চাল, ডাল, লবঙ্গ, দারচিনি দিয়ে ভাজতে হবে।
৩। ভাজা হলে ফুটান পানি ও লবণ দিয়ে নাড়তে হবে। ফুটে উঠলে ঢেকে দিতে হবে। মৃদু জালে ২০-২৫ মিনিট ফুটাতে হবে।
৪। বেরাস্তা দিয়ে ভূনা খিঁচুড়ি সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

খিচুড়ি থেকে কি কি উপাদান পাওয়া যাবে

১) শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট) অধিক পরিমাণে পাওয়া যাবে;
২) প্রোটিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যাবে;
৩) স্নেহজাতীয় উপাদানও পাওয়া যাবে;
৪) কয়েকটি খনিজ লবণও পাওয়া যাবে;
৫) বেশ কয়েকটি ভিটামিনও পাওয়া যাবে।

(২) হালিম

রেসিপি **২০-২৫ পরিবেশন**

মাংস রান্নাঃ		**গুঁড়া মশলা তৈরি**	
মাংস হাড়সহ	$\frac{1}{2}$ কেজি	শুকনা মরিচ	১০ টি
আদা বাটা	$\frac{1}{2}$ চা চামচ	জিরা (ভেজে)	১ চা চামচ
পেয়াজ বাটা	$\frac{1}{2}$ কাপ	গোল মরিচ	২০ টি
হলুদ বাটা	$\frac{1}{2}$ চা চামচ	রাঁধুনি	১ চা চামচ
মরিচ বাটা	$\frac{1}{2}$ চা চামচ	মৌরি	১ চা চামচ
জিরা বাটা	১ চা চামচ	মেথি	১ চা চামচ
ধনে বাটা	১ চা চামচ	কালজিরা	$\frac{1}{4}$ চা চামচ
গোল মরিচ বাটা	$\frac{1}{2}$ চা চামচ	লবঙ্গ	৬ টি
তেজপাতা	২ টি	পাঁচ ফোঁড়ন	১ চা চামচ
দারুচিনি	৪ টি		
এলাচ	৪ টি		
লবণ	২ চা চামচ		
সয়াবিন তেল	$\frac{1}{2}$ কাপ		

১। গুঁড়া মশলা বাদ দিয়ে অন্যসব উপকরণ মাংসের সাথে মিশিয়ে ৩ কাপ পানি দিয়ে মাংস সিদ্ধ করে কষিয়ে রেখে দিন।
২। সব মসলা আলাদা ভেজে (তৈল ছাড়া) গুঁড়া করে একসাথে মিশিয়ে রেখে দিন।

এবার-

গম, আদা বাটা	$\frac{1}{2}$ কাপ	রসুন বাটা	১ চা চামচ
মসুর ডাল	$\frac{1}{4}$ কাপ	শুকনা মরিচ	৪ টি
মুগডাল ভাজা	$\frac{1}{4}$ কাপ	আদা কুচি	১ টে চামচ
মাসকালাই ডাল ভাজা	$\frac{1}{4}$ চা চামচ	পেয়াজ গোল করে কাটা	২ টে চামচ
ছোলার ডাল	$\frac{1}{4}$ কাপ	ধনে পাতা কুচি	২ টে চামচ
পোলাউর চাল	$\frac{1}{2}$ কাপ	সয়াবিন তেল	১ টে চামচ
		কাঁচা মরিচ	কয়েকটি তাজা

১। গম ২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। গম, চাল, ডাল ধূয়ে ৮ কাপ পানি আদা রসুন কুচি কাচা মরিচ দিয়ে সিদ্ধ করুন। ২-৩ ঘন্টা সিদ্ধ হলে প্রয়োজন মত আরো পানি লাগালে দিতে পারেন। গম খুব সিদ্ধ হলে ঘুটে নিন। ডাল ঘন হবে। এবার আগের কষাণ মাংস ও গুঁড়া মসলাসহ আরো আধাঘন্টা মৃদু আঁচে জ্বাল দিন। মাঝে মাঝে নিচে নাড়তে হবে। প্রয়োজনবোধে পাতিল বদলাতে পারেন যদি আগের পাতিলের তলায় লেগে যায়। মাংসে হাঁড় ফেলবেন না। ওটা হালিমের সাথে খেতে ভাল লাগবে, নরম হবে।

২। তেলে রসুন লাল করে শুকনা মরিচ দিয়ে ভেজে নামিয়ে হালিম যে পাত্রে রাখা আছে তাতে মরিচের গুঁড়া দিয়ে তেলসহ ঢেলে দিন। আদাকুচি পেঁয়াজকুচি ধনেপাতা এবং টমেটো খিরা, গাজর কেটে সুন্দর করে উপরে সাজাতে পারেন। গরম গরম খেলে মজা লাগে।

শস্য ও ডালজাতীয় খাদ্য মিশিয়ে সামান্য মাংস সহযোগে খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। এই খাদ্য খেলে শিশুদের প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টিতে ভুগতে হবে না।

হালিমের প্রধান পুষ্টিমান (উপাদান)

১। প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পাওয়া যায়।
২। খনিজ লবণ এবং ভিটামিনও বেশ পরিমাণে পাওয়া যায়।
৩। শ্বেতসার জাতীয় উপাদানও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকে।

এই হালিম রান্না শিখলে পরিবারের খাদ্য পুষ্টি অভাব অনেকাংশে মিটবে তদুপরি শিশুদের পুষ্টিকর মিশ্র খাদ্যের অভ্যাস গড়ে উঠবে। এ ছাড়াও বাড়িতে হালিম তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করতে পারলে পারিবারিক আয়ও বাড়বে। গৃহিণীর সময়ও কাটবে ভাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২

১) ১০ জন লোকের জন্য খিচুড়ি রান্না করে পরিবেশন করুন।
২) হালিম রান্না পদ্ধতিতে ৪০ জনের জন্য হালিম রান্না করে দোকানে সরবরাহ করার জন্য মূল্য নির্ধারণ করুন।
৩) হালিম এবং খিচুড়ির পুষ্টি উপাদানগুলো আলাদা আলাদা করে লিখুন।

পাঠ- ১৩.৩ ঃ প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রোটিনজাতীয় উপাদানবহুল খাদ্যবস্তু তৈরি করতে পারবেন;
- খনিজ লবণ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- খনিজ লবণ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্যগুলোর মিশ্রণে একটি অতি সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিস তৈরি করতে সক্ষম হবেন;
- প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি করে পরিবারের সদস্যদের খাদ্যাভ্যাস গড়েন তুলতে সক্ষম হবেন।

প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিনবহুল খাদ্য তৈরি করতে শিখলে পরিবারের সদস্যদের এই জাতীয় উপাদাগুলোর অপুষ্টিজনিত ব্যধিতে ভুগতে হবে না। আমাদের দেশে অনেক সক্ষম পরিবারেও খাদ্য গ্রহণের অভ্যাসের অভাবে শিশুরা যেকোন রোগে ভোগে। শুধু টাকা থাকলেই খাদ্য তৈরি করা যায় না বা খাওয়া যায় না, ঘরে তৈরি খাদ্যের গুণগত মান ও স্বাস্থ্যসম্মত দিকগুলো বজায় থাকে। এ সমস্ত খাদ্যে পরিমিত সুষম খাদ্যের সরবরাহ থাকে।

গৃহে এই ধরনের উপাদানবহুল খাদ্য ফাস্টফুডের দোকানগুলোতে সরবরাহ করে পারিবারিক আয়ের পরিমাণ বাড়ান হয়। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়ে উপরন্তু বাজারে গুণগত মানের খাদ্যের সরবরাহ হলে জনস্বাস্থ্যও রক্ষা হয়। বেকারত্বও কমে আসে।

প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য

প্রোটিনজাতীয় খাদ্য যেমন- মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমাদের প্রতিদিনের প্রোটিনের চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজন। নিচে **১**টি প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের প্রস্তুতপ্রণালী দেওয়া হল ঃ

মাংসের কালিয়া

রেসিপি

উপকরণ	**পরিমাণ**
মাংস	১ সের
তেল	২-৩ ছটাক
পেয়াজ বাটা	১/৪ কাপ
আদা বাটা	১ টেবিল চামচ
রসুন বাটা	১ চা চামচ
হলুদ বাটা	১ চা চামচ
মরিচ বাটা	১ চা চামচ
জিরা বাটা	২ চা চামচ
ধনে বাটা	১ টেবিল চামচ
গোলমরিচ বাটা	১ চা চামচ
দারচিনি ১″	৩ টুকরা
এলাচ	৩ টি
তেজপাতা	১ টি
আলু	আধাসের

পদ্ধতি

১। মাংস টুকরা করে ধুয়ে নিতে হবে। আলু বাদে **১** ছটাক তেল ও সব উপকরণ মাংসে দিয়ে ভাল করে মাখতে হবে। মাংসে সমান সমান পানি দিয়ে চুলায় দিতে হবে। পানি শুকিয়ে মাংস সিদ্ধ হলে কষাতে হবে।

২। আলু খোসা ছাড়িয়ে দু টুকরা করতে হবে। এক ছটাক তেলে আলু অল্প ভেজে নিতে হবে।

৩। মাংসে আলু দিয়ে আরও কষাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে মাংস ও আলু যেন ভেঙ্গে না যায়। মাংস থেকে ভূনা গন্ধ বের হলে এবং হাড়িতে লেগে উঠলে আলু ও মাংস ডুবে এমন আন্দাজ গরম পানি দিতে হবে। হাড়ি ঢেকে মাঝারি আঁচে ৮-১০ মিনিট ফুটান। আলু সিদ্ধ হলে মৃদু আঁচে কিছুক্ষণ দমে দিতে হবে।

৪। এবার গরম মাংসের কালিয়া পরিবেশন করতে হবে।

এই জাতীয় খাদ্য থেকে শুধু প্রোটিন নয় অন্যান্য উপাদানও পাওয়া যায়। খাদ্য হিসেবে সুস্বাদু এবং খরচও কম পড়ে। পরিবারের প্রোটিনের অপুষ্টিও কমে আসে।

খনিজ লবণ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্যের মধ্যে শাক-সব্জি ও ফলমূল উল্লেখযোগ্য

নিচে ১টি খাদ্যের প্রস্তুতপ্রণালী দেওয়া হল ঃ

তাজা সব্জির সালাদ

রেসিপি

উপকরণ	**পরিমাণ**
গাজর	২টি
মূলা	১টি
খীরা	২টি
টমেটো	৪টি
কেপসিকাম (ইচ্ছা)	১টি
পেঁয়াজপাতা	১ আঁটি
লেটুস পাতা	৬টি

পদ্ধতি

১। সব সব্জি ধুয়ে নিতে হবে। গাজর খোসা ছাড়িয়ে ৩ ইঞ্চি লম্বা ফালি করতে হবে। মূলার লাল খোসাটি গোল করে চাক করে কাটতে হবে।

২। খিরা খোসা ছাড়িয়ে লম্বা ফালি করতে হবে। টমেটো ও ক্যাপসিকাম লম্বা টুকরা করতে হবে।

৩। পেঁয়াজের পাতলা খোসা ছাড়াতে হবে। পেঁয়াজসহ পেঁয়াজপাতা ৫ ইঞ্চি লম্বা রেখে আগা কেটে ফেলতে হবে।

৪। কচি ও ছোট আকারের লেটুসপাতা বেছে নিতে হবে।

৫। আয়তকার স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রে সব্জিগুলো রং মিলিয়ে নিজের পছন্দমত সাজাতে হবে। সব্জির উপর বরফকুচি ছিটিয়ে দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

টাটকা/তাজা পাকা ফলমূলের সালাদ

রেসিপি ২০ পরিবেশন

পাকা তাজা পেয়ারা	১ টি	মেয়নেজ	$\frac{1}{2}$ কাপ
পাকা তাজা পেঁপে	১ টি	লবণ	পরিমান মত
পাকা তাজা আঙ্গুর	৫০ গ্রাম	মিষ্টি দই	সামান্য
আপেল তাজা	১ টি	সরষে বাটা	১ চা চামচ
পাকা আনারস	$\frac{1}{4}$ অংশ	লেটুস পাতা	কয়েকটি
কমলা	১ টি	কাচা মরিচ	কয়েকটি

উৎস ঃ রান্না খাদ্য ও পুষ্টি, অধ্যাপিকা সিদ্দিকা কবীর।

১। সব ফল ও লেটুস পাতা একটু সামান্য গরম পানিতে ধুয়ে নিন।

২। ফলগুলো দাগের অংশ বা অপ্রয়োজনীয় অংশ এবং খোসা ছাড়িয়ে বেছে নিন।

৩। তারপর মাননসই ছোট ছোট টুকরা করুন। কমলা কোষের পাতলা আবরণ ছাড়িয়ে কোষ অবস্থায় রাখার চেষ্টা করুন।
৪। সব কিছু একটি পরিষ্কার বোলের মধ্যে নিয়ে চামুচ দিয়ে মেয়নেজ, লবণ ও দই দিয়ে মাখিয়ে নিন হালকাভাবে।
৫। ডিসে সুন্দর করে সাজিয়ে ফাঁকে ফাঁকে তাজা লেটুস পাতা সাজিয়ে দিন (পছন্দ অনুযায়ী কেটে নিন) তারপর কাঁচা মরিচ বোঁটা ছাড়িয়ে ধুয়ে উপরে সোজা করে খাড়াভাবে মাঝে মাঝে দিন।
৬। খাওয়ার টেবিলে সদস্য অনুযায়ী ১ ডিসে অথবা ২/৩ ডিসে আলাদা আলাদাভাবে পরিবেশনের সুবিধার্থে দিয়ে দিন।

শাক-সব্জি, ফলমূল দিয়ে সাজান সালাদ খুবই আকর্ষণীয় হয়। শিশুরা দেখেই খেতে চায়। এতে প্রচুর ভিটামিন এ.সি এবং কিছু খনিজ লবণও থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৩

১। ঋতু অনুযায়ী পাকা ফলমূল দিয়ে একটি আকর্ষণীয় সালাদ ডিস তৈরি করুন।

পাঠ- ১৩.৪ ঃ নববর্ষ উপলক্ষে অতিথি আপ্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পরিকল্পিত উপায়ে নববর্ষে অতিথি আপ্যায়নের মেনু তৈরি করতে সক্ষম হবেন;
- বুফে টেবিল সাজিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে সক্ষম হবেন;
- অল্প জায়গায় বেশি লোকের আয়োজন করতে পারবেন।

আমরা বাঙালি সংস্কৃতিতে ১লা বৈশাখকে নববর্ষের প্রথম দিন বলে উৎসব করে থাকি। এ উৎসব এখন ঘরে ঘরে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেও পালন করে। সাধারণত ঘরে যেটা হয় তাতে নিজের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবই বেশি থাকে এবং বেশ অনানুষ্ঠানিকভাবে আনন্দঘন পরিবেশে ঘরোয়া অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে এ ধরনের উৎসব পালন করা হয় না। যে কোন প্রতিষ্ঠানে হলেও অনানুষ্ঠানিক ভাবেই খাওয়া দাওয়া হয়। টেবিলের চারপাশ থেকে খাদ্যবস্তু বুফে স্টাইলে সাজান থাকে। অতিথিবৃন্দ নিজে নিজে স্ব স্ব প্লেটে খাবার তুলে নিয়ে পছন্দমত জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করতে করতে খেয়ে থাকেন। কারো বাড়িতে লন থাকলে সেখানেও আয়োজন করা হয়। অথবা বড় কোন হল রুমে বা খালি কোন জায়গায় স্নিগ্ধ পরিবেশে আয়োজন হয়ে থাকে।

নিচে দুভাবে বুফে পদ্ধতিতে টেবিল সাজান এবং দুটি মেনু করে দেখান হল।

মেনু (১)

রেজালা (যে কোন মাংসের)
রোস্ট (মুরগি)
পোলাউ
সব্জি
সালাদ
মিষ্টি/দই
পানীয়

১) এক্ষেত্রে টেবিলের এক পাশে খাদ্যের প্লেট স্তুপ করে রাখা হয়। প্লেটের পাশে ন্যাপকিন, কাঁটা চামচ সাজানো থাকে। মেনু অনুযায়ী খাবারগুলো টেবিলের মধ্যখানে না রেখে টেবিলের চারপাশে ক্রমানুসারে সাজানো থাকে। অতিথিরা প্রথমে প্লেট, কাঁটা চামচ, চামচ, ন্যাপকিন নিয়ে তাপর খাবারগুলো একে একে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্লেটে তুলে নিয়ে যান। বুফে পদ্ধতিতে পানীয় পরিবেশনের জন্য অন্য টেবিল ব্যবহার করা যেতে পারে।

লক্ষ্য করতে হবে

ক) মেনু অনুযায়ী টেবিলে ডিস ঠিক মত সংখ্যায় দেওয়া হল কিনা। যাতে অতিথিরা যেদিক থেকে নেবে যেন সহজে হাতের নাগালে পায়।
খ) ন্যাপকিন, চামচ, ছুরি ঠিক সংখ্যায় দেওয়া হল কিনা।
গ) পানি ও পানীয়ের টেবিলে সম সংখ্যক গ্লাস ও পানীয় সরবরাহ হল কিনা।
ঘ) প্রয়োজনবোধে পরিবেশনকারী টেবিলের পাশে থাকবেন।

মেনু (২)

রোস্ট রেজালা (মাংসের)

পোলাউ সালাদ

ফল

পানীয়

এক্ষেত্রে টেবিলের দু পাশেই একই ধরনের খাবার পরিবেশনের জন্য রাখা হয়। দু পাশ দিয়েই অতিথিরা খাদ্য তুলে নিয়ে যান। অতিথির সংখ্যা অনেক বেশি হলে এ পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন করা যায়। এ ক্ষেত্রেও পানীয় ও ফল পরিবেশনের জন্য অন্য টেবিল ব্যবহার করা যায়। চিত্রে এভাবে সাজান টেবিলের নমুনা দেওয়া হল।

চিত্র ঃ বুফে টেবিল সাজাবার নমূনা (২)

করণীয় বিষয়

১। দুটো মেনুতেই দামী খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। আয় অনুসারে ব্যয়ের সমর্থ অনুসারে স্বল্প ব্যয়ের খাদ্যও পরিবেশন করা যাবে; যেমন- ১) খিচুড়ী, ২) সালাদ, ৩) মিষ্টি এবং ৪) পানীয় অথবা পানীয় বাদ দিয়েও করা যাবে।

২। বেশি লোক হলে খাদ্যের পরিমাণ বাড়বে, খরচও বাড়বে, সেহেতু সাধারণ একটি শস্য জাতীয় এবং একটি প্রোটিন ও একটি পানীয় অথবা মিষ্টি দিয়ে ও মেনু তৈরি করা যায়। পানীয় পরিবেশনের বেলায় অতিথিদের পছন্দ জেনে নিতে হবে।

৩। লোক বেশি হলে পানীয় ও ফলের টেবিলে যাতে ঝামেলা না হয় সেদিকে খেয়াল পরিবেশনকারীর রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৪

১) ৫০ জন লোকের জন্য স্বল্প ব্যয়ের একটি মেনু তৈরি করে একটি পরিবেশন টেবিল অংকন করে সাজিয়ে আপনার মতামত লিখুন।

পাঠ- ১৩.৫ ঃ আনুষ্ঠানিক ভোজে ৮ জন সম্মানিত অতিথি আপ্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- আনুষ্ঠানিক ভোজের অর্থ অবহিত হবেন;
- সম্মানিত অতিথিদের দাওয়াতের নমুনাপত্র তৈরি করবেন;
- দু প্রকার মেনুসহকারে টেবিল সাজাতে পারবেন;
- আনুষ্ঠানিক ভোজের অতিথিদের আপ্যায়নের রীতিনীতি জানতে পারবেন এবং আপ্যায়ন করতে সক্ষম হবেন।

আজকাল বাড়িতে ও বিভিন্ন অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে অতিথিদের আপ্যায়ন রীতি হরদম চলছে। কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াতপত্র দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের ভোজের আয়োজনকে আনুষ্ঠানিক ভোজ (Formal diner) বলে। এখানে দেশী বিদেশী বিশেষ ব্যক্তিত্বের আপ্যায়ন হতে পারে। অথবা বিবাহের জন্য নবাগত আত্মীয় ব্যক্তিবর্গ হতে পারে। কিংবা কোন অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের আপ্যায়ন হতে পারে। বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি উপলক্ষে ও আনুষ্ঠানিকভাবে অতিথি আপ্যায়ন করা হয়।

আনুষ্ঠানিক ভোজের আয়োজনে ব্যবস্থাপককে খাদ্য নির্বাচন, প্রস্তুত ও মেনু সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হয়। আমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ চাহিদা বা খাদ্য গ্রহণের অসুবিধা জেনে নিলে ভাল হয়।

আনুষ্ঠানিক ভোজে সরকারী পর্যায়ে হলে সরকারী পদমর্যাদা অনুযায়ী চেয়ারে/টেবিলে নামের কার্ড সংরক্ষিত থাকবে। প্রধান অতিথির ও বিশেষ অতিথির জন্য কার্ড টেবিলে সংরক্ষিত থাকবে। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেক সময় আনুষ্ঠানিক ভোজে টেবিলে সব খাবার দেয়া থাকে না। পরিবেশনকারী প্রত্যেকটি খাবার পর্যায়ক্রমে অতিথিদের প্লেটে তুলে তুলে দেবে। অথবা টেবিলে ডিস সাজানো থাকলেও সেখান থেকে পরিবেশনকারী টেবিলে প্লেটে প্লেটে বামদিক থেকে খবারগুলো দিতে থাকবেন।

যদি প্রধান অতিথি থাকে তবে নিমন্ত্রণকারী/হোস্ট/হোস্টেস প্রধান অথিতির বিপরীতে বসবেন। তাতে করে আলাপ এবং দেখার সুবিধা হয়।

রাতে ডিনারের আয়োজন করলে আলো সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে যথেষ্ট বিকল্প আলোর ব্যবস্থা নিতে হবে। মোমবাতি চার্জলাইট অথবা জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আলো এবং আলোকসজ্জা রাতের ডিনারের একটি অন্যতম আকর্ষণ।

নিমন্ত্রণপত্র অনুষ্ঠানের বা ভোজের অন্তত দুদিন আগে বিতরণ করতে হবে। অপারগতায় টেলিফোন নাম্বার অথবা ঠিকানা দিতে হবে। কারণ কারো অনুপস্থিতি আনুষ্ঠানিক ভোজে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যবস্থাপক পূর্বেই এ ব্যাপারে জেনে থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজতর হয়।

অনুষ্ঠান সূচি	
সময় : … … … … … … … … … … … … …	… … … … … … … … … … … … … … … … … …
তারিখ : … … … … … … … … … … … … …	… … … … … … … … … … … … … … … … … …
স্থান : … … … … … … … … … … … … …	… … … … … … … … … … … … … … … … … …
মেনু	… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …	… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …	… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …	… … … … … … … … … … … … … … … … … …

নিমন্ত্রণ পত্রের নমুনা

মেনু

রোস্ট (মুরগি) রেজালা (মাংসের)

পোলাউ সব্জি

মিষ্টি দই

পানীয়

১। পোলাউ
২। সব্জি
৩। রোস্ট
৪। রেজালা
৫। সালাদ
৬। মিষ্টি
৭। প্লেট
৮। পানীয় গ্লাস
৯। পানির গ্লাস
১০। ন্যাপকিন
১১। মিষ্টি/দই প্লেট
১২। ছুরি
১৩। চামচ
১৪। ডিনার চামচ
১৫। ডিনার কাঁটা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৫

১) ১০ জন অতিথির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ের বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি উপলক্ষে টেবিল আয়োজন করে মেনুসহ উপস্থাপন করুন।

পাঠ- ১৩.৬ ঃ খাদ্য নির্বাচন, প্রস্তুত ও সংরক্ষণ (তেলের আচার, আনারসের জ্যাম, পেয়ারা জেলী)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ খাদ্য নির্বাচন কীভাবে করতে হয় তা জানতে পারবেন;
- ♦ নির্বাচনের পর খাদ্য তৈরির জন্য প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হবেন;
- ♦ সংরক্ষণ নিয়মনীতি অবলম্বনে তেলের আচার আনারসের জ্যাম ও পেয়ারার জেলী সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন।

খাদ্য ক্রয়ের পূর্বে খাদ্য নির্বাচন একটি সুকঠিন কাজ। টাকা থাকলেই খাদ্য নির্বাচন করা যায় না। খাদ্য নির্বাচন করতে গেলে কয়েকটি বিশেষ দিকে লক্ষ্য রাখলে সীমিত টাকায় তাজা টাট্‌কা ও সরস খাদ্যবস্তু নির্বাচন ও ক্রয় করা সম্ভব।

১) একটু সময় হাতে নিয়ে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে।
২) খাদ্যের মান ও গুণ বিচার করতে হবে।
৩) দাম যাচাই করতে হবে।
৪) খাদ্যবস্তু বেছে নিতে হবে।
৫) মাপ ও ওজন সম্পর্কে চলিত বর্তমান জ্ঞান থাকতে হবে।

এছাড়া ও শাক-সব্‌জি ফলমূল রং, আকার ও গন্ধ দেখেই তাজা টাট্‌কা বিচার করা যায়। তাজা, টাট্‌কা, ডাঁসা ও কচকচে ফলমূল দেখলেই চেনা যায়। বাসি ফলমূল, শাক সব্‌জির রং পরিবর্তন হয়ে যায় এবং পানির ভাগ কমে যায়। আজকাল বাজারে পানি দিয়ে সরস ও তাজা রাখা হয়। সে ব্যপারে সতর্ক হতে হবে।

টাট্‌কা, তাজা, ডাঁসা ও কচকচে সদ্য গাছ থেকে আনা তরিতরকারী ও ফলমূলের পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। সেগুলো ক্রয়ের সাথে সাথে আবার ঘরে এনে সঠিক অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। খাদ্য নির্বাচন ও ক্রয় শেষে খাদ্য প্রস্তুতকরণ অনেক সতর্কতার দাবী রাখে। কারণ খাদ্য কাঁচা, রান্না বা সিদ্ধ যেভাবেই গ্রহণ করা হোক এর জন্য চাই বিশেষ প্রস্তুতি। সেগুলো জানা সকলেরই প্রয়োজন, ব্যবহারিক জীবনে খাদ্য প্রস্তুত একটি পারিবারিক বিষয় নয় এটি বর্তমানে জাতীয় বিষয়। খাদ্য প্রস্তুতের উপর জাতির স্বাস্থ্যের মত মূল্যবান সম্পদ রক্ষা হচ্ছে।

১। কাঁচা খাদ্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি

ক) যে কোন কাঁচা ফলমূল শাক্‌-সব্‌জি বাজার থেকে আনার পরপর সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে মুছে রাখতে হবে।
খ) প্রয়োজনবোধে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। কারণ এমন কতগুলো জীবাণু আমাদের দেশে বাতাসে, মাটিতে থাকে যা শুধু ধুয়ে নিলে যায় না। সেজন্য গরম পানি দিয়ে ফলমূল এবং ছুরি, বটি ইত্যাদিও ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর খাওয়ার টেবিলে ডিসে সাজাতে হবে।

২। রান্নার প্রস্তুতি

ক) যে সকল খাদ্যবস্তু আমরা রান্না করি সেগুলোও ভালভাবে পুষ্টি উপাদান বজায় রেখে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
খ) রান্নার আগে ফলমূল ধুয়ে কাটতে হবে। কেটে ধুলে পানিতে দ্রবণীয় উপাদান নষ্ট হয়ে যায়।
গ) রান্না করে খাদ্য প্রস্তুত করলে খাদ্য সহজ পাচ্য হয় এবং মসলা সহযোগে রান্না হয় বলে সুস্বাদু হয়। বিভিন্ন মসলার উপাদানগুলো যুক্ত হয়ে পুষ্টিমানও বাড়ে।
ঘ) আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বেশি জ্বালে বা পানিতে বা কোন রন্ধন প্রক্রিয়ায় কোন কোন পুষ্টি উপাদান নষ্ট হতে পারে। সেগুলোর প্রতি বিশেষ নজর রেখে খাদ্য প্রস্তুত শেষ করতে হবে।

খাদ্য প্রস্তুতের পর সংরক্ষণের কথা ভাবতে হয়। সংরক্ষণ স্বল্প সময়ের জন্য হোক বা দীর্ঘ সময়ের জন্যই হোক। সংরক্ষণ করার অর্থ খাদ্যবস্তুটি যেন খাওয়ার উপযোগী থাকে। আমরা এই পাঠে শুধু তেলের আচার আনারসের জ্যাম এবং পেয়ারার জেলী নিয়ে আলোচনা করব।

আচারের মধ্যে প্রায় সব ধরনের টক মিষ্টি ফল আমরা তেলে সংরক্ষণ করতে পারি। এতে অনেক দিন অর্থাৎ এক মৌসুমের ফলমূল অন্য মৌসুমে খাওয়া যায়। নিচে তেলের মধ্যে আমের টক আচারের একটি পদ্ধতি ব্যবহারিক কাজের জন্য বর্ণনা করা হল।

তেলের আচার

(আমের টক আচার)

উপকরণ	**পরিমাণ**
কাঁচা আম	৮ থেকে ১০ টি
তেল	২৫০ গ্রাম
শুকনা মরিচ	৪ টি
পাঁচফোঁড়ন	২ চা চামচ
হলুদ বাটা	২ চা চামচ
মরিচ বাটা	২ টেবিল চামচ
সরিষা বাটা	২ চা চামচ
পোস্তের দানা	৩ চা চামচ
লবণ	২ চা চামচ
চিনি	২ চা চামচ

প্রস্তুত প্রণালী

ক) আম ধুয়ে খোসাসহ অথবা খোসা ফেলে চাক চাক করে কেটে নিতে হবে। পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

খ) তেলে বাটাসহ মরিচ ভেজে তুলতে হবে। তেল চুলা থেকে নামিয়ে পাঁচফোঁড়ন ছাড়তে হবে। নেড়ে বাটা মশলা ও পোস্তের দানা দিতে হবে। সামান্য পানি দিয়ে কষাতে হবে। মশলা কষাণ হলে আম দিতে হবে। মাঝে মাঝে নাড়তে হবে।

গ) চিনি দিতে হবে। ৮ থেকে ১০ মিনিট পর আম সিদ্ধ হলে চুলা থেকে নামাতে হবে।

আনারসের জ্যাম

উপকরণ	**পরিমাণ**
আনারস	২ কাপ
চিনি	দেড় কাপ

প্রস্তুত প্রণালী

ক) আনারস লম্বায় দুফালি করতে হবে। চামচ দিয়ে আনারস কুরিয়ে নিতে হবে।

খ) আনারস ও চিনি একসঙ্গে জাল দিতে হবে। সিরা ঘন হলে নামিয়ে বোতলে ভরতে হবে। ঠান্ডা হলে বোতলের মুখে মোম লাগিয়ে দিতে হবে।

পেয়ারার জেলী

উপকরণ	**পরিমাণ**
পেয়ারা	৪০ টা
পানি	৩০ কাপ
চিনি	২ কেজি
সাইট্রিক এসিড	৩ টেবিল চামচ
বা কাগজি লেবুর রস	২ টি
একসেরি বোতল	২ টি

প্রস্তুত প্রণালী

ক) পেয়ারা ধুয়ে টুকরা করতে হবে। পানি দিতে হবে। ঢাকনা দিয়ে দুই ঘন্টা সিদ্ধ করতে হবে। কখনো নাড়া যাবে না। পেয়ারা সিদ্ধ হয়ে গেলে পানি শুকিয়ে অর্ধেক হলে নামাতে হবে।

খ) পাতলা কাপড় দুভাঁজ করে একটা হাঁড়ির মুখে ধরতে হবে। তার উপর পেয়ারা ঢেলে দিতে হবে। পেয়ারা নাড়া যাবে না। আলতভাবে চিপে রস নিংড়ে নিতে হবে।

গ) পেয়ারার রস মেপে প্রতিকাপ রসের জন্য ৩/৪ কাপ চিনি দিতে হবে।

ঘ) পেয়ারার রস চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। হাঁড়ি ফেনায় ভরে গেলে সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস দিতে হবে।

ঙ) বাটিতে পানি দিয়ে ১ ফোঁটা জেলী ফেলতে হবে। পানিতে জেলী জমলে চুলা থেকে নামিয়ে পরিষ্কার বোতলে ভরতে হবে। ঠান্ডা হলে মুখ বন্ধ করতে হবে। জেলী বেশি ঘন করে নামালে ঠান্ডা হবার পর শক্ত হয়ে যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৬

১। খাদ্য নির্বাচন, প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হলে আপনি কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন লিখুন।

২। আনারসের জ্যাম অনুকরণে মিষ্টি কুমড়ার জ্যাম তৈরি করুন।

৩। পেয়ারার জেলী তৈরির অনুকরণে মেছতা (টক) এর পাকা বিচির উপরের অংশ দিয়ে জেলী তৈরি করুন।

মানবন্টন
ও
নমুনাপ্রশ্ন

মান বন্টন

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ২য় পত্র

মোট নম্বর= ১০০

তত্ত্বীয়-৭০

(ক) শিশুবর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক = ৩৫

২টি রচনামূলক প্রশ্ন	২×১২ $\frac{1}{2}$ =২৫
২টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন	২×৫=১০
	মোট = ৩৫

খ) খাদ্য ও পুষ্টি = ৩৫

২টি রচনামূলক প্রশ্ন	২×১২ $\frac{1}{2}$ =২৫
২টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন	২×৫=১০
	মোট = ৩৫

ব্যবহারিক = ৩০

মৌখিক পরীক্ষা	৫
শিশুবর্ধন পারিবারিক সম্পর্ক ব্যবহারিক	৫
খাদ্য ও পুষ্টির ব্যবহারিক	১০

শ্রেণীর কাজ

ক) শিশুবর্ধন পারিবারিক সম্পর্ক	৩
খ) খাদ্য ও পুষ্টি	৭

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা

সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের ১টি করে বিকল্প (অথবা) প্রশ্ন থাকবে। রচনামূলক প্রশ্নে একাধিক অংশ থাকতে পারে।

নমুনা প্রশ্ন

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ২য় পত্র
তত্ত্বীয়
পূর্ণমান-৭০

‘ক’ বিভাগ

১। পরিবার কি? পরিবারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। এ ধরনের পরিবারের সুবিধাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন। ২+৩+৪+৩ $\frac{1}{2}$ =১২ $\frac{1}{2}$

অথবা

পরিবারের সংজ্ঞা দিন। পরিবারের প্রয়োজনীয়তা কি? উদাহরণসহ পরিবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন এবং একক ও যৌথ পরিবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন। ২+৩+৩ $\frac{1}{2}$ +৪=১২ $\frac{1}{2}$

২। একটি শিশুর জীবনে গর্ভধারণ মুহূর্ত এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধি কিভাবে হয় তার একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দিন। গর্ভকালীন বিকাশে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো কি কি? ২+৮+২ $\frac{1}{2}$ =১২ $\frac{1}{2}$

অথবা

বর্ধন ও বিকাশের সংজ্ঞা দিন এবং এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। নবজাতককালের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এ সময়ের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখুন। ২+২ $\frac{1}{2}$ +৮=১২ $\frac{1}{2}$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন ২×৫=১০

১। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় খেলার পার্থক্য লিখুন।

অথবা

প্রাকবিদ্যালয় শিশুর শারীরিক বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২। শিশুর না সূচক আচরণের প্রতিকার কিভাবে করা সম্ভব ব্যাখ্যা করুন

অথবা

শিশুর মুখে আঙ্গুল দেওয়ার কারণ কি লিখুন।

‘খ’ বিভাগ

১। পরিপাক কি? পরিপাক তন্ত্র কাকে বলে? চিত্রসহ পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিন। ২+২ $\frac{১}{২}$ +৮=১২ $\frac{১}{২}$

অথবা

অপুষ্টি কি? দেহে অতিরিক্ত ওজনের কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে লিখুন। দেহে অতিরিক্ত ওজনের ফলে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় বর্ণনা করুন। ২+৬+৪ $\frac{1}{2}$ =১২ $\frac{1}{2}$

২। বাংলাদেশের শিশুদের পুষ্টি সমস্যা সম্পর্কে লিখুন। প্রোটিন ক্যালরির অভাবজনিত রোগ সম্বন্ধে লিখুন। ৬+৬ $\frac{১}{২}$ = ১২ $\frac{১}{২}$

অথবা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা কি? ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব সম্বন্ধে লিখুন। অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক ভোজের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে লিখুন। ২+২ $\frac{1}{2}$ +৮=১২ $\frac{1}{2}$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন ২×৫=১০

১। খাদ্যবাহিত রোগগুলোর নাম লিখুন এবং প্রতিকারের বর্ণনা দিন।

অথবা

খাদ্যবাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি লিখুন।

২। গা-ফোলা ও হাড্ডিসার রোগের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

অথবা

লালাগ্রন্থি ও পৌষ্টিক গ্রন্থির মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ২য় পত্র
ব্যবহারিক

পূর্ণমান-৩০

সময়-৩ ঘন্টা

[দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

১।	দেশীয় উপকরণের সাহায্যে চার বছর বয়সী শিশুর জন্য একটি খেলনা পুতুল তৈরি করে দেখান।	৫
২।	বুফে পরিবেশনের জন্য একটি টেবিল সাজান যাতে ১০ জন লোক একসঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।	১০
৩।	শ্রেণীর কাজ ঃ	
	শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক	৩
	খাদ্য ও পুষ্টি	৭
৪।	মৌখিক	৫